ইলুমিনাতি
আব্দুল কাইয়্যুম আহমেদ

ইলুমিনাতি

আবদুল কাইয়ুম আহমেদ

সম্পাদনা

সাদিক ফারহান

তাজকিয়া পাবলিকেশন

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আধুনিক বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে নিজেকে একজন যোগ্য ও অগ্রসর ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। বিজ্ঞান যেমন আলোর গতিতে এগোচ্ছে, তেমনি প্রতিনিয়ত আমাদের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বিশাল একেক প্রশ্নবোধক চিহ্নের সামনে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। শুধু ইতিবাচক নয়, নেতিবাচকও। অথচ আমরা অভুক্তের মতো সামনে যা আসে বাছ-বিচার ছাড়াই তা গোগ্রাসে গিলতে থাকি। যুগান্তরে বয়ে আসা এই মানসিকতা আজ গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবন আর আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, এটা এখন বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে রূপ ধারণ করেছে। আমরা খালি চোখে দেখছি—আমেরিকা-ইংল্যান্ড-রাশিয়া-ফ্রান্স-জার্মান-চিনের নেতৃত্বে জাতিসংঘের মতো প্রমোদতরীতে চড়ে বিশ্ব শান্তি-ভ্রাতৃত্ব-মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করতে যাচ্ছে। সৌম্য-শান্ত চেহারা নিয়ে বয়ে চলা এই স্রোতের আরও একটা রূপ আছে—কালো রূপ। যা অন্তঃস্রোতার মতো খুব নীরবে বয়ে চলে। কুৎসিত, বীভৎস আর ভয়ংকর তার চেহারা। প্যাসিফিকের ওশানের সেই রেখায় সাদা আর কালো পানির স্রোত যেমন কখনো মিশে যায় না, অথচ একইসাথে বয়ে চলে। কত কাছাকাছি, পাশাপাশি। তেমনি সমাজে বয়ে চলা এই কুৎসিত স্রোতের অস্তিত্বও আমরা খালি চোখে অনুভব করতে পারি না।

পাঠক, এতক্ষণে হয়তো ঘোরলাগা এক কৌতূহলের ভেতর আছেন আপনি, হয়তো সমাজের কালো অংশে বয়ে চলা সেই স্রোতের ব্যাপারে জানার প্রবল আগ্রহ জন্মেছে আপনার। ভাবছেন, কী সেই রহস্যগাঁথা—সেই কৃষ্ণগহ্বর! হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। সমাজের সেই কুৎসিত, বীভৎস, ভয়ংকর স্রোতই হলো ইলুমিনাতি। হাজার বছর ধরে অন্তরালে কলকাঠি নাড়া যে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠী, তারই আপডেটেড ভার্সন এই ইলুমিনাতি। স্রোত নিয়ন্ত্রণের যে পরিকল্পনা ইলুমিনাতির ছিল—তা অনেকাংশেই ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রযুক্তি, যুদ্ধাস্ত্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, খাদ্য—সবই এখন তাদের হাতে। এখন শুধু জাল

গুটিয়ে আনার অপেক্ষা, আমরা অপেক্ষায় আছি ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খেতে খেতে মারা যাবার।

ড্যান ব্রাউনের মতো কিছু মানুষ এ বিষয়ে নতুন করে আলোকপাত না করলে হয়তো আমাদের জানাই হতো না ইলুমিনাতি সম্পর্কে। বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ইলুমিনাতি একটি পরিচিত শব্দ হলেও মুসলিম, বিশেষত বাঙালিরা এ শব্দটির সাথে খুব একটা পরিচিত নয়।

অনেকদিন পর্যন্ত বাঙালি মুসলিমসমাজ ইলুমিনাতি-প্রশ্নে নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। তবে আশার কথা হলো, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইলুমিনাতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেশ লক্ষ্যণীয়। স্যোস্যাল মিডিয়ায় মাঝেমধ্যেই এ ব্যাপারে লেখা চোখে পড়ে। বাংলাভাষায় ইলুমিনাতি সম্পর্কে বিশেষ কোনো বই না থাকলেও আশার কথা হলো, আমার জানামতে, কেউ কেউ ইতোমধ্যে 'ইলুমিনাতি' নিয়ে পড়াশোনা করছেন। আর বাংলাভাষায় ইলুমিনাতি সম্পর্কে গল্পভাষ্য ও তত্ত্বের সমন্বয়ে লেখা এটিই প্রথম বই।

ইলুমিনাতি যেহেতু একটা গুপ্ত সংগঠন, তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় অতি সংগোপনে, কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করে, তাই এ-সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ একটি বই লিখতে যে পরিমাণ ধ্রুব তথ্যের দরকার—একজনের পক্ষে তা যোগাড় করা মুশকিল কাজ। তাই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে বইটি রচনার সময় বেশকিছু জাতীয় দৈনিক, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, ব্লগ, ইউটিউবসহ ড্যান ব্রাউনের *দ্যা ভিঞ্চি কোড, এঞ্জেল এন্ড ডেমনস্* ছাড়াও বিদেশি কিছু ব্লগের সাহায্য নিয়েছি। সবার কাছে আলাদাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, তাই এখানে আমি সম্মিলিতভাবে কৃতজ্ঞতায় তাদের স্মরণ করলাম।

বইটি রচনার সময় আমার সর্বোচ্চটুকু দেওয়ার চেষ্টা করেছি; এরপরও যে অপূর্ণতাটুকু ছিল, শ্রদ্ধেয় সম্পাদক তা পূরণ করেছেন বলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাদিক ফারহান, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে না চিনলেও এই উপলক্ষ্যে তার প্রতি বিশাল এক ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল। বইয়ের জন্য তিনি যে শ্রম দিয়েছেন, তা আমাকে সত্যিই বিস্মিত করেছে। যে অবস্থায় আমি বইয়ের প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলাম, তার সম্পাদনা-সংযোজনের পর পাণ্ডুলিপির কলেবর প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মহান আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমিন।

একটা বই লেখা থেকে শুরু করে বাজারে আনা পর্যন্ত অনেকগুলো ধাপ পার হতে হয়। শুরু থেকে আজ-অব্দি যারা আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে এসেছেন তাদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা। বিজ্ঞ পাঠকমহলের প্রতি আমার অনুরোধ, যেহেতু মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তাই বইয়ে তথ্যগত কোনো অসংগতি বা রচনাগত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবহিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেওয়া হবে। বইটির উন্নয়নকল্পে পাঠকের যেকোনো সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

এছাড়াও আমি পাঠকদের আশ্বস্ত করছি, বইয়ের উন্নয়নকল্পে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরও নিখুঁত, নির্ভুল ও তথ্যসমৃদ্ধ হবে ইন শা আল্লাহ। বইটি যাদের জন্য লেখা হলো, সেই পাঠকমহল যদি এর দ্বারা ইলুমিনাতির ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছুমাত্র সচেতন হন, নিজের অস্তিত্ব, ঈমান, আমল রক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন তাহলেই আমি আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। আল্লাহ আমাদের সকলের ঈমান ও আমল রক্ষা করেন, আমিন।

সকলের দোয়াপ্রার্থী

আবদুল কাইয়্যুম আহমেদ

১৫-১২-২০১৯ ইসাব্দ

সম্পাদকের অনুভূতি

খালি চোখে যা দেখি আমরা, সেটাই কি বিশ্বাস ও বাস্তবতার সর্বোচ্চ কথা? না। একবিংশ শতাব্দীর অনুসন্ধিৎসু সমাজ এ-ধারণা বদলে দিয়েছে। যাপিত জীবনের পরতে পরতে কপাল কুঁচকে তাকালেই থমকে যেতে হচ্ছে—কী হচ্ছে এখানে; কে-ইবা করছে! ব্যক্তিজীবনের এমন অসংখ্য কৌতূহল আমাদের ভাবতে শেখায় সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবিধ প্রশ্নের প্রকৃত জবাব নিয়ে। দেশ, রাজ্য, সমাজ ও বিশ্বের ধারাবাহিক নিয়ন্তাদের ভেতরের কথা পড়তে পড়তে জানা যায়—আড়ালে এই সমগ্র জগতের নিয়ন্ত্রণ গুটিকতক মানুষের হাতে। উঠে আসে একটি গুপ্ত সংগঠনের নাম—ইলুমিনাতি।

আধুনিককালে একটি সমাজের প্রথম ও চাক্ষুষ নিয়ন্ত্রক হলো, রাজনৈতিক সরকারদল; কিন্তু বাস্তবার্থে সে-সমাজের প্রকৃত নিয়ন্তা তারা, যাদের হাতে থাকে জনতার অর্থের থলি। পুরো পৃথিবীর অর্থনীতির সুতো ধরে এগোতে থাকলে বিশ্বব্যাংকের আড়ালে বসে থাকা নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও পরিবার পর্যন্ত পৌঁছা যায়—মূলত এই কয়েকজন নির্দিষ্ট মানুষ বিশ্বের লাগাম ধরে আছে; কিন্তু এরা কারা, কীভাবে এদের কর্মকাণ্ড চলে, আপাত সমাজের কোন কোন অলি-গলিতে এদের চলাচল? এমন সমূহ প্রশ্নের পিছু ঘুরতে ঘুরতে নির্দিষ্ট সিম্বলে গিয়ে আটকে যায় সব—একচোখ, পিরামিড; ফেরাউন, নমরুদ—দাজ্জাল। হাজার বছরের পুরনো ফেরাউনবাদের উৎস থেকেই বিশ্বনিয়ন্তা ইহুদিবাদের প্রভু দাজ্জালের আবির্ভাব হবে। ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসনারির মতো গুপ্ত সংঘগুলো তার আগমনের ক্ষেত্র তৈরি করছে কেবল।

পাঠক, আপনার জীবন থেকেই আমরা শুরু করেছি। আপনার পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র হয়ে আমরা বের করে এনেছি বিশ্বব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পেছনের খবর। ইলুমিনাতি একটি সাইনবোর্ড, আমরা এর পেছনে লুকনো ব্যক্তি, চিন্তা এবং উপাস্যকে টেনে আনতে চেষ্টা করেছি। আমরা আপনাকে হতাশায় ফেলতে চাই নি; আমরা আপনাকে সতর্ক করতে চেয়েছি দাজ্জাল আগমনের ভয়াবহতা

সম্পর্কে, সচেতন করতে চেয়েছি পৃথিবীর বর্তমান প্রকৃতি ও পরিবেশের বাস্তবতা সম্পর্কে। 'ইলুমিনাতি' নিয়ে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য সমৃদ্ধ কোনো বই আমাদের চোখে পড়ে নি। সে দিক থেকে 'তাজকিয়া পাবলিকেশন'র এই আয়োজন বাঙালি পাঠাগারে নতুন সংযোজন হয়ে থাকবে। আমরা বলছি না এ বইটি পাঠককে ইলুমিনাতির আদি-অন্ত জানিয়ে দেবে—দুইশো পৃষ্ঠায় তা সম্ভবও নয়; তবে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বইটি আড়ালের পৃথিবী সম্পর্কে পাঠককে সজাগ ও সচেতন হতে সাহায্য করবে।

বইটির কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, ইলুমিনাতি বা গুপ্তসংঘ নিয়ে গবেষণালব্ধ কাজ করতে হলে ঢাউস সাইজের বই হয়ে যাবে। লেখক তথ্য-আহরণে যথাসাধ্য শ্রম দিয়েছেন। আলোচনাগুলো প্রাণবন্ত করতে লেখকের মেধার প্রশংসা না করে পারছি না। তবুও সম্পাদনাকালে লেখকের বক্তব্যকে পূর্ণতা দিতে কিছু জায়গায় প্রয়োজনীয় টিকা সংযুক্তি বা প্রাসঙ্গিক আলোচনা সংযোজনের প্রয়াস পেয়েছি। আলোচনাগুলো দালিলিক ও প্রমাণসিদ্ধ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন প্রিয় ভাই ইফতেখার আহমেদ ইমন।

প্রথমবার প্রায় ৯০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার পর টেকনিক্যাল জটিলতায় পুরো ফাইল-ই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। পরে দ্বিগুণ সময় ব্যয়ে পুরো বইয়ের কাজ আমাদের দ্বিতীয়বার করতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রিয় ইফতেখার ভাইয়ের সহযোগিতা না-হলে বইটি এত সহজে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হতো না। ব্যস্ততার মধ্যেও সাগ্রহ সাহায্যের জন্য ইফতেখার ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সহধর্মিণী হুমাইরা সাদিকের প্রতিও, ছোট ছোট অনেক ব্যাপারে সেও আমার বেশ উপকার করেছে। আমার মতো তালিবুল ইলম থেকে কৌশলে কাজ আদায় করে নেওয়ায় বন্ধুপ্রতিম প্রকাশক আসআদ ভাইয়ের প্রতিও সশ্রদ্ধ শুকরিয়া জানাচ্ছি।

পরিশেষে বলি, বইটির পেছনে আমাদের যথেষ্ট সময় ও মেধা ব্যয় হয়েছে; তবুও বইটি যদি একজন মাত্র পাঠককেও সজাগ করতে পারে—তাহলেই

আমাদের শ্রম ও সাধনা সাফল্য পাবে বলে মনে করছি। বইটিকে যৌক্তিক ও প্রামাণিক করে তুলতে আমাদের চেষ্টার কমতি ছিল না, এরপরও পড়তে গিয়ে কোথাও খটকা লাগলে, অযৌক্তিক ঠেকলে কর্তৃপক্ষ বরাবর যোগাযোগ করলে আমরা সেটা ভেবে দেখবো। প্রয়োজন ও প্রসঙ্গ-বিচারে পরবর্তী সংস্করণগুলোতে নতুন সংযোজনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে—ইন শা আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে বইটির উত্তম উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে দেন, আমিন!

দোয়ার মুহতাজ
সাদিক ফারহান

সূচিপত্র

[১]

ইলুমিনাতি; প্রাচীন ইতিহাস

যাত্রা

২০১৮ সালের মে মাস, রোজা চলছে। মাত্রই শেষ হয়েছে এইচএসসি পরীক্ষা। ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিচ্ছি, তখনো কোনো কোচিংয়ে ভর্তি হই নি। তের রমজানের সেহরি শেষ করেছি, এমন সময় ফোনটা পরপর কয়েকবার টুংটাং করে উঠল। হাতে নিয়ে দেখি খুব কাছের একজন বন্ধুর মেসেজ, কিছু লিংক পাঠিয়েছেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই আমি একটা লিংক ওপেন করলাম; কিন্তু তারপর আর স্বাভাবিক থাকতে পারলাম না। রুদ্ধশ্বাসে লিংকের লেখা শেষ করলাম। তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা...তারপর ইন্টারনেটে সার্চ দিলাম, চোখের সামনে উন্মোচিত হলো বিশাল এক অন্ধকার জগৎ। আমার অস্তিত্ব যেন প্রচণ্ড এক হোঁচট খেল। লেখাগুলো পড়তে পড়তে আমি পরিচিত হই নতুন এক শব্দের সাথে—ইলুমিনাতি; যা এর আগে কখনো আমি শুনি নি। নামটি শুরুতেই যেন একটি ঘোরের মধ্যে ঠেলে দিল আমাকে। শব্দটি নিয়ে ঘাঁটতে থাকলাম আমি। ধীরে ধীরে পরিচিত হলাম নতুন এক অজানা জগতের সাথে—এ যেন কেঁচো খুঁড়তেই বেরিয়ে এসেছে সাপ!

‘ইলুমিনাতি’কে অনুসরণ করতে গিয়ে ফ্রিম্যাসনসহ আরও বেশকিছু সংগঠনের ব্যাপারে জানতে পারলাম। পরে এগুলোর ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে রহস্যের এক বিরাট দ্বার উন্মোচিত হয় আমার সামনে। এ যেন রহস্যঘেরা অন্য কোনো জগত; এ যেন নতুন কোনো গ্রহের ভিন্ন কিসিমের নানামাত্রিক ষড়যন্ত্রের মলাট।

গোড়ার কথা; হিরাম আবিফের মৃত্যু-রহস্য

প্রিয় পাঠক, চলুন ঘুরে আসি কয়েক হাজার বছর পেছনের অতীত থেকে....

তখন নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের নবুয়তকাল চলছে। টায়ারে[১]র রাজা হিরামের কাছে নবী সুলাইমান আলাইহিস সালাম একটি উপাসনালয় তৈরি করার জন্য সহযোগিতা চাইলেন। রাজা হিরাম তার পুত্র আবিফ হিরামকে পাঠালেন পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামের সহযোগিতার জন্য। আবিফ হিরামের নির্মাণ-দক্ষতা ছিল স্বীকৃত। তার শৈল্পিক গুণের প্রশংসায় লোকে বলত—স্বর্ণের সাথে রৌপ্য ও লোহা; পাথরের সাথে কাঠ ও রত্ন; গোলাপির সাথে নীল কিংবা কাপড়ের ভাঁজে রেজিনকে গাঁথার কায়দা—পুরো দুনিয়ায় তারচেয়ে ভালো কেউ রপ্ত করতে পারে নি। এছাড়া তার প্রতি নিয়ামতস্বরূপ ছিল নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পরোক্ষ 'ঐশ্বরিক' যোগাযোগ—যাকে ম্যাসনরা 'গুপ্তশক্তি' হিসেবে গণ্য করে। এই গুপ্তশক্তি তিনি দিতে চেয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের। তিনি চাইছিলেন উপাসনাগৃহের নির্মাণকাজ শেষ হলেই তিনি শিষ্যদের এটি শিখিয়ে দেবেন; কিন্তু লোভী তিনজন নির্মাতার অতটা ধৈর্য ছিল না।

লোভাতুর এই তিনজন এক সন্ধ্যায় পবিত্র উপাসনাগৃহের দরজা ভেতর থেকে আটকে দেয়। হিরামের কাছে জানতে চায় গুপ্তশক্তির রহস্য। জবরদস্তির মুখেও হিরাম যখন গুপ্তমন্ত্র প্রদানে রাজি হচ্ছিল না, তারা তখন হিরামকে আঘাত থাকে; হিরামের একদিনের বিশ্বাসী বন্ধুরাই তাকে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকে—ঘাড়ে, গলায়, বুকে এবং মস্তিস্কে। আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি আর্তনাদ করতে থাকেন। আঘাতে আঘাতে একসময় তার আর্তনাদ ক্ষীণ হতে হতে শেষ হয় মৃত্যুতে। তবুও তিনি তার ঐশ্বরিক জাদু ঘৃণ্য আক্রমণকারীদের জানতে দিলেন না। তাদের অসংযত হাতে এই আমানত তুলে দেওয়ার বিপরীতে তিনি বেছে নিলেন পৃথিবী থেকে চিরগমন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে এলো। হতাশ ও ভীত খুনিরা তার লাশ সোনালি-দরোজা দিয়ে বয়ে নিয়ে গেল মন্দিরের বাইরে। চারদিক দেখে গোপনে লাশ কবর দিয়ে দিল পাশের জঙ্গলাকীর্ণ টিলায়।

---

১ এশিয়া-মহাদেশের অন্তর্গত্ত তুরস্কের পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগরের অন্তর্গত লেভান্ত উপসাগরের পূর্বউপকূলে, ৩৩° ডিগ্রি উত্তর-অক্ষরেখায় টায়ার নগরী অবস্থান। এখন প্রাচীন টায়ারের ভগ্নাবশেষ অবশিষ্ট আছে। তৎকালীন পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর হিসেবে পরিগণিত হতো টায়ার। প্রথমে টায়ার নগরী তুরস্কের (পালেস্তিন-প্রদেশের) সীমানার মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

সকাল হতেই খোঁজ পড়ল হিরামের। বাতাসের গতিতে খবর পৌঁছে গেল নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে। সংবাদ শুনেই তিনি আঁচ করলেন—কী ঘটে থাকতে পারে। সাতজন সাহসী ও দূরদর্শী ম্যাসনকে তিনি হিরামের লাশ খুঁজতে পাঠালেন। তিন দিকে গেল ছয়জন এবং বাকি একজন রাজার সাথে গেল পূর্বদিকে। অল্প সময়েই খুঁজে পাওয়া গেল হিরামের লাশ। নিথর হিরামকে উপাসনাপ্রাঙ্গনে পড়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিত সুলাইমান আলাইহিস সালামের চোখে অশ্রু নেমে আসে। যে-নকশা তিনি অলৌকিকভাবে পেয়েছিলেন, সেই নকশার নির্মাতা চোখের সামনে শুয়ে আছে; নীরব, নিথর।

শয়তান-পূজার সূচনা

হিরাম-হত্যার ঘটনায় অনতিবিলম্বে খুঁজে বের করা হলো খুনি জুবেলা, জুবেলো এবং জুবেলাসকে। শাস্তিও পেল তারা যথাযোগ্য; কিন্তু এই ঘটনায় ম্যাসনদের মধ্যে লোভের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। একদল সুলাইমান আলাইহিস সালামের উপাসনাগৃহ নির্মাণে ব্যাপৃত রইল সততা ও নিষ্ঠার সাথে। অন্যদলের বুকের ভেতর লকলক করে উঠল লোভ। তাদের ধারণা হলো—খোদা যদি শক্তির আধার হন, আর সুলাইমান যদি হোন তার প্রতিনিধি; তাহলে আমরা? আমাদের পরিচয় কী? আমরা যাবো বিপরীত দিকে। কী বা কে হবে সেই বিপরীত মেরুর লক্ষ্য? সমুচ্চারিত হলো লুসিফারের নাম। নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ঐতিহাসিকদের ধারণা—সেই থেকেই ব্ল্যাক ম্যাজিক বা শয়তানের উপাসনার ধারার সূত্রপাত। পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ নির্মাতা, প্রকৌশলী আর ডিপ্লোম্যাটদের একটি দল হয়ে উঠল বিজাতীর সাধক। শুরু হলো শয়তানের পূজা, স্রষ্টা-বিরোধী ঘৃণ্য এক ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত।

পূজারী

সামাজিকভাবে যারা সবচেয়ে উঁচু, যাদের সম্মান প্রায় আকাশছোঁয়া, যাদের শক্তির কোনো তুলনা নেই, তাদেরকেই বেছে নেওয়া হতো শয়তানের পূজার জন্য। যেমন—রানি ভিক্টোরিয়া কিংবা স্যার চার্লস ওয়ারেন, তারা যদি হিরাম আবিফের ইতিহাস তুলে বেছে নেয় স্যাটানিক ভার্সেস—খারাপ তো লাগারই কথা। যদি ড্যান ব্রাউন কিংবা ক্রিস্টোফার নাইট ও রবার্ট লোমাসের মতো মানুষেরা এই রহস্যের জটের ওপর আলো না ফেলতেন, তাহলে হয়তো আমরা একে চিরকাল 'ফান' বলেই উপেক্ষা করতাম; কিন্তু একবিংশ শতাব্দী তো ছুটছে

আলো তথা ডিজিটের ওপর ভর করে। ভেড়ামারার সাধারণ এক কৃষক-সন্তান জ্ঞানী, নাকি কানাডার প্রধানমন্ত্রী—সেটা এখন আর ম্লেচ্ছ-ব্রাহ্মণ দিয়ে বিচার হবার নয়। মানুষের দ্বারা আরোপিত সব বর্ডার ভেঙে দিয়েছেন বিল গেটস।

তো, এখানে যে ম্যাসনদের কথা উঠে এলো, এদেরকে আবার ফ্রিম্যাসনও বলা হয়ে থাকে। খুব সংক্ষেপে এখানে তাদের সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য দেবো। এর প্রয়োজন ও যথার্থতা সামনে বুঝে আসবে। আশা করছি, এই সামান্য আলোচনা আপনার চিন্তাকে খুব বড়ো একটি ধাক্কা দিতে যাচ্ছে।

[২]

ফ্রিম্যাসনের পরিচয়

ফ্রিম্যাসন বলতে বোঝায় 'উদারতা' 'ভ্রাতৃত্ব' 'সমান-অধিকার' এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হওয়া একটি সুসংহত দল। ফ্রিম্যাসন দুটি শব্দ নিয়ে গঠিত হয়েছে। Free অর্থ স্বাধীন। Mason অর্থ কারিগর। দুটো শব্দ মিলে হয় Freemason তথা স্বাধীন কারিগর। ইতিহাসে স্বাধীন কারিগর নামে দুটি দলের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমটির কার্যপ্রভাব থেকেই দ্বিতীয়টির সৃষ্টি। তবে দুটোর কর্ম পদ্ধতি এবং বিশ্বাস ভিন্ন ভিন্ন। প্রথমটির যাত্রা শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫ সালে। আর দ্বিতীয়টির যাত্রা ইহুদিদের ব্যাবিলনীয় বন্দিদশার (খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬-৫৩৯) সময়।

শুরুর কথা

খ্রিস্টপূর্ব ৭১৫ সাল। রোমান সাম্রাজ্যের অধিশ্বর তখন সম্রাট নিউম পোম্পিলিউস (খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩-৬৭৩)। তিনি ভাবলেন, ধর্মীয় স্থাপনা, সম্রাটদের মূর্তি, দূর্গপ্রাচীর বানানোর জন্য একদল কর্মঠ শক্তিশালী লোককে একত্র করতে হবে। তিনি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথাও চিন্তা করলেন। কথা অনুযায়ী কাজ। তিনি রাজ্য থেকে সুনিপুণ কারিগরদের খুঁজে এনে তাদের একত্র করলেন। তাদের মাধ্যমে তিনি একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে কারিগরি শিক্ষা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের চর্চা হবে। তিনি এর নাম দিলেন 'স্বাধীন কারিগর একাডেমি'।

সম্রাট এই সংঠনটির একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিলেন। সদস্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ করলেন। দলনেতার নাম দেওয়া হলো 'উস্তাদ'। তার অধীনে ছিল একদল কর্মী, যাদেরকে ছাত্র, সহকারী, হিসেবরক্ষক, কলমচি এবং স্বাস্থ্য-সুরক্ষা কমিটি ইত্যাদি পদে ভাগ করে দেওয়া হলো। তবে মোটাদাগে তাদেরকে তিনভাগ করা হলো উস্তাদ, ছাত্র ও সহযোগী।

প্রতি পাঁচ বছরে সংগঠনটির সদস্যসভা অনুষ্ঠিত হতো। তাদের কার্যক্রম এবং আলোচনা শুরুর আগে ধর্মীয় রুসুম পালন করা হতো। তাদের প্রার্থনা শুরু হতো 'মহাবিশ্বের স্থপতি' (তাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা) এর নামে। সভাতে সমসাময়িক পার্থিব জ্ঞান, শিষ্টাচার এবং কারিগরিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। অল্পদিনেই রোমান সাম্রাজ্যে তাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

রোমানদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনটির পরিধিও বাড়তে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ সালে উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চল (বর্তমান তিউনিসের কার্থাজ শহর) এবং প্রাচীন গুল শহরগুলো (বর্তমান বেলজিয়াম, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও উত্তর ইতালি) রোমানদের হাতে আসলে সেখানেও সংগঠনের কার্যক্রম চলতে থাকে। এই অঞ্চলগুলোর ধর্মীয় প্রতীক, সুদর্শন স্থাপনা এবং দুর্গপ্রাচীরগুলো এদের হাতেই নির্মিত হয়েছিল। যুগে-যুগে রোমান এম্পায়ারের অনুগত দেশগুলোতে কোসোটিউস, খিস, মার্ক স্টালিয়াস, পেনালিয়াস, সাইরেস, ক্লোরসেস এবং কারসেসদের মতো মহান স্থপতিরা এই সংগঠনটি পরিচালনা করে গেছেন।

ব্যাবলনীয় বন্দিদশা এবং ইহুদি ফ্রিম্যাসন

ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা ইহুদিদের ইতিহাসের এক সংকটপূর্ণ অধ্যায় ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালের কথা। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের বাদশাহ বুখতে নাসার জেরুজালেমে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে হাজার হাজার যুদ্ধবাজ সেনা। ব্যাবিলন সাম্রাজ্যের পরিধি আজ জেরুজালেম পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে বুখতে নাসার শহরে প্রবেশ করলেন। পুরো শহর গুঁড়িয়ে দিলেন. সুলাইমান আলাইহিস সালামের মসজিদে আকসাও তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাদ পড়ল না। হাজার হাজার ইহুদি নিহত হলো। জীবিতদের বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যাওয়া হলো। ইহুদিরা দুইভাগে ইহুদি রাজত্ব পরিচালনা করত। দক্ষিণ সাম্রাজ্য এবং উত্তর সাম্রাজ্য। খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৭ সালে উত্তর সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল এসোরিয়ানদের হাতে। আজ দক্ষিণ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে গেল।

ব্যাবিলনীয় বন্দিদশায় ইহুদিরা প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত করে। এ সময়ে ইহুদি পাদরিরা একটি ধর্মীয় কিতাব রচনা করে। এর নাম হলো তালমুদ[২]। ইহুদি পাদরিরা সাধারণ বোকা ইহুদিদের বলল, 'এই কিতাব তোমাদের পাদরিদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাবে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সুসংবাদ দেওয়া আছে। তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা একসময় এই গোটা পৃথিবীর অধিশ্বর হবে'। তোমরা তাঁর প্রিয়তম বান্দা এবং তোমরা তার উপাদান থেকেই সৃষ্ট। তাই তোমাদের রব তোমাদের সাথে এই অঙ্গীকার করেছেন'। ইহুদিদের সাহস যোগাতে পাদরিরা এই কাজ করেছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কিতাবই তাওরাতের স্থান দখল করে নেয় এবং ইহুদিদের মগজে এই উদ্ভট ভাবনা প্রোথিত হয়ে যায়।

তালমুদের এই মিথ্যা ঘোষণা থেকেই ইহুদিরা বিশ্ব দখলের স্বপ্ন দেখা শুরু করে। এই ভবিষ্যৎবাণী বাস্তবায়নের জন্য তারা একটি সুসংহত দল তৈরি করে। যাদের কাজ ছিল হাইকালে সুলেমানি এবং ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পেছনে নিজের সর্বত্র ব্যয় করা। একসময় এই সুসংহত দলটিই 'ফ্রিম্যাসন' এর রূপ নেয়। রোমান স্থপতিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই তারা নিজেদের জন্য এই নামটি বেছে নিয়েছিল।

ফ্রিম্যাসনের যাত্রা ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছিল, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বহু মত পাওয়া যায়। যুগে-যুগে দলটি অতি গোপনভাবে কার্য পরিচালনা করে আসছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও তারা নিজ উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যর্থ হয় নি। তাই তাদের উপস্থিতি মানুষ আঁচ করতে পারে নি। এইজন্য ঐতিহাসিকরা

---

২ তালমুদ : ব্যাবিলনীয় বন্দিদশায় ইহুদিরা প্রায় সত্তর বছর অতিবাহিত করে। এই বন্দিত্বকালীন সময়ে ইহুদি পাদরিরা একটি ধর্মীয় কিতাব রচনা করে। এরই নাম হলো তালমুদ। ইহুদি পাদরিরা সাধারণ বোকা ইহুদিদের বলে, 'এই কিতাব তোমাদের পাদরিদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাবে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ সুসংবাদ দেওয়া আছে। তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা একসময় এই গোটা পৃথিবীর অধিশ্বর হবে। তোমরা তাঁর প্রিয়তম বান্দা এবং তোমরা তার উপাদান থেকেই সৃষ্ট। তাই তোমাদের রব তোমাদের সংগে এই অঙ্গীকার করেছেন।' ইহুদিদের সাহস যোগাতে পাদরিরা এই কাজ করেছিল; কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই কিতাবই তাদের মাঝে তাওরাতের স্থান দখল করে নেয় এবং ইহুদিদের মগজে এই উদ্ভট ভাবনা প্রোথিত হয়ে যায়।

নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমাদের কাছে যেই মতটি শক্তিশালী মনে হয়েছে আমরা ওপরে সেটাই তুলে ধরেছি।

ফ্রিম্যাসনের ভাগ

ফ্রিম্যাসনেরা মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত :

- ১. সাধারণ প্রতীকী ফ্রিম্যাসন : বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে 'উদারতা','ভ্রাতৃত্ব', 'সমান অধিকার'-এর নামে এই ভাগটিই কাজ করে। এই ভাগের সদস্যরা সমাজের গণতান্ত্রিক নেতা, উদারপন্থী লেখক ও মিডিয়াকর্মী হয়ে থাকে। সদস্যদের ম্যাসনীয় রুসুম-রেওয়াজ পালন করে বিভিন্ন স্তর অর্জন করতে হয়। যার যতটুকু চেষ্টা তার স্তর ততো উন্নত হতে থাকে। সর্বোচ্চ স্তর হলো '৩৩ ডিগ্রি'। ৩৩ ডিগ্রি হলো তেত্রিশটি স্তরের সমাগ্রিক নাম। প্রত্যেক স্তরের আলাদা আলাদা নাম রাখা আছে। সর্বশেষ স্তরের নাম হলো 'গ্রেট মেসন'। এই ভাগের সদস্যরা অধিকাংশই অ-ইহুদি হয়।

- ২. রাজপদ ফ্রিম্যাসন : এই ভাগে বিশেষভাবে ইহুদিরাই সদস্য হয়ে থাকে। অ-ইহুদিদের এই ভাগে কোনো জায়গা নেই। প্রথম ভাগের 'তেত্রিশ ডিগ্রি' অর্জনকারীরাই এই ভাগে আসার সুযোগ পেয়ে থাকে। তবে যারা ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তাদের চরম আস্থা অর্জন করতে পারে তারাও কখনো কখনো এই ভাগে আসার সুযোগ পায়। এই ভাগের সদস্যদের তালমুদে যে হাইকালে সুলেমানি এবং ইহুদি রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, তার ওপর প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখতে হয়। খোদার কসম করে তাদের এজেন্ট হয়ে কাজ করার কথা জানাতে হয়।

- ৩. স্থপতি ফ্রিম্যাসন : ফ্রিম্যাসনের এই ভাগটিই মূলত লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করে। এই ভাগের প্রধান কে—আজও কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারে নি। ধারণা করা হয়, দাজ্জালই এই ভাগের ছায়াপ্রধানের মতো। ইহুদি গোত্র 'ইয়াহুজা' এর লোকেরাই শুধুমাত্র এই ভাগের সদস্যপদ পায়। সদস্যদের সীমিত কোটা থাকে তিনশত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অদৃশ্য নিয়ন্তা যে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীটি, সেই গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রয়েছে ফরাসি লেখক ভলতেয়ার, জার্মান সঙ্গীতবিদ মোজার্ট, মার্কিন বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে বর্তমান কালের 'যুদ্ধাপরাধী' মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ।

উপমহাদেশীয় ফ্রিম্যাসনারি

অনেকে মনে করেন, উপমহাদেশেও এদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একাধিক ব্যক্তি রয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, যিদ্দু কৃষ্ণমূর্তি, রাধাকৃষ্ণা, রাজ টাটা; স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের মধ্যে রাম প্রসাদ বিসমিল, ভগত সিং, শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, ভাই পরমানন্দ এবং লালা লাজপাট রায়, শ্রী অরবিন্দ এবং সুবাস চন্দ্র বোস পর্যন্ত এরা সবাই ফ্রিম্যাসন ছিলেন। ঠিক একইভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ফ্রিম্যাসন ছিলেন। বর্তমানের ভোডাফোনের অরুন সারিন, টাটা এন্টারপ্রাইজের রতন টাটা সবাই ফ্রিম্যাসন।[৩]

---

৩ Denslow, William R.; Truman, Harry S. (2004). 10,000 Famous Freemasons from A to J. Kessenger Publishing LLC. ISBN 1-4179-7579-2. Retrieved 23 January 2012. https://bit.ly/2YNNCqQ

[৩]
মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়া' অনুযায়ী ইলুমিনাতি

'দ্য ইলুমিনাতি' একটি গুপ্ত সংগঠন। ১৭৭৬ সালের ১লা মে ব্যাভারিয়াতে অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইলুমিনাতি শব্দের অর্থ 'যারা কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকিত বা জ্ঞানার্জনের দাবি করে' অথবা 'বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন কোনো দল'।

অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট একজন জেসুইট ছিলেন। পরে ব্যাভারিয়ার ইঙ্গলস্ট্যাড বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্রিষ্টান ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তার হাতেই গড়ে ওঠে এই ইলুমিনাতি। অনেকেই ধারণা করে থাকে, ইলুমিনাতির সৃষ্টির পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে ফ্রিম্যাসনরা। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের চোখে ইলুমিনাতিরা 'ষড়যন্ত্রকারী' হিসেবে পরিগণিত হয়। অনেকের মতে, এরা নতুন বিশ্বব্যাবস্থা গড়ে তোলার নীল নকশা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ড্যান ব্রাউন রচিত *এঞ্জেল্স অ্যান্ড ডিমন্স* উপন্যাস প্রকাশের ফলে এই সংগঠনটি আধুনিককালে আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

ইলুমিনাতির উদ্ভবের যথাযথ কারণ এখনো বিশ্লেষকদের কাছে পরিষ্কার নয়। নতুন পৃথিবী গড়া তাদের মূল লক্ষ্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে তারা ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে গুপ্তভাবে যথেষ্ট সোচ্চার। বিশেষভাবে ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার ধর্মীয় নৈতিক স্খলনগুলো এদের দ্বারাই প্রকাশ্যে আসে। নতুন করে বর্তমান সময়ে এটি আবার আলোচিত হতে শুরু করেছে। মানুষ মনে করে থাকে, ইলুমিনাতি সদস্যরা পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করে।'

উইকিপিডিয়ার ওপরের স্বীকারোক্তি মূলত সত্যকে আড়াল করে জনমানসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। তাছাড়া, ইলুমিনাতির ইচ্ছার বাইরে গিয়ে তথ্য প্রকাশের দুঃসাহস উইকিপিডিয়ার নেই।[৪]

---

৪ মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া : https://bit.ly/34nfvat

[৪]

ডলারের অসমাপ্ত পিরামিড

আমেরিকান ডলার দেখেছেন নিশ্চয়-ই? ডলারে মুদ্রিত অসমাপ্ত একটা পিরামিডের ছবি আছে। পিরামিডের নিচে লেখা : Novus ordo seclorum—মানে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার।

অনেকে বলে থাকেন, এটা আসলে 'সেক্যুলার ওয়ার্ল্ড অর্ডার'। সেক্যুলার মানে—ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ধর্মকে বাদ দিয়ে। আবার উপরে লেখা annuit coeptis—মানে he approves the undertaking (আমেরিকার অধিগ্রহণ 'তিনি' অনুমোদন দিয়েছেন)। ডলারটিতে আড় বরাবর আরও লেখা, 'In god we trust'.
বিশ্বাস করে সেটা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেক কন্সপিরেসি থিওরি-মতে, ম্যাসনরা স্যাটানিক। অর্থাৎ তাদের 'গড' বা 'তিনি'টা আসলে লুসিফার/স্যাটান। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম/মুসলিমদের এর 'গড' এ তারা বিশ্বাস করে না বোঝা গেল; কিন্তু আমেরিকার স্থপতি ম্যাসনরা কোন 'গড'-এ বিশ্বাস করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম যে দাজ্জাল/এন্টিক্রাইস্টের বর্ণনা দিয়েছেন সেই দাজ্জাল হবে একচোখা, যা ম্যাসনদের প্রতীক all seeing eye-এর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। ধারণা করা হয়, বর্তমান বিশ্ব ম্যাসনদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ইংল্যান্ডের রানী—সবাই ফ্রিম্যাসন। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডের রাজবংশের সাথে আমেরিকার বেশিরভাগ রাষ্ট্রনায়কের রক্ত-সম্পর্ক আছে। আরও অবাক করা বিষয়, ইংল্যান্ডের রাজবংশ 'windsore'-রা নাকি আসলে মিশরের ফারাওদের বংশধর!

সে যাইহোক, বর্তমান আমেরিকা যে ম্যাসনদের বহু পরিকল্পিত এক ভূমি—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাদের 'সেক্যুলার' দুনিয়া পাবার আকাঙ্ক্ষার পাশেই লেখা In god we trust-এ যে গডের কথা বলা হয়েছে সেটা কোন গড? এটা কি লুসিফার, নাকি প্রাচীন সূর্যদেবতা হোরাস, নাকি জিসাসের গড? সবকিছু মিলিয়ে ম্যাসনদের কাজকারবার যেন আলো আঁধারে ঘেরা এক রহস্যই সবার কাছে। আর এই রহস্যে আলো ফেলতেই আসে আধুনিককালের

'ইলুমিনাতির' কথা। ইলুমিনাতি মূলত ম্যাসন বা ফ্রিম্যাসনদের আপডেটেড ভার্সন। আসুন, জেনে নিই, আধুনিককালের ইলুমিনাতি বা শয়তান-পূজারীদের জন্মের ইতিবৃত্ত।[৫]

---

৫ '*Illuminati; The cult that Hijaked the world*' by- Henry Makow; '*Illuminati 2; Deceit and Seducation* dy- Henry Makow; 'Conspiratons Hiearchy: The Committee of 300' by- Dr. Jhon Coleman; 'A summary of the secret society the 'Illuminati', Brown from the works of Henry Makow; 'The society of enlightenment' by- Richard Van Dulmen

[৫]
আধুনিক ইলুমিনাতির জন্ম

১৮ শতকের কথা। ইউরোপে তখন ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের রাজত্ব চলছে। ক্যাথলিজমের বিরুদ্ধে তখন কারও মুখ খোলার দুঃসাহস ছিল না। বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু গোপন সংস্থা গড়ে উঠলেও সমাজবিপ্লব বা বড় কোনো আন্দোলনে তাদের উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান ছিল না। সে শতাব্দীতেই ১৭৭৬ সালে জার্মানির দক্ষিণপূর্ব বৃহত্তম রাজ্য ব্যাভারিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে 'ইলুমিনাতি'। ব্যাভারিয়ার ইঙ্গলস্ট্যাড ইউনিভার্সিটির খ্রিস্টীয় আইন ও ব্যবহারিক দর্শনবিদ্যার প্রফেসর ছিলেন অ্যাডাম ওয়েইশপ্ট [Adam Weishaupt] (1748–1830)। তার হাত ধরেই সূচিত হয় আধুনিক ইলুমিনাতির যাত্রা। ১৭৭৬ সালের পহেলা মে চারজন ছাত্রসহ এ-যাত্রা শুরু করেন তিনি। অথচ সে সময় ইঙ্গলস্ট্যাড ইউনিভার্সিটি ছিল সম্পূর্ণ জেসুইট প্রভাবিত। তারা প্রথাগতভাবে খ্রিস্টীয় সকল অনুশাসন মেনে চলত দ্বিধাহীনভাবে। প্রথম ইলুমিনাতির লোগো হিসেবে নির্ধারণ করা হয় গ্রিক জ্ঞানদেবী মিনারভার পেঁচা।

প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডামের পরিচয়

ইলুমিনাতির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডাম ছিল একজন ইহুদি ধর্মযাজকের ছেলে; কিন্তু সে নিজেকে পরিচয় দিত একজন ক্যাথলিক খ্রিস্টান হিসেবে। তার ইলুমিনাতি প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল, খ্রিস্টধর্মের বিনাশ, রাজতন্ত্রের বিনাশ, বিশ্ব সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বন্ধন এবং বিবাহব্যবস্থার উচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রদ করা এবং সর্বোপরি জাতিগত পরিচয় মুছে ফেলা। অ্যাডাম ওয়েইশপ্টের পরিবারের সঙ্গে জেসুইট সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল। জেসুইট সম্প্রদায়টি অকাল্ট এবং ভারতীয় যোগশাস্ত্র চর্চা করত বলে তারা ছিল রহস্যময়। অনেকের মতে জেসুইট সম্প্রদায়ের গুহ্য প্রতীক এবং সংকেত পরবর্তীকালে অ্যাডাম তার প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর

প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। অ্যাডাম ইলুমিনাতি গোষ্ঠীকে ফ্রিম্যাসনারি গোষ্ঠীর 'চূড়ান্ত স্তর' হিসেবে দেখতেন।

ইলুমিনাতির জন্মস্থান

বর্তমান জার্মানির মানচিত্রে ইঙ্গলস্ট্যাড শহরের অবস্থান। এখানেই অষ্টাদশ শতকের শেষে ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকে ইঙ্গলস্ট্যাড ছিল ব্যাভারিয়ার অর্ন্তগত। প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডামও জন্মেছিলেন এখানেই। অ্যাডামের জন্মস্থান হওয়ায় এই ছোট্ট শহরটি একসময় আলোচনায় উঠে আসে।

জন্মদিন নির্ধারণের নেপথ্যে

অ্যাডম ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১ তারিখকে বেছে নিয়েছিল। কারণ, ওই দিনটি ছিল আদিম প্যাগানদের পবিত্র দিন। অনেকে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ফ্রিম্যাসনারি এবং ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর পরিকল্পিত 'প্রজেক্ট' বা 'এজেন্ডা' হিসেবে দেখেন। মে মাসের ১ তারিখ কমিউনিস্টদের এক বিশেষ দিন। তাছাড়া ওই ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দই American Declaration of Independence ঘোষিত হয়েছিল এবং মার্কিন ওই ঐতিহাসিক ঘটনার নায়কদের অনেকেই ছিলেন ফ্রিম্যাসন—যারা ইউরোপ থেকে অষ্টাদশ শতকে 'নতুন বিশ্বে' গিয়েছিল। ইলুমিনাতি গোষ্ঠীর ভেতরে অ্যাডাম ছদ্মনাম ধারণ করেছিলেন। অ্যাডামের ছদ্মনাম ছিল 'স্পার্তাকাস'। অ্যাডাম বলেছিল, ইলুমিনাতি বিশ্বময় One World Order প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

ইলুমিনাতির শব্দের অর্থ

ইলুমিনাতি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো—এমন একদল লোক, যারা কোনো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। ইলুমিনাতি সদস্যদের ভাষ্যমতে, তারা কুসংস্কারমুক্ত (মূলত ধর্মীয় বন্ধন ও আচার-প্রথামুক্ত) এক নতুন পৃথিবী প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে। তারা বিশ্বময় One World Order প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই ইলুমিনাতি অন্য ভাষায় 'ইলুমিনাতি অব ব্যাভারিয়া' অথবা 'ইলুমিনাতি অর্ডার' নামেও পরিচিত।

ইলুমিনাতির উপাস্য

ইলুমিনাতি মূলত 'লুসিফার[৬]'-এর (শয়তানের) পূজা করে। তারা কোনো কিছুকে ভয় পেতে বারণ করে। তারা চায়—মানুষ বাধাহীনভাবে সব কাজে মেতে উঠুক; এমনকি যদি তা অযাচারও হয়। তারা বরং অশ্লীলতার বিস্তার চায়। কারণ, এতে সভ্যতা খুব দ্রুত ধ্বংস হবে। যার ফলে তারা মানুষকে বশে আনতে পারবে। তাই তারা চেষ্টা করে মানুষকে বেশি করে যৌনতার প্রতি আকর্ষিত করতে। তারা মানুষকে বশে আনার জন্য এমনভাবে কৌশল প্রয়োগ করে, যাতে মানুষ খুব সহজেই কাবু হয়ে যায়। বলতে গেলে শয়তান বা ফেরাউনের মাস্টার প্ল্যানিংয়ের মতো।

যেমন প্রথমদিকে শয়তান এসে হাওয়া আলাইহাস সালামকে বলেছিল, 'আল্লাহ তো আপনাকে এ ফলটি খেতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু দেখতে তো নিষেধ করেন নি। আসেন, একটু দেখেন।' এরপর ধীরে ধীরে গন্ধ শোঁকার জন্য উৎসাহিত করে। তারপর ছুঁয়ে দেখতে আকর্ষিত করে এবং সবশেষে তা খাইয়েই ছাড়ে। শয়তান কিন্তু সরাসরি তাকে খেতে বলে নি। শয়তান তার প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে ধীরে ধীরে, সূক্ষ্ম কৌশলের মাধ্যমে।

ফেরাউনের কাছে ক্ষমতা যাওয়ার পর তার ইচ্ছা জাগে খোদা বলে পরিচিত হওয়ার। সে তার বিজ্ঞ বন্ধুর কাছ থেকে এ বিষয় পরামর্শ চাইলে সে বলে, সমাজের জ্ঞানচর্চা বন্ধ করে দিতে হবে। ফেরাউন পরামর্শ অনুসারে তা-ই করে। ফলে বনি ইসরাইল জাতি কিছু বছর পর মূর্খ জাতিতে পরিণত হয়। তখন সেই মূর্খ সমাজকে ফেরাউনের বশে আনতে পরবর্তী সময়ে মোটেও বেগ পেতে হয় নি।

ইলুমিনাতির সদস্যরা

'ইলুমিনাতি' একটি রহস্যপূর্ণ গোপন সংগঠন। এর সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ এবং বিশ্ব মিডিয়ার রাঘব বোয়ালরা। ইলুমিনাতি একটি গুপ্তসভা, যা বিশ্বের সকল দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে,

---

৬ শয়তানকে লুসিফার বলা হয়। এটি বাইবেলীয় পরিভাষা।

ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে দেশে অত্যাচারী সরকারব্যবস্থা কায়েম করে দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষের ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

[৬]

কর্মপদ্ধতি; যে ধারায় সামনে বাড়ে ইলুমিনাতি

ইলুমিনাতি মূলত বিভিন্ন শক্তিশালী ধর্মীয় সংগঠন, রাজনৈতিক সংগঠন এবং সরকারব্যবস্থার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং মিডিয়া ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকানা এবং কর্তৃত্ব গ্রহণ করে বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। ধারণা করা হয়, তাদের কর্মকাণ্ডের ফলেই বিশ্বের প্রায় প্রধান প্রধান যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে আরও হবে। বিশ্বের নানা ধরনের অযাচিত বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মূলত এরাই দায়ী। এমনকি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ৯/১১-এর জন্যও এদেরকে দায়ী করা হয়। চলমান 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ও দেশে দেশে পুলিশি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য তাদের একটি ঠুনকো অজুহাত মাত্র।

'কেন্দ্রীয় ব্যাংক কার্টেল স্ক্রিপ্ট' হচ্ছে ঐতিহাসিক এবং সংস্কৃতিগতভাবে তাদের একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। তাদের মূল অস্ত্র হচ্ছে যুদ্ধ, যা তারা তাদের বিত্ত এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাথা খাটিয়ে লাগিয়ে থাকে। যুদ্ধ করার জন্য তারা প্রথমে বিভিন্ন জাতির কাছে অস্ত্র বিক্রির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দা করে এবং পরে পুনর্গঠনের নামে আবারও সমৃদ্ধ করে তাদের অর্থের ভান্ডার।

ইলুমিনাতি 'গণতন্ত্র' এবং চার্চকে সম্পূর্ণ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বংশগতভাবে অভিজাতশ্রেণির আধিপত্য এবং তাদের অর্থের ক্ষমতার মাধ্যমে। রাজনীতি এবং চার্চ এখন তাদের সম্পূর্ণ দখলে।

ইলুমিনাতি ব্যাংকাররা ক্রমবর্ধমানভাবে দখলে নিয়েছে বিশ্বের সকল দেশের ঋণব্যবস্থাকে। একটি সর্বগ্রাসী বিশ্ব সরকার বা 'দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' কায়েমের লক্ষ্যে এবং তাদের নিজস্ব ঋণসমূহকে নিরাপদ রাখতে ও সুদমুক্ত ঋণ পেতে তারা রাষ্ট্রগুলোকে খেলাপী করে তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। ধারণা করা হয়, বিশ্বের অধিকাংশ নেতা আন্তর্জাতিক এই সংগঠনের কনিষ্ঠ সদস্য। এই সকল সদস্যকে ব্ল্যাকমেইলিং, অবৈধ যৌন আনন্দ প্রদান, অর্থনৈতিক

সুবিধা কিংবা শোষণ, নির্যাতন এমনকি হত্যার হুমকি দিয়ে সংগঠনভুক্ত করা হয়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইলুমিনাতির বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার একটি ছদ্মরূপ। একই কারণে, উনিশ শতকে জার্মানি গড়ে ওঠার পর তারা দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ মঞ্চায়ন করে। তারপর আরও একটি লাভজনক স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করে। আর এখন তাদের লক্ষ্য, আমেরিকার ঘাড়ে পা দিয়ে সকল ক্ষমতা তথাকথিত বিশ্ব সরকারব্যবস্থার কাছে হস্তান্তর করা, যার পুরোটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে।

ইতিহাস নিজেই নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে থাকে; কারণ, এটা একটি পূর্বলিখিত স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে চলে। দু'শো বছরেরও বেশি সময় ধরে 'রথসচাইল্ড ব্যাংকিং সিন্ডিকেট' স্বৈরশাসনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে ইলুমিনাতিকে ব্যবহার করে আসছে যুদ্ধের মদদদাতা হিসেবে। ইলুমিনাতি নিয়ন্ত্রণ করে চারপাশের সবকিছু; আমরা সবাই দাবার গুটি হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হই। ইলুমিনাতি প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র করছে বর্তমান সভ্যতা ধ্বংস করতে এবং আমাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর তৈরি করতে চাইছে তাদের নতুন বিশ্ব স্বৈরব্যবস্থা।

১৯০১ থেকে ১৯০৯ সালে টেডি রুজভেল্ট প্রশাসনের[৭] সময়ে মূলত ব্রিটিশ ব্যাংকাররা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি এবং ব্যাবসা-বাণিজ্য অধিগ্রহণ করে। সেই সময় জে.পি. মরগানকে[৮] সামনে রেখে রথসচাইল্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ ভাগ ব্যাবসা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের আসল পরিচয়কে আড়াল করে এর ছদ্মনাম দেওয়া হয় 'ক্রাউন'। ক্রাউন শব্দটি একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় আন্তর্জাতিক ফিনান্সিয়াল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে, যার প্রধান কার্যালয় ছিল লন্ডনে। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড একটি ব্যক্তি-মালিকানাধীন

---

৭ টেডি রুজভেল্ট প্রসাশন (২৩) : ১৯০১-১৯০৯ পর্যন্ত আমেরিকার ছাব্বিশতম প্রেসিডেন্ট থিওডর রুজভেল্টের প্রসাশনিক কালকে টেডি রুজভেল্ট প্রসাশন বলা হয়।

৮ জে পি মরগান (২৩) : জন পিয়ারপন্ট মরগান সিনিয়র (এপ্রিল ১৭, ১৮৩৭ - মার্চ ৩১, ১৯১৩) একজন আমেরিকান পুঁজিপতি এবং ব্যাংকার ছিলেন। যিনি গিলডেড যুগে ওয়াল স্ট্রিট-এ কর্পোরেট পুঁজিবাদে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। জে পি মরগান অ্যান্ড কোং-এর মতো ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে শিল্প একীভূতকরণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

প্রতিষ্ঠান এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো নিয়ম এদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। এটা ছিল একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন বিশ্বক্ষমতার প্রতীক।

ব্রিটিশ, আমেরিকান, জার্মান, জাপানিজ এমনকি ইহুদি সাম্রাজ্যবাদ বলে আসলে কিছু নেই। এরা সবাই এই একক রথসচাইল্ড সাম্রাজ্যবাদের পুতুলমাত্র। যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইসরাইলসহ পুরো পৃথিবীকে একটি উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে এবং এটাই হচ্ছে 'দ্য নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'-এর মর্মার্থ।

ধারণা করা হয়, বর্তমানে ইলুমিনাতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইউরোপ এবং আমেরিকার ১৩টি সম্পদশালী পরিবার;[১] যাদের শক্তির মূলে রয়েছে অকাল্ট এবং ইকোনমি। মধ্যযুগের ইউরোপের নাইট টেম্পলারদের শক্তির মূলেও ছিল ওই অকাল্ট এবং ইকোনমি। এই পরিবারগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিক এবং অকাল্টচর্চা (মূলত শয়তানের উপাসনা) করে বলেই এদের বলা হয় 'কৃষ্ণ অভিজাত' বা 'ব্ল্যাক নোবেলিটি'। বর্তমান বিশ্ব এই 'শয়তান উপাসক' সিক্রেট কাল্টই শাসন করছে। এদের পূর্বপুরুষও প্রাচীনকালে বিশ্ব শাসন করত। এরা আজও আন্তবিবাহের মাধ্যমে প্রাচীন রক্তের ধারা বা 'ব্লাডলাইন' অক্ষুণ্ন রেখেছে। ইলুমিনাতি ক্রমশ 'এক সরকার' এবং 'নতুন বিশ্বব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য, সমগ্র বিশ্বকে দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখা। এ জন্য তারা দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছে। আধুনিককালে শিল্পায়ন এবং 'ইনফর্মেশন টেকনোলজি' তাদের উদ্দেশ্যপূরণে সাহায্য করছে। বর্তমান এক ডলার নোটে আমেরিকার গ্রেট সিল দেখা যায়, সেখানে পিরামিডের ওপর এক চোখ দেখা যায়, যার নাম 'Eye of Providence' বা 'all-seeing eye of God'। আরও লেখা আছে লাতিনে E pluribus unum (অর্থ 'Out of many, one') ও Novus ordo seclorum (যার

---

১ ১৩ টি প্রভাবশালী ফ্যামিলি : ১. দি এস্টর ব্লাডলাইন (The Astor Bloodline); ২. দি বান্ডি ব্লাডলাইন (The Bundy Bloodline); ৩. দি কলিন্স ব্লাডলাইন (The Collins Bloodline); ৪. দি দ্যুপন্ট ব্লাডলাইন (The DuPont Bloodline); ৫. দি ফ্রিম্যান ব্লাডলাইন (The Freeman Bloodline); ৬. দি ক্যানেডি ব্লাডলাইন (The Kennedy Bloodline); ৭. দি লি ব্লাডলাইন (The Li Bloodline); ৮. দি ওনাসিস ব্লাডলাইন (The Onassis Bloodline); ৯. দি রেনল্ডস ব্লাডলাইন (The Reynolds Bloodline); ১০. দি রকফেলার ব্লাডলাইন (The Rockefeller Bloodline); ১১. দি রথসচাইল্ড ব্লাডলাইন (The Rothschild Bloodline); ১২. দি রাসেল ব্লাডলাইন (The Russell Bloodline); ১৩. দি ব্যান দ্যুন ব্লাডলাইন (The Van Duyn Bloodline);

মানে New order of the ages)। ইলুমিনাতি তত্ত্ববিশ্বাসীরা মনে করেন, এই এক চোখ প্রমাণ করে আমেরিকা ইলুমিনাতির দখলে আছে। পিরামিডের নিচে লেখা আছে MDCCLXXVI যা মূলত রোমান সংখ্যায় ১৭৭৬। অবাক কাণ্ড হলো, ইলুমিনাতিও ১৭৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত!

১৭৯৮ সালের কিছু আগে জন রবিসন Proofs of a Conspiracy নামে এক বই লেখেন। একই বিষয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি আরও একটি বই লেখেন। দুটো বইই বেস্টসেলার হয়ে ওঠে। তাতে অনেক সাড়াজাগানো তথ্যের পাশাপাশি এ-ও বলা হয় যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের পেছনের কলকাঠিও আসলে ইলুমিনাতিই নেড়েছে।

এ ছাড়াও আরও অনেক ষড়যন্ত্রতত্ত্ব প্রচলিত আছে ইলুমিনাতির নামে। উদাহরণস্বরূপ :

- ১) ষড়যন্ত্র তত্ত্বমতে, শক্তিমান সিক্রেট সোসাইটি ইলুমিনাতি মূলত এ বিশ্বের সকল প্রধান ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে।
- ২) ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের[১০] সূচনাও ইলুমিনাতির হাতেই হয়েছে।
- ৩) নেপোলিয়নের ওয়াটারলু যুদ্ধের[১১] ফলাফল নির্ধারণ করে ইলুমিনাতি।

---

১০ ফ্রেঞ্চ বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৯) ফরাসি, ইউরোপ এবং পশ্চিমা সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে প্রজাতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং একই সাথে দেশের রোমান ক্যাথলিক চার্চ সকল গোঁড়ামী ত্যাগ করে নিজেকে পুনর্গঠন করতে বাধ্য হয়। ফরাসি বিপ্লবকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি জটিল সন্ধিক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, যার মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতা নিরঙ্কুশ রাজনীতি এবং অভিজাততন্ত্র থেকে নাগরিকত্বের যুগে পদার্পণ করে। ঐতিহাসিকরা এই বিপ্লবকে মানব ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করেন।

১১ ওয়াটার লু'র যুদ্ধ ১৮১৫ সালের ১৮ জুন বেলজিয়ামের ওয়াটার লু নামক স্থানে সংগঠিত হয়। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই যুদ্ধে দুইটি সম্মিলিত শক্তি ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং গাবার্ড ভন বুচারের অধীন পার্শিয়ান সেনাবাহিনীর নিকট পরাজিত হন। এই যুদ্ধের পরেই নেপোলিয়ানের পতন ঘটে, এবং তিনি 'সেন্ট হেলেনা দ্বীপে' নির্বাসিত হন৷

- ৪) আমেরিকান প্রেসিডেন্ট কেনেডির গুপ্তহত্যা[১২] আসলে ইলুমিনাতিই করিয়েছে; কারণ, তিনি তাদের কাজে বাধা দিচ্ছিলেন। এছাড়া আরও বেশ কিছু হত্যা তারা সংঘটিত করেছে নিজেদের উদ্দেশ্যে এবং অস্তিত্বের স্বার্থে।

ইলুমিনাতির বৃহৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে একটি ইউএফও ক্র্যাশ করানো হয় আমেরিকার রজওয়েলে, সেখান থেকে চারজন এলিয়েনকে উদ্ধার করা হয়। রজওয়েল হলো নিউ মেক্সিকোর মরুভূমিতে অবস্থিত একটি শহর, ১লা জুলাই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাত্রিতে একটি প্রচণ্ড ঝড় ও বজ্রপাতের সময় '৫০৯তম বোমারু দল'-এর বিমান ঘাঁটির রাডারে একটি অদ্ভুত ঘটনা ধরা পড়েছিল। রাডারে পর্দার এক কোণায় বার বার একটি বস্তু দেখা যাচ্ছিল। এটি এমন গতিতে যাচ্ছিল যে, ওই সময়ের সেনাবাহিনীর বিমানগুলোও (বর্তমান গতিরোধক বিমানগুলোও) সেই গতিতে যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারত না। রাডারের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বজ্রপাতের মতো দিক পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এটি ছিল ব্যাখ্যাতীত বিষয়, তারা রাডারের দ্বারা উৎপাদিত তড়িৎ-চুম্বকীয় সমস্যার জন্য রাডার পরীক্ষা করেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাডারে একটা জিনিস লক্ষ করা হলো যে, এটি আগের মতোই বজ্রপাতের মতো দিক পরিবর্তন করছে। তারা ভেবেছিল যে, কোনো সত্যিকার বস্তু, বিপদজনকভাবে অজানা এবং সম্ভবত যুদ্ধপ্রিয়—যা তাদের আকাশসীমা পার করছিল। পরে ৮ জুলাই তারিখে, রজওয়েল 'দৈনিক রেকর্ড' নামে একটি সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশ করেছিল যে, 'রজওয়েলের খামার অঞ্চলের ক্যামেরায় একটি উড়ন্ত বস্তু ধরা পড়েছে'। ঘটনাটি অন্যান্য স্থানীয় সংবাদপত্রতেও দেখা গিয়েছিল। ওই বছর ৮ জুলাইতে, বিমান বাহিনীর রেডিও-সংবাদপত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, রহস্যময় দূর্ঘটনাটি একটি উড়ন্ত বস্তুর দ্বারা ঘটেছিল। এই ঘটনাটির জন্য রজওয়েল শহরে ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) এসেছিল ব্যাপারটি পরীক্ষা করার জন্য। বিতর্কের কিছু দিন পরে, রজওয়েল সামরিক বাহিনীরা একটি বেলুনের ছিন্নাংশ দেখিয়েছিল, যেটি মুগুল নামের প্রোগ্রামটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এ সিস্টেমটি পারমাণবিক ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তৎকালীন চলমান বিগত বছরগুলোতে রজওয়েলের বাসিন্দাদের থেকে বিভিন্ন সংবাদ এসেছে

---

১২ রাজনৈতিক ইতিহাসে ইলুমিনাতি সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হত্যাকাণ্ড পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

বিমান বাহিনী এবং ফেডারেলের সম্বন্ধে। কিছু লোক বলেছিল যে, 'কখনো কখনো বিমান বাহিনীর কর্মচারীরা ধ্বংসাবশেষ এবং ফেডারেলের ট্রাকে দেহ (মানুষের না) বহন করে'; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এগুলো সব অস্বীকার করেছে।

এ ছাড়াও আকার পরিবর্তনে সক্ষম কিছু রেপ্টিলিয়ান[১৩] এলিয়েন দ্বারা তারা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের বদল করেছে, যেন তাদের মতোই দেখতে এলিয়েনরা কাজ চালিয়ে যায়। যেমন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ একজন রেপ্টিলিয়ান এলিয়েন। তা ছাড়া উন্নত ক্লোনিং প্রযুক্তির[১৪] মাধ্যমে আসল ব্যক্তিদের হুবহু ক্লোন বসিয়ে দিয়ে পুরো বিশ্বের দখল নিয়ে নিচ্ছে ইলুমিনাতি।

---

১৩ রেপ্টেলিয়ান হলো এক প্রকার প্রাণী। আকৃতিতে অনেকটা টিকটিকির মতো। স্বভাব-প্রকৃতিতে এলিয়েন। ধারণা করা হয়, মহাবিশ্বের কোথাও এলিয়েনের বসবাস রয়েছে। তাদের মেধা-বুদ্ধি অতুলনীয়, ধারণারও অতীত। রেপ্টেলিয়ানকে ঘিরে যে ষড়যন্ত্রতত্ত্ব তৈরি হয়েছে তা একেবারেই অমূলক নয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বহু দলিল-দস্তাবেজ উপস্থিত করেছেন। বর্তমান সময়ের ষড়যন্ত্রতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষক ডেভিড ইকের এ ব্যাপারে একটি ডকুমেন্টারি লেকচার আছে। যেখানে তিনি রেপ্টিলিয়ানের ধারণাকে ব্যতিক্রমভাবে তুলে ধরেছেন। তার বক্তব্যের খোলাসা ছিল এরকম—

> 'রেপ্টেলিয়ান বলতে আমরা অদৃশ্য এক প্রাণীকে বুঝি; যার ধারণা বিভিন্ন ধর্মে (ইসলাম ধর্মে জিন) পাওয়া যায়। তার বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি হলো, তারা যে কোনো প্রাণীর আকৃতি ধারণ করতে পারে। আমাদের কথা হলো, এরাই কিছু এলিট মানুষের ছদ্মবেশে আমাদের পৃথিবীতে বসবাস করছে। যাদের মধ্যে সংগীতশিল্পী, অভিনেতা, রাজনীতিবিদ, ব্যাংকারও রয়েছে। তাদের যোগাযোগ মূলত ১৩ টি ব্লাডলাইনের (বংশনামা) সংগে। রাজনীতিবিদ, কর্পোরেশন, ব্যাংক এবং এলিট ফ্যামিলির ওপরে তাদের ক্ষমতার স্তর।

ডেভিড ইকের বক্তব্যটি দেখুন— https://youtu.be/IgP88z6h-Zkl

১৪ কোনো জীবের একটি দেহকোষ হতে হুবহু ওই জীবটি পুনরায় তৈরি করার পদ্ধতিকে ক্লোনিং প্রযুক্তি বলা হয়। আণবিক জীববিজ্ঞানীরা দৈনন্দিন আরেক প্রকার ক্লোনিং করে থাকেন, যা হলো ডিএনএ ক্লোনিং। ১৯৯২ সালে রোজলিন ইনস্টিটিউট, স্কটল্যান্ডের গবেষক ড. আয়ান উইলমুট তার ২৭৩ তম চেষ্টায় ভেড়ার একটি দেহকোষের (স্তনবৃন্ত বা বাঁট থেকে সংগৃহীত) কেন্দ্রকে ভিন্নজাতের ভেড়ার কেন্দ্রবিযুক্ত ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপিত করেন এবং তা হতে প্রথমটির মতো ভেড়া তৈরি করে জীব ক্লোনিং এর সফল সূচনা করেন। এর মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিরাট এক বিপ্লব সূচিত হয়।

ইলুমিনাতি সম্পর্কে এখানে আমরা যা কিছু উল্লেখ করলাম, তার সবগুলো বিষয়ই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়। অনেকগুলোই ধারণাপ্রসূত। বাস্তবতা আল্লাহই ভালো জানেন।[১৫]

---

১৫ Illuminati; The cult that Hijaked the world' by- Henry Makow; 'Illuminati 2; Deceit and Seducation' dy- Henry Makow; 'Conspiratons Hiearchy : The Committee of 300' by- Dr. Jhon Coleman ; 'A summary of the secret society the 'Illuminati', Brown from the works of Henry Makow; 'The society of enlightenment' by- Richard Van Dulmen;

[৭]

মাস্টারপ্ল্যান; বাস্তবায়নে সক্রিয় অঙ্গসংগঠন

ফ্রিম্যাসন বা ইলুমিনাতির নাম নিলে প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে 'সিক্রেট সোসাইটি' তথা গোপন সংস্থার কথা। চোখের আড়ালের এইসব দলগুলো নিয়ে আলোচনা কিন্তু এখন প্রকাশ্যেই হচ্ছে। প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে এদের কর্মকাণ্ড নিয়ে। প্রশ্ন হয়, এতকিছুর পরও এগুলো সিক্রেট হলো কীভাবে? এর উত্তর হলো, মানুষ এখন এসব দল নিয়ে সোচ্চার হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য আজও অনেকের কাছেই অজানা। অস্পষ্ট। এখানে এসেই বিশ্লেষকরা চুপ হয়ে যান। এর কোনো সদুত্তর তারা দিতে পারেন না বা জানেন না। উদ্দেশ্য নিয়ে এমন ধোঁয়াশার কারণেই দলগুলোকে আজও সিক্রেট সোসাইটি বলা হয়।

এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরও দেখা গেছে, প্রতাপশালী অনেক ফ্যামিলি এবং ফ্রিম্যাসন সদস্য সরাসরি ইহুদি। ইহুদিদের তালমুদে লেখা আছে, এই পৃথিবী ইহুদিদের জন্যই; বাকিরা তাদের শরণার্থী। অ-ইহুদিরা সব গওয়িম (চতুষ্পদ জন্তু)। আর এ কথা সবারই জানা, শেষ জামানার দাজ্জাল হবে ইহুদি বংশোদ্ভূত। সে এসে পুরো দুনিয়াতে দাপটের সঙ্গে নৈরাজ্য চালাবে। মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। প্রথমে নবী, পরে প্রভু পর্যন্ত দাবি করবে। আমরা নিশ্চিত করেই বলতে পারি, সেই দাজ্জালের জন্যই ফিল্ড প্রস্তুত করছে এই ফ্রিম্যাসনরা। আপনারা জানলে অবাক হবেন, দাজ্জাল আসলে পুরো দুনিয়াতে ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর প্রত্যেক ইহুদির ভাগে কজন গোলাম পড়বে—এই হিসেবও তাদের ধর্মীয় গুরুরা করে ফেলেছে। তাদের হিসেবমতে একজন ইহুদি ২৫০০ গোলামের মালিক হবে![১৬]

তালমুদের বাণী বাস্তবায়ন করতে তারা বেছে নিয়েছে প্রতাপশালী রাঘববোয়ালদের। বহু কসরতের পর এদের এক সারিতে দাঁড় করাতে সক্ষম

---

১৬ এই লিংকে থাকা ভিডিওটি দেখতে পারেন : https://youtu.be/MUFr-BkJXPA

হয়েছে। এরাই ফ্রিম্যাসন এবং এরাই ইলুমিনাতি। ফ্রিম্যাসন বা ইলুমিনাতির নামে সবাইকে জড়ো করা সম্ভব হয় নি বলে তারা প্রতিষ্ঠা করেছে এগুলোর অঙ্গসংগঠন। নাম ভিন্ন হলেও কাজ এবং উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। বিভিন্ন হীন ও কূটকৌশলে তারা এই প্লাটফর্মে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছে কোটি কোটি মানুষকে। এভাবেই তারা দাজ্জালের ইহুদিরাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখানে আমরা সেই অঙ্গ সংগঠনগুলোর নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরবো।

এক. Rotary international : সংস্থাটি ১৯০৫ সালে শিকাগোতে প্রতিষ্ঠা করেন পোল হেরিস। ১৯১১ সালে আয়ারল্যান্ড, ১৯২১ সালে মাদ্রিদ এবং ফিলিস্তিনে শাখা প্রতিষ্ঠা হলে এর কার্যপরিধি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ত্রিশের দশকে ফ্রেঞ্চ কলোনির সাহায্যে আল-জাজায়ের এবং মরক্কোতে এর শাখা প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে প্রায় দুইশো দেশে এর শাখা বিদ্যমান রয়েছে। সদস্যসংখ্যা প্রায় তেরো লক্ষ।

সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষকে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করা। তাদের স্লোগান এরকম, 'রোটারি মানুষকে একত্র করে, ধর্ম মানুষকে বিভক্ত করে'। তাদের দাবি, ধর্ম দেশের কোনো বিষয়ের সমাধান দিতে পারে না। এই যদি হয় তাদের মূলমন্ত্র, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক দেশগুলোর ধর্মনিরপেক্ষ নেতারাই তাদের মূল টার্গেট। এবং বাস্তবেও তাই। সংস্থাটির সদস্য গ্রহণের শর্তে আছে—

- ✓ ১. ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া
- ✓ ২. সমাজের নেতা হওয়া
- ✓ ৩. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা থাকা
- ✓ ৪. রোটারির মুখপাত্র হবার যোগ্যতা থাকা।

তবে তারা আধ্যাত্মিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। রুহের পূজা করে। এদের কিছু কিছু সভা শুধু রুহের পূজার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মিশরের একজন প্রসিদ্ধ আলিম শাইখ গাজালি (১৯১৭-১৯৯৬) এই গুপ্তগোষ্ঠী সম্পর্কে চমৎকার বলেছেন—

রোটারি হলো ইহুদিদের হাতিয়ার, যার কার্যক্রম মুসলিমদের মাঝে। তারা নিজেদের অজান্তেই ইসরাইলের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে। রোটারি উদ্বুদ্ধ করে ধর্মের বলয় থেকে বের হয়ে আসতে, যাতে ইহুদিদের প্রতি কারও মনে ধর্মীয় বিদ্বেষ না জন্মে। এতে করে ইসরাইলের স্বার্থও রক্ষা হলো, আবার ইহুদি ধর্মকে অন্য ধর্মের ওপর প্রাধন্য বিস্তারের কাজটিও হয়ে গেল।[১৭]

দুই. Circle k international : সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৫ সালে জেই এন ইমারসনের হাত ধরে। বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৩,৮৩৫। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মাঝে কাজ করে থাকে। এটি কিওয়ানিসের অঙ্গসংগঠন।

তিন. key club international : এই সংস্থাটি আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। এর সদস্যসংখ্যা সাম্প্রতিক তিন লক্ষে পৌঁছেছে। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী যুবকদের মাঝে কাজ করে থাকে। এটিও কিওয়ানিসের অঙ্গসংগঠন।

চার. Builders club : সংস্থাটি ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান সদস্য চুয়াল্লিশ হাজারের মতো। এটি মাধ্যমিক ক্লাসের ছাত্রদের মাঝে কাজ করে থাকে। এটিও কিওয়ানিসের অধীন হয়ে কাজ করে।

পাঁচ. K-Kids club : সংস্থাটির যাত্রা শুরু ১৯৯০ সালে। সদস্যসংখ্যা প্রায় ষোল হাজার। কিওয়ানিসের অধীনে সংস্থাটি কাজ করে থাকে।

ছয়. Aktion club : সংস্থাটির পথ চলা ২০০০ সালে। কিওয়ানিসের অধীনে বয়স্কদের মাঝে কাজ করে থাকে।

সাত. International black sea club : সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯১৭ সালে মেলভন জোনস। ১৯২০ সালে এর পরিধি বিশ্বব্যাপী হয়। বর্তমানে একশত তিরানব্বইটি দেশে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত আছে। সদস্যসংখ্যা প্রায় চার লাখ।

---

১৭ মনসুর অব্দুল হাকিমের الماسونية حكومة العالم الخفية, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯

আট. Civitan international club : ১৯১৭ সালে আমেরিকার আলবামার বার্মিংহামে ডক্টর ক্রোটনি শ্রোপসার সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সদস্যসংখ্যা আটাশ হাজার। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মধ্যে যারা এর সদস্য ছিলেন :

১. আমেরিকার ত্রিশতম প্রেসিডেন্ট কেলিভিন কোলিজ (১৯২৩-১৯২৯)।
২. আমেরিকার বত্রিশতম প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রোসভেল্ট (১৯৩৩-১৯৪৫)।
৩. আমেরিকার তেত্রিশতম প্রেসিডেন হেরি ট্রোমেন (১৯৪৫-১৯৫৩)
৪. আমেরিকার পঁয়ত্রিশতম প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি (১৯৬১-১৯৬৩।
৫. আমেরিকার বিয়াল্লিশতম প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন (১৯৯৩-২০০১)।

নয়. Jehovah's witnesses (জোহাইভাস উইটনেসেস) : এটি খ্রিস্টধর্মীয় একটি আন্দোলনের নাম। 'বাইবেল পাঠ আন্দোলন' সংস্থাটির স্লোগান হলেও এটি মূলত জায়োনিস্ট মুভমেন্টের ধারকবাহক। ১৮৭০ সালে বার্লেস রাসেল নামের একজন পাদরি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান সদস্যসংখ্যা প্রায় আট লাখ। সংস্থাটির গায়ে খ্রিস্টধর্মীয় লেবেল থাকলেও এর প্রতীক হলো 'সপ্ত মোমদানি'—যা ইহুদিদের ধর্মীয় এবং জাতীয় প্রতীক।

দশ. Soroptimist international : এর প্রতিষ্ঠা ক্যালিফোর্নিয়ার অকল্যান্ডে; ১৯২৪ সালে। এর কার্যক্রম নারীদের মাঝে সীমাবদ্ধ।

এগার. Optimist international : ১৯৯১ সালে আমেরিকায় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা হয়। বিশটি দেশে প্রায় আশি হাজার সদস্য নিয়ে সংস্থাটি কাজ করছে।

বার. Knights of pythias : ইয়াসটান হেনরি রেথবন (১৮৩১-১৮৮৯) ১৮৬৪ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থাটি আগা-গোড়া সিক্রেট। আমেরিকা এবং কানাডায় এর ব্যাপ্তি।

তের. B'hai B'rith international : সংস্থাটি ১৯৪৩ সালে আমেরিকার ওয়াশিংটনে প্রতিষ্ঠা হয়। ইহুদিদের স্বার্থ রক্ষা করাই সংস্থাটির মূলমন্ত্র। বর্তমান সদস্য সংখ্যা দুই লাখ।

চৌদ্দ. Ruritan national club : সংস্থাটি আমেরিকার ভার্জিয়ানার হল্যান্ডে ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। এর কার্যক্রম আমেরিকাতেই সীমাবদ্ধ।

পনের. Acacias country club : আমেরিকায় ১৯০৪ সালে এর প্রতিষ্ঠা। চারজন ফ্রিম্যাসন উস্তাদের সাহায্যে এর পথ চলা শুরু হয় বর্তমানে আমেরিকায় এর কার্যক্রম চালু আছে।

এছাড়া আরও বহু সংস্থা ফ্রিম্যাসনের অধীনে কাজ করে। যেমন—Knights of columda, Demoly international, Bohemian club, Club branch. ইত্যাদি

[৮]

গুপ্তহত্যা; ইলুমিনাতির কাঁটা-নির্মূলতত্ত্ব

গুপ্তহত্যা হলো কোনো গোষ্ঠীকর্তৃক বিরোধী কাউকে গোপনে হত্যা করা। চাই সে বিরোধিতা রাজনৈতিক হোক, চিন্তাগত হোক বা অন্যকিছু। গুপ্তহত্যা গুটিকয়েকের ভেতরে সীমাবদ্ধ হলে সেটাকে বলে 'রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা'। আবার কখনো একদল মানুষকে একত্রে হত্যা করা হয়। সেটাকে বলে 'জাতিগত শুদ্ধি'।

গুপ্তহত্যার অতীত অনেক পুরোনো। ইতিহাস ঘাঁটলে খ্রিস্টপূর্ব সময়েও গুপ্তহত্যার খোঁজ মেলে। আমালেকা গোত্রের বাদশাহ মোয়াব, ফিলিপস মাকদুনি (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮২-৩৩৬), খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে কায়সার উইলিয়ামস হত্যার প্রত্যেকটিই ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব সময়ে। আধুনিক যুগেও এর ঢের চর্চা হচ্ছে বৈকি। আসলে গুপ্তহত্যা এমন এক ভয়ঙ্কর হাতিয়ার, যা প্রতিপক্ষকে গোপনে চিরদিনের জন্য চুপ করিয়ে দেয়।

যুগে যুগে গুপ্তহত্যার নানা কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘাতকেরা সেই কৌশল কাজে লাগিয়ে নিজেদের কার্য হাসিল করে গেছে। গুপ্তহত্যার এমনই কিছু কৌশল হলো—

- ১. সরাসরি হত্যা : নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী গুপ্তহত্যার পুরো পরিকল্পনা প্রথমে একটি ছকের ভেতরে নিয়ে আসে। এরপর সুযোগ বুঝে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করে।
- ২. পরোক্ষ হত্যা : বলাবহুল্য এখানে দ্বিতীয় পক্ষ মাঠে থাকবে। হত্যাকাণ্ডটি এই দ্বিতীয় পক্ষই ঘটায়। তবে মূল পরিকল্পনা থাকে আড়ালের মূল ঘাতকগোষ্ঠীর। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডে আড়ালের গোষ্ঠীরা প্রতিক্রিয়া থেকে বেঁচে যায়।
- ৩. আগ্নেয়াস্ত্রের বিস্ফোরণ : সামরিক কায়দায় কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করে কখনো কখনো গুপ্তহত্যা ঘটানো হয়। ফিলিস্তিনের

হামাস নেতা ইয়াহইয়া এবং ইয়াদকে এমনই এক বিস্ফোরকের সাহায্যে হত্যা করেছিল মোসাদ।

- ৪. বিমান হামলা : আধুনিক যুগে এই পদ্ধতির সন্ত্রাসী হামলা খুব বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির বাড়ি বা গাড়ি টার্গেট করে আকাশপথে বিমান হামলা করে পালিয়ে যায়। ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শাইখ আহমাদ ইয়াসিনকে বিমান হামলা করে হত্যা করে ইসরাইল।
- ৫. বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ : মোসাদ এই পদ্ধতিটি বহুবার ব্যবহার করেছে। ফিলিস্তিনের শক্তিশালী নেতা খালেদ মাশালকে একবার এই পদ্ধতিতে হত্যার চেষ্টা করা হয়।
- ৬. গুম এবং হত্যা : এটি গুপ্তহত্যার সবচে ভয়ংকর পদ্ধতি। এই হত্যার পরিকল্পনাকারীদের খুঁজে পাওয়া যায় না বলে সভ্য সমাজে এই পদ্ধতিটি চরম নিন্দনীয়।

গুপ্ত হত্যার পেছনে নানা কারণ থাকে। কখনো নাটকীয়তার চিত্রায়ন উদ্দেশ্য হয়। কখনো আবার হয় ক্ষমতার চেয়ার দখলের স্বার্থে। শত্রুতাবশতও অনেকে এর শিকার হয়। গুপ্তহত্যার ফল প্রতিফলিত হয় খুব দ্রুত। ইতিহাসে এমন অনেক গুপ্তহত্যা ঘটেছিল—যা পৃথিবীর মোড়ই পাল্টে দিয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধও কিন্তু একটি গুপ্তহত্যার পরেই শুরু হয়েছিল। ইতিহাসে এমন কিছু গুপ্তহত্যা সংগঠিত হয়েছিল—যার পেছনে মূলত হাত ছিল ফ্রিম্যাসনের। এমন কিছু ঐতিহাসিক গুপ্তহত্যার ঘটনা আমরা এখানে তুলে ধরবো :

১. লিঙ্কন হত্যা : ১৮৬১-১৮৬৫ সাল। সময়টা আমেরিকার জন্য ভালো যাচ্ছিল না। আমেরিকার ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয় ১৮৬১ সালের ১২ এপ্রিলে। আমেরিকায় দানা বাঁধে ভয়ংকর এক গৃহযুদ্ধ। আমেরিকার শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে দেয় এগারোটি স্টেটের বিচ্ছিন্নবাদীরা। এগারো স্টেটের সমন্বয়ে তারা গঠন করতে চায় কনফেডারেট অফ আমেরিকা। দক্ষিণাঞ্চলের এই স্টেটগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিল জোফারসন ডোবস (১৮০৮-১৮৮৯), রবার্ট এডওয়ার্ড লি (১৮০৭-১৮৭০), জোনাথেন জেকসন (১৮২৪-১৮৬৩) এবং জোসেফ জোনস্টেস। অপরদিকে উত্তরের স্টেটগুলো এদের পক্ষে ছিল না। তারা যে-কোনোভাবে ঘরোয়া যুদ্ধ বন্ধ করে একরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই দুঃসময়ের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আবরাহাম লিঙ্কন (১৮০৯-১৮৬৫)।

তিনি ছিলেন একতার পক্ষে। এই নীতির ওপর ছিলেন আমেরিকার আঠারোতম প্রেসিডেন্ট ইউলিসেস গ্রেন্ট (১৮২২-১৮৮৫), উইলিয়াম শেরমেন (১৮২০-১৮৯১) এবং জোর্জ ব্রিনটন ম্যাকলিলেন (১৮২৬-১৮৮৫)।

এই যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল, দাসপ্রথা বাতিলের আইন। লিঙ্কন চাচ্ছিলেন দাসপ্রথা বন্ধ হয়ে যাক এবং এ মর্মে তিনি ১৮৬৩ সালে আইনও পাশ করেছিলেন। এদিকে দক্ষিণাঞ্চলে দাসরা ছিল সমাজের প্রধান চালিকাশক্তি। দাসব্যাবসায়ীরা মনে করছিল, এই আইন তাদের প্রতিষ্ঠিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। আর শ্বেতরা ভাবছিল, দাসরা মুক্ত হলে একদিকে তাদের বহু কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। অপরদিকে সমাজ শাদা-কালো মিলে একাকার হয়ে যাবে—যা একটি সভ্য সমাজে ঘটতে পারে না।

এই বিরোধপূর্ণ সময়টা কাজে লাগিয়েছিল ফ্রিম্যাসনরা। তারা ঘরোয়া যুদ্ধ বাঁধিয়ে আমেরিকাকে দু-টুকরো করতে চাচ্ছিল। যা পরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যুদ্ধ লাগিয়ে স্বার্থ হাসিল করা ফ্রিম্যাসনের চিরচায়িত স্বভাব।[১৮] পাঁচ বছরের এই যুদ্ধের অবসান ঘটে একতার দাবিদারদের জয়ের মাধ্যমে। আবরাহাম লিঙ্কন সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে এর অবসান ঘটান; কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়ে যায় নি। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি সময়েই লিঙ্কনের হত্যাকাণ্ড ঘটে। ফ্রিম্যাসনরা চাচ্ছিল এই হত্যার জের ধরে আমেরিকায় আবারও যুদ্ধ শুরু হোক!

১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল। প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন তার স্ত্রী মেরিটড লিঙ্কনকে নিয়ে ওয়াশিংটনের এক থিয়েটারে বসে আছেন। সঙ্গে আছেন ক্লেয়া হেরিস এবং হেনরি রেথবন। সেদিন মিথ্যার এই নাট্যমঞ্চে এক সত্য নাট্য অভিনীত হয়েছিল। লিঙ্কন মঞ্চায়িত নাটক উপভোগ করছিলেন। সুযোগ বুঝে ঘাতক জোন ওয়াল্কস বথ মঞ্চের পেছন থেকে লিঙ্কনের মাথায় গুলি করে। লিঙ্কন আস্তে লুটিয়ে পড়েন সামনের টেবিলের ওপর। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

---

১৮ আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ফ্রিমেসন ব্যাংকারদের ষড়যন্ত্র ছিল। এটি কানাডিয়ান ঐতিহাসিক উইলিয়াম গাই কার (১৮৯৫-১৯৫৯) তার বই *Pawns In The Game*-এ প্রমাণ করেছেন। দেখতে পারেন, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ১২৩-১৪৭ আরবি ভার্সন : أحجار على رقعة شطرنج)

২. গারফিল্ড হত্যা : আমেরিকার ত্রিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জেমস আবরাম গারফিল্ড ১৮০১-১৮৮১। আমেরিকার হোয়াইট হাউজে বেশি দিন বসতে পারেন নি তিনি। নিয়তি তার সঙ্গে ছলনা করেছে। হোয়াইট হাউজে বসার মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসের ভেতরেই তার রহস্যপূর্ণ মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু একদমই স্বাভাবিক ছিল না।

১৮৮১ সালের জুলাই মাসের ২ তারিখ। ওয়াশিংটনের রেলস্টেশনে দাঁড়িয় আছেন গারফিল্ড। ওয়াশিংটনে শীতের মাত্রা বেশি হওয়ায় টেকা যাচ্ছিল না। তাই অন্য কোনো জায়গায় যাবার ইচ্ছা তার। প্রেসিডেন্টের ওয়াশিংটন ছাড়ার খবরটি পত্রিকায় আগেই ছাপা হয়েছিল। তাকে হত্যার কয়েকটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় আগে। ঘাতকরা এই সুযোগটা হারাতে চাচ্ছিল না। প্রেসিডেন্টের প্লাটফর্ম ছাড়ার আগেই ঘাতক রেলস্টেশনে উপস্থিত হয়। প্রেসিডেন্টকে ফলো করে সুযোগমতো গুলি ছোঁড়ে। ঘাতকের গুলি পেছন দিক দিয়ে গারফিল্ডের পিঠে বিদ্ধ হয়। ঘাতক দ্বিতীয়বার গুলি ছোঁড়ে; কিন্তু তা লক্ষচ্যুত হয়। গারফিল্ড গুলি খেয়ে পড়ে যান। সেখানে তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলেও মারাত্মকরকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ গারফিল্ডকে হোয়াইট হাউজে আনা হয়। ঘাতক পালিয়ে যাবার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

টানা এগারো সপ্তাহ তার চিকিৎসা চলে। অসুস্থতার চড়াই-উতরাইয়ের কারণে দিনগুলো ভালো কাটে নি তার। অবশেষে ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ সালে নিউ জার্সির এলবোনে তার মৃত্যু হয়।

তার মৃত্যুর আসল রহস্য বের করেছেন বিশ্লেষকরা। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের ফ্রিম্যাসন শাখার তেত্রিশ ডিগরির (ফ্রিম্যাসনের সর্বোচ্চ স্তর) একজন সদস্য। আমেরিকার ওহায়ো স্টেটের পক্ষ থেকে কংগ্রেস সদস্য ছিলেন টানা সতের বছর। এই পুরো সময়টাই তিনি ফ্রান্সে কাটান এবং ফ্রিম্যাসনর কার্যক্রম চালিয়ে যান। তাদের কার্যক্রম থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলেই ফ্রিম্যাসনরা তাকে হত্যা করে। ফ্রিম্যাসনরা সেচ্ছায় বের হয়ে আসা সদস্যের সঙ্গে এমনই আচরণ করে থাকে। মিশরের প্রসিদ্ধ ফ্রিম্যাসন বিশ্লেষক মনসুর আব্দুল হাকিম ভিনসেট

ডি পোলের একটি বই থেকে তথ্য নকল করে তার ফ্রিম্যাসন হবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।[১৯]

৩. জন কেনেডি হত্যা : আমেরিকার বত্রিশতম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জন কেনেডি (১৯৬১-১৯৬৩)। তার সময়ে কিউবায় কম্যুনিস্ট আন্দোলন তুঙ্গে ছিল। ফিদেল কাস্ট্রো এবং তার সহযোগীরা সোভিয়েতের প্রকাশ্য সমর্থন পেয়ে একের পর এক শহরগুলো জয় করে যাচ্ছিল। কম্যুনিস্ট শাসন প্রায় প্রতিষ্ঠা হয়ে যাচ্ছে দেখে আমেরিকা নড়েচড়ে বসে। শুরু হয় কিউবার সঙ্গে আমেরিকার কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব। এই সময়টা ছিল আমেরিকা-সোভিয়েত কোল্ড ওয়ারের অংশ।

স্বাভাবিকভাবেই আমেরিকা পক্ষ নিল কিউবার প্রতিষ্ঠিত শাসকের। তারা যেভাবেই হোক কম্যুনিস্টদের এই অগ্রগতি থামানোর চেষ্টা করছিল। জন কেনেডির নীতি ছিল আমেরিকা সারাসরি যুদ্ধে জড়াবে না; কিন্তু কংগ্রেস তা মানতে পারছিল না। কংগ্রেস থেকে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও কেনেডি নিজ সিদ্ধান্তে ওপর অনড় থাকেন। সিআইএ, এফবিআই এবং কিছু উৎসাহী নেতারা যুদ্ধের জন্য বার বার প্রেসিডেন্টকে পীড়াপীড়ি করছিল। অগত্যা তিনি সেসব নেতাদের বহিষ্কার করেন। পরে অবশ্য তিনি যুদ্ধে রাজি হয়েছিলেন।

কেনেডি যুদ্ধের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে সিআইএ ফ্রিম্যাসনের হয়ে প্রেসিডেন্টের মত ছাড়াই যুদ্ধের নানা কারণ তুলে ধরা শুরু করে। সিআইএ কিউবায় নানা তৎপরতাও চালায়। সি আই এর এমন আচরণে প্রেসিডিন্ট বুঝতে পারছিলেন দেশটা তার কথায় চলে না; দেশ পরিচালনা করে আড়ালের কিছু শক্ত হাত, যাদের রয়েছে বিস্তৃত কোনো ষড়যন্ত্রের জাল। সেই জালে বন্দি করে রেখেছে বিশ্বের সব সরকার, মিডিয়া আর সম্পদের উৎস। তিনি এক ভাষণে এই নির্মম সত্য তুলে ধরেছিলেন। একদিন আমেরিকার স্বাধীন মানুষদেরকে শুনিয়েছিলেন পরাধীনতার গল্প। তার পাঁচ মিনিটের বক্তৃতায় চমৎকারভাবে উঠে এসেছে ফ্রিম্যাসনের সংক্ষিপ্ত আলাপ। তার ভাষণটি ছিল এরকম—

‘হে প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ, একটি স্বাধীন সমাজে ‘গোপন’ শব্দটি খুবই ঘৃণিতভাবে উচ্চারিত হয়। আমরা ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে গোপন সংস্থা, গোপন

---

১৯ দেখতে পারেন, ‘ওজামা ওয়া মাশাহির ইগতালাতহুমুল মাসুনিয়্যা’ বইটি, পৃষ্ঠা ৫০-৫৫

অংশ এবং গোপন কর্মকাণ্ডের মোকাবেলা করে আসছি। আমরা পৃথিবীজুড়ে এমন সব নির্মম ষড়যন্ত্রের দমন করে আসছি, যেগুলো আগ্রাসনের পরিবর্তে অনুপ্রবেশ, নির্বাচনের পরিবর্তে ধ্বংস, স্বাধীন মতের পরিবর্তে ভয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এ এমন এক ব্যবস্থা—যার রয়েছে প্রচুর বৈষয়িক সম্পদ এবং মানবশক্তি। যার উদ্দেশ্য, শক্তভাবে এমন এক বুনোন তৈরি করা, যেখানে সামরিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, গোয়েন্দাভিত্তিক—সব রকমের তৎপরতা চলবে।

তাদের উপস্থিতি হয় গোপনে, প্রকাশ্যে নয়। তাদের ভুলগুলো চাপা দেওয়া হয়, প্রকাশিত হয় না। তাদের বিরোধীরা চুপ করে থাকে। তাদের সব কিছুই আড়ালে হয়, কিছুই প্রকাশ পায় না। '

জন কেনেডি ফ্রিম্যাসনের আরও কিছু খবর তার কাছের কিছু মানুষের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তাদের একজন ছিলেন তার বান্ধবী প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মারলিন মোনরো। ফ্রিম্যাসনরা এই অভিনেত্রীতে হত্যা করে কেনেডিকে সতর্ক করেছিল; কিন্তু তাতে কাজ হয় নি।

কেনেডি প্রেসিডেন্ট হবার পরই মাফিয়ার বিরুদ্ধে বেশ তৎপর হয়ে ওঠেন। ইসরাইলের সঙ্গেও একটি কারণে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। এসব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে সহজেই আঁচ করা যায়, তার হত্যাকাণ্ডে মাফিয়া এবং মোসাদও (যেগুলো ফ্রিম্যাসনের সামরিক শক্তি) শরিক ছিল।

২২ নভেম্বর ১৯৬৩। টেক্সাসের শহর দালালায় মানুষ পথে নেমে এসেছে। প্রাণের প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানাতে এই ভিড় জমেছে। উৎসুক জনতার আজ আনন্দের শেষ নেই। কেনেডি উৎসুক জনগণকে দর্শন দিচ্ছেন। দর্শনে ব্যাঘাত না ঘটে তাই ছাদবিহীন এক গাড়িতে তিনি বসে আছেন। গাড়ি যতই এগোচ্ছে, আনন্দিত মানুষের করতালির শব্দ ততই আকাশ স্পর্শ করছে। এই আনন্দঘন মুহূর্তেই লি হারভি ওয়াসওয়াল্ডের টিগারের চাপে নিমিষেই ডালাসে অন্ধকার নেমে আসে।

কেনেডি হত্যা কারা ঘটিয়েছিল সেই গল্পটা পড়ি রোবার্ট মোরোর (যিনি টেক্সাসের ট্রাভিস কান্ট্রির রিপাবলিকান শাখার বর্তমান চেয়ারম্যান) ডায়েরি থেকে। তিনি লেখেন—

'কেনেডি-হত্যা আবশ্যক ছিল; কারণ, তিনি সিআইএ এবং এফবিআই এর পক্ষ থেকে মনোনীত ছিলেন না। তিনি এফবিআই এর প্রধান জোন এডগার হোভার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জনসন লেনডনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছিলেন।[২০]'

উইকিপিডিয়ায় মোরোরের বায়োতে লেখা আছে—

'Morrow claims that Vice President Lyndon B. Johnson of Texas, with the help of the CIA, was involved in the 1963 assassination of John F. Kennedy. Morrow owns four hundred books on the assassination and considers himself an expert on the topic'

'মোরোরের দাবি হলো, ভাইস প্রসিডেন্ট জোনসন লেনডন এবং সিআইএ ১৯৬৩ সালের জন কেনেডির গুপ্তহত্যায় জড়িত ছিল। মোরোর কেনেডি গুপ্তহত্যা নিয়ে লিখিত প্রায় চারশটি বইয়ের মালিক এবং তিনি নিজেকে এ বিষয়ের একজন বিশ্লেষক মনে করেন।[২১]'

আমেরিকার মতো রাশিয়াতেও ফ্রিম্যাসনরা গুপ্তহত্যা চালিয়েছিল। ১৫৪৭-১৭২১ সময়ের রাশিয়াকে কায়সারি রাশিয়া (Tsardom of Russia) বলা হয়। এই দুইশত বছরের পুরো সময়টাতে ফ্রিম্যাসনরা গুপ্তহত্যায় মেতে উঠেছিল। একের পর এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে থাকে ফ্রিম্যাসনরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, রাজতন্ত্র ধ্বংস করে অর্থডক্সদের বলয় থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করা। নোংরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে দাজ্জালি ধর্মের প্রসার ঘটানো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই ষড়যন্ত্রের ধারা শেষ হয়। কায়সারি রাশিয়ার সম্রাটদের মধ্যে পিটার তৃতীয়, পোলস প্রথম, নিকোলা প্রথম, আলেকজান্ডার দ্বিতীয় এবং নিকোলা দ্বিতীয় গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন।

---

২০ ওজামা ওয়া মাশাহির, পৃষ্ঠা : ৬৯

২১ বিস্তারিত জানতে এই লিংকে গিয়ে পড়তে পারেন : https://bit.ly/2EjYZ0o

যুগে যুগে ফ্রিম্যাসনরা বহু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। এসবের কোনোটার রহস্য প্রকাশ পেয়েছে, কোনোটার পায় নি। কারা ঘটিয়েছিল, কারা ষড়যন্ত্র করেছিল, কারা বিশ্বযুদ্ধ লাগিয়েছিল, কারা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, কারা যুগযুগ ধরে আঞ্চলিক সরকারগুলোকে পরিচালনা করছে—এসবের কিছুই আমরা জানি না। আসলে বলতে হয়—আমাদের জানতে দেওয়া হয় না।

[৯]
ইলুমিনাতির সাইন; পেছনের রহস্য

ইলুমিনাতির সাইন বা চিহ্ন হলো, ত্রিভুজের ভেতরে একটা চোখ। এই সাইন ব্যবহার করার ধারণাটা আসে মিশরের পিরামিড থেকে। আমরা জানি, মিশরের পিরামিড পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি; কিন্তু কেন?

যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় ৫০০০ বছর আগে মিশরে নীলনদের তীরে পিরামিডের সভ্যতা গড়ে ওঠে; কিন্তু সেই পিরামিডের কিছু অসাধারণ তথ্য আমাদের এই যুগের বিজ্ঞানীদেরও অবাক করে দেয়। যেমন—

◇ পিরামিডের স্ট্রাকচার হলো আসলে একটি রেশনাল স্ট্রাকচার। দেখা গেছে, এই স্ট্রাকচারটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভূমিকম্প সহনীয় স্ট্রাকচার। তখনকার মানুষ এটা জানল কীভাবে? পিরামিডের এই শেপের কারণে গত ৩০০০ বছরে প্রায় ১৬ টি মারাত্মক ভূমিকম্পকে হেলা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে এই পিরামিডগুলো।

◇ পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও প্রাচীন পিরামিড হলো গির্জা খুফুর পিরামিড। ফারাও রাজা খুফু[২২] নিজে এটি নির্মাণ করেন। সেই পিরামিডের প্রতিটি পাথরের ওজন প্রায় ৬০ টন। আমাদের জানামতে তখন কোনো মালবাহী গাড়ি ছিল না। তাহলে মরুভূমির বালুর মধ্যে এগুলো মানুষ কীভাবে বহন করে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেত? বালুর মধ্যে তো হাঁটাই অনেকাংশে দুঃসাধ্য।

---

২২ মিশরের চতুর্থ রাজবংশ-এর শাসনামল (মোটামুটি ২৬২০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। সাধারণভাবে ঐতিহাসিকদের কাছে মিশরের পুরাতন রাজত্বের সময়কালীন স্বর্ণযুগ হিশেবে খ্যাত। এইসময় সমগ্র সাম্রাজ্যে সাধারণভাবে শান্তি বজায় ছিল এবং কৃষি ও ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশের হাত ধরে সমৃদ্ধির দেখাও মিলেছিল। এইসময় মিশরের সাথে অন্যান্য বহির্দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের সাক্ষ্যবহনকারী বিভিন্ন উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সময়কালের দ্বিতীয় মিশরীয় বাদশাহ ছিলেন খুফু (মৃত্যু ২৫৬৬ খ্রিস্টপূর্ব)।

◇ শুধু তাই না, খ্রিস্টপূর্ব ২৫৬০ অব্দে পিরামিড নির্মাণ কর. হয়। ১৭৮৯ সালে আইফেল টাওয়ার হওয়ার আগ পর্যন্ত ৪৪০০ বছর ধরে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু স্থাপনার গৌরব ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

◇ প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল এই পিরামিড বানাতে প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিকের ২০ বছর সময় লেগেছিল; কিন্তু পরে জানা যায়, এর চেয়ে অনেক কম সময়ে পিরামিড তৈরি করা হয়েছে।

◇ সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পিরামিডগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, দিনের শুরুতে সূর্যের আলো প্রথমে পিরামিডের চূড়ায় পড়ে। এরপর চারপাশে ছড়িয়ে যায়। দিনশেষে আবার ঠিক এর উলটো কাণ্ড ঘটে।

◇ পিরামিডের পাথরগুলো এত ধারালো ও মসৃণ—যা অত্যাধুনিক যন্ত্র ছাড়া কোনোভাবেই তৈরি সম্ভব মনে হয় না। পাথরগুলোর ভেতরে বাতাস ঢোকারও কোনো জায়গা নেই। এত নিখুঁত ফিনিশিং এত শত বছর আগে কীভাবে সম্ভব হয়েছে।

◇ শুধু তাই না, ধারণা করা হয়—প্রতিটা পিরামিডের থিউরি মহাকাশের কোনো নক্ষত্র থেকে নেওয়া; যদিও এ ধারণার পক্ষে শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ নেই।

◇ মিশর ছাড়াও, পৃথিবীর আরও অনেক জায়গায় পিরামিড[২৩] দেখা যায়। যান্ত্রিক সুবিধা ছাড়া এটা কীভাবে সম্ভব?

---

২৩ মিশরের বাইরের পিরামিড (৩০) : মিশরের অদ্ভুত রহস্যময় পিরামিড ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আর্টিফিশিয়াল আরও কিছু পিরামিড দেখা যায়৷ যেগুলোর কোনোটি স্মারক স্তম্ভ, কোনোটি জাদুঘর; কোনোটি আবার হোটেল৷ সংক্ষেপে সেগুলোর নাম এখানে উল্লেখ করলাম—

১. মেসনিক মনোমেন্ট (Masonic monument)৷ এইলেট, ইসরাইল; ২. লিউভার মিউজিয়াম (The louvre museum)৷ প্যারিস, ফ্রান্স; ৩. লাক্সর হোটেল (The luxor hotel)৷ লাস ভেগাস, আমেরিকা; ৫. পিরামিড এরেনা (Pyramid Arena) মেম্পিশ,

আমেরিকা; ৬. আইমেক্স থ্রিডি (IMAX 3D)৷ আইলেট, ইসরাইল; ৭. পালেস অফ

দ্বিতীয়ত : ইলুমিনাতির সাইন অর্ধত্রিভুজ এবং তার ভেতরে একটা চোখ, এর আরও ভয়ঙ্কর ব্যাখ্যা হলো, ইলুমিনাতি দাজ্জালের আগমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, তামিম দারি রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'দাজ্জাল একচোখা হবে এবং অন্য চোখ কানা থাকবে।' এজন্য ত্রিভুজের ভেতরে তারা একচোখের আকৃতি ব্যবহার করে (এ-বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইন শা আল্লাহ)। তাছাড়া ধারণা করা হয়, ত্রিভুজ আকৃতির সাইনের রহস্য হলো, ইলুমিনাতি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলকে নিজেদের হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করে। এবং বারমুডা বা ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল যেহেতু ত্রিভুজ আকৃতির, তাই তারা তাদের সিম্বল হিসেবে ত্রিভুজ ব্যবহার করে থাকে।

তো, বলা যায়, ইলুমিনাতির সাইনের ত্রিভূজ তাদের প্রযুক্তি, সক্ষমতা, শক্তিমত্তা এবং একচোখ বা ALL SEEING EYE দ্বারা তারা সর্বদা অন্যদের ওপর নজরদারি, খবরদারি করছে সেটাই বোঝানো হয়েছে।[২৪]

পিস এন্ড রেকনসিলিএইশন (palace of Peace and Reconciliation) কাজাখিস্তান; ৮. হোটেল রাফলস (Hotel Raffles)। দুবাই, আরব আমিরাত; ৯. রেনাইসন্স টাওয়ার পিরামিড (Renaissance Tower Pyramid)। ডালাস, আমেরিকা; ১০. চার্লেস রাসেলস মিমোরিয়াল (Charles Russell's Memorial) পেনসিলভেনিয়ার, আমেরিকা; ১১. দা কার্লসরুহ পিরামিড (The Karlsruhe Pyramid)। কার্লরুহ, জার্মানি; ১২. কেস্টল হাওয়ার্ড পিরামিড Castle Howard Pyramid)। নর্থ ইয়র্কশার, ইংল্যান্ড; ১৩. হা! হা! পিরামিড ডেস (Ha! Ha! Pyramus Des)। কুয়েডেস, কানাডা; ১৪. প্লেস ডেলা কনকর্ড (place dela Concord)। প্যারিস, ফ্রান্স; ১৫. বসনিয়ান পিরামিড ক্লাইমস Bosnian Pyramid Claims) বসনিয়া; ১৬. চার্চ অফ দা হলি রিউড Church of The Holy Rude)। স্কটলেন্ড; ১৭. পিরামিড অফ লাইট Pyramid of the Light)। কেইনেস, ইংল্যান্ড।

২৪ KBD NEWS, 22 October, 2018

[১০]
NEW WORLD ORDER; ইলুমিনাতি সৃষ্ট ধর্ম

পৃথিবীতে একচ্ছত্র অধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইহুদি ব্যাংকাররা নতুন এক বিশ্বধর্ম আমদানি করার চেষ্টা করছে। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে তারা ১৯৯২ সালে 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' নামে একটি নতুন সিস্টেম পৃথিবীবাসীর সামনে প্রণয়ন করে। বস্তুত এটি একটি নতুন ধর্ম; যার মূলভিত্তিই হচ্ছে মনোবৃত্তি আর ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নতুন এই ধর্ম প্রচার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। আপনি জেনে অবাক হবেন যে, ১৯৯২ সালের পর থেকে কত দ্রুত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন এসেছে।

ইসলামি মূল্যবোধ নির্মূলকরণ

বাহ্যত এই সিস্টেমটি যদিও পৃথিবীর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু একে একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধানাকারে রূপ দেওয়া হয়েছে। চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে একমাত্র ইসলামই এর সামনে বাধা ছিল। বিধায়, ইসলামের ওইসকল শিক্ষা মিটিয়ে দেওয়ার জোর চেষ্টা চালানো হয়; যেগুলো এই নতুন পদ্ধতির সামনে বাধা হয়ে আসতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্পূর্ণরূপে এই নতুন সিস্টেমের আওতাভুক্ত করাই ছিল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি দেখে থাকবেন, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য সমাজে কীরূপ অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে–মানুষ কী পরবে, কী খাবে; শোয়া থেকে ওঠা—পুরোটা সময় নির্ধারণ করতে চাইছে একদল লোক। জীবন পরিচালনা কীভাবে করবেন, বিবাহ কখন হওয়া উচিত, সন্তান কয়জন হলেই চলবে, বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড আর জাস্টফ্রেন্ডের নামে যৌনতার অবাধ প্রচারসহ মানবজীবনের নিত্যকার সকল ক্ষেত্রে লোকদেরকে টেনে এক নতুন ধর্মে প্রবেশ করানো হচ্ছে। শুধু এই অইসলামিক জীবনবিধান পৃথিবীতে চালু করেই এরা বসে নেই; বরং এছাড়া অন্য কিছুকে জীবনবিধানরূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধের ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীর সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্তে এনে নতুন এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে 'জাতিসংঘ' নামক প্রতিষ্ঠানটি

সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর এই দালালসংঘ রক্ষার জন্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুগত সেনাবাহিনীকে এর হিফাজতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এরা পণ করেছে যে, পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকেই নতুন এই ধর্মের ওপর আমল করতে হবে, নতুবা তাকে 'মৌলবাদী বা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র' সাব্যস্ত করে প্রস্তরযুগে পৌঁছে দেওয়া হবে। যে রাষ্ট্র মানবে না তাদেরকে আক্রমণ করে সেখানে নিজেদের মনঃপুত শাসক বসানো হবে; প্রয়োজন হলে শান্তিরক্ষা মিশন নামক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনুগত সেনাবাহিনীর একটি অংশকে সেখানে পাঠানো হবে।

সুদ; ভিন্ন অস্ত্র

সুদি কারবারি এই ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সুতরাং তাদের ধর্মে টাকা-পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সুদি সিস্টেম ছাড়া অন্য কোনো সিস্টেম গ্রাহ্য হবে না। তবে নামকাওয়াস্তে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের লেবেল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, হিন্দু ব্যাংক, খাঁটি রোমান ক্যাথলিক ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি। তবে শর্ত হচ্ছে, সিস্টেম অবশ্যই সুদি হতে হবে, শুধুমাত্র পরিভাষা পরিবর্তন করার অনুমতি থাকবে।

নারী

নতুন এ ধর্মে নারীজাতিকে সম্মানের খাটিয়া থেকে সড়কে টেনে এনে কামুক পুরুষদের মনোচাহিদা পূরণের অন্যতম উৎস করা হবে। পৃথিবীতে নারীজাতির সাথে এখন এমনই ইনসাফ ও আচরণ করা হবে। চাই তারা রাজী থাকুক বা না থাকুক।

নতুন জীবনব্যবস্থা

নতুন এ ধর্মের ব্যাখ্যা ডক্টর জন কোলেমান (Dr. John Coleman) তার *Conspirators Hierarchy : The committee of 300* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এই নতুন ধর্ম মানুষের মাঝে প্রবেশ করাচ্ছে। ডক্টর জন কোলেমানের বক্তব্য পড়ার পর আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আধুনিক কোনো পদ্ধতি নয়, বরং তা পূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা এবং নতুন একটি ধর্ম।

তিনি লেখেন : 'এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা—যাকে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সরকার শাসন করছে। এটি অনির্বাচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু ব্যক্তিদের আয়ত্তে রয়েছে। সম্ভবত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার আকারে নিজের চাহিদামতো বিষয়গুলো নির্বাচন করছে। নতুন এ আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পৃথিবীজুড়ে বসবাসকারীদের সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং প্রত্যেক বংশেই সন্তানসংখ্যার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। কোনো অঞ্চলে বেশি থাকলে যুদ্ধ এবং মহামারী ছড়িয়ে সেখানকার জনসংখ্যা কন্ট্রোল করা হবে। শুধু ওই পরিমাণ বাকি থাকবে, যে পরিমাণ থাকলে সেখানে নিযুক্ত আমাদের সরকার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়।

শ্রেণিবিভাজন

কোনো 'মধ্যমস্তর' বাকি থাকবে না। শুধু বিচারক আর প্রজা থাকবে। সমস্ত বিচারকার্য সারা পৃথিবীজুড়ে একই নিয়মে পরিচালিত হবে। এগুলো বাস্তবায়নে একপক্ষীয় সরকারী পুলিশ এবং জাতিসংঘ সেনাবাহিনী পৃথিবীর সর্বস্থানে বিরাজমান থাকবে। তখন পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রে প্রদেশভিত্তিক বিভক্তি থাকবে না। সকল কার্যক্রম এক সরকারের সংবিধানমতে পরিচালিত হবে। যে সকল লোক এক সরকারি নিয়মের অনুসারী হয়ে যাবে, তাকে জীবনধারণের সকল আসবাবপত্র সহজে দেওয়া হবে। আর যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাবে অথবা তাদেরকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করা হবে। যে কেউ চাইলেই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারবে। কোনোরূপ অস্ত্র-সস্ত্র, হাতিয়ার বা কোনোরূপ ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু সাথে রাখা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

ধর্ম একটিই

শুধুমাত্র একটিই ধর্ম পালন করার অনুমতি বাকি থাকবে, আর সেটাও হবে আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে, যার সূচনা ১৯২০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। শয়তানি, ইবলিসি আর জাদুবিদ্যাকে সরকারী অধিকার বলে মনে করা হবে। এটা করা হবে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, যেখানে কাউকে ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা প্রদান করা হবে না, এমনকি গণতান্ত্রিক, রাজতন্ত্রিক বা মানবাধিকারের কোনো অনুমতি সেখানে থাকবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে এ বিশ্বাস গেঁথে দেওয়া হবে যে, সে এক সরকারের সৃষ্ট ব্যক্তি। তার ওপর একটি পরিচয়পত্র (আইডি নম্বর) নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। এই পরিচয় নম্বরটি একটি কেন্দ্রীয় তথ্যাগারে (Central server) থাকবে। সর্বদা সেটি একটি আন্তর্জাতিক এজেন্সির তদারকিতে থাকবে।

অবাধ যৌনাচার ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

বিবাহ করাকে অসংবিধানিক অথবা সেকেলে রীতি বলে আখ্যায়িত করা হবে। তখন আজকালের মতো বংশীয় জিন্দেগি অবশিষ্ট থাকবে না—বাচ্চাদেরকে শিশুকালেই পিতামাতা থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে। পুরোপুরি সরকারি তদারকিতে তাদের লালন-পালন করা হবে। যুবক-যুবতিদেরকে সম্পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা দেওয়া হবে। নারীদেরকে নিজে নিজে গর্ভপাত ঘটানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং দুই সন্তান হওয়ার পর নারীরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে। প্রতিটি নারীর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সরকারের কম্পিউটারে বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান থাকবে। দুটি সন্তান হওয়ার পরও যদি কোনো নারী গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে তাকে জোরপূর্বক গর্ভপাত করানোর জন্য ক্লিনিকে নিয়ে চিরদিনের জন্য বন্ধ্যা করে দেওয়া হবে।

যুবক যুবতীদের যৌন মেলামেশা ব্যাপক করার জন্য ম্যাগাজিন এবং ন্যাকেড ফিল্ম তৈরি করা হবে (যা ইন্টারনেটে এখনই প্রচুর পরিমাণে আছে)। প্রত্যেক সিনেমায় আবশ্যিকভাবে একাংশ ওপেন ন্যাকেড সিন রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি কন্ট্রোল করার জন্য এ জিনিসগুলো খাদ্য ও পানীয়র মাঝে লোকদের অজ্ঞানে মিশিয়ে দেওয়া হবে। সকল শিল্প-মৌল বিষয়সমূহ রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেওয়া হবে। শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বদের আন্তর্জাতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে। বয়োঃবৃদ্ধ এবং স্থায়ী রোগীদের জন্য বিষের টিকাগ্রহণে বাধ্য করা হবে। পৃথিবী থেকে অধিকাংশ বৃদ্ধ ও কর্মহীন ব্যক্তিদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া হবে'।

শয়তান-পূজা

তবে ইলুমিনাতি একেবারে ধর্মহীন—সে কথা বলার সুযোগ নেই। তারা লুসিফার নামক শয়তানের পূজা করে। কালো কাপড় পরে আমাবশ্যার রাতে তারা মিলিত হয় শয়তানের পূজা করতে। মদ, জুয়া, অবাধ যৌনচার এমনকি সমকাম করার মাধ্যমে তারা তাদের উপাস্য লুসিফারের পূজা করে থাকে।

জন কোলেমান যা বলতে চাইলেন এর অধিকাংশই বাস্তবায়নের এক ঘৃণ্য প্রয়াস বর্তমান পরিস্থিতির গভীরে তাকালে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। বর্তমান পৃথিবীকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি গ্রাম বানানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্যও কেবল এটাই যে, সকল নেতৃত্ব একটি মাত্র বিশ্বশক্তির হাতে থাকুক। যাতে

বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সকলের ওপর সার্বিক নজরদারি করা সহজ হয়।

শোনা যাচ্ছে, 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার'কে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেওয়ার জন্য জাতিসংঘের পরবর্তী কার্যক্রম হচ্ছে ভিসাবিহীন রাষ্ট্র বা সীমানাহীন বিশ্ব। মূলত এই 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' ব্যতীত আর কিছুই নয়, দাজ্জালের এডভান্স ফোর্সের বিশ্বব্যাপী প্রস্তুতি।[২৫]

২৫ Conspiratons Hierarachy : The Committee of 300. By- Dr. Jhon Coleman

[১১]

‘বিশ্বভ্রাতৃত্ব’, ‘বিশ্বনিরাপত্তা’ ও ‘জাতিগত বন্ধুত্ব’

বিশ্বভাতৃত্ব, বিশ্বনিরাপত্তা আর জাতিগত বন্ধুত্ব হলো ইলুমিনাতির ONE WORLD ORDER -এর প্রতিশব্দ। ‘বিশ্বভ্রাতৃত্ব’-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইহুদি ভ্রাতৃত্ব কিংবা তাদের সহযোগী-সমর্থক। ইহুদিবিরোধী কোনো জাতি-গোষ্ঠী বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত নয়; বরং তারা তাদের ভাষায় মানবীয় ভ্রাতৃত্বের বহির্ভূত, বরং এরা মানবতার জন্য হুমকি। ভিন্ন শব্দে বললে ‘আন্তর্জাতিক প্রতিপক্ষ’। তাই যখন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘অমুক ভূখণ্ডের বর্তমানের পরিস্থিতিতে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন’, তখন একথার দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, এসব অঞ্চলে ইহুদি-স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন। আর তাই ইহুদি ভ্রাতৃত্ব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

‘বিশ্ব নিরাপত্তা’র দ্বারা উদ্দেশ্য এমন একটি জগত, যেখানে ইহুদিদের পরিকল্পনার বিস্তৃত ফলস্বরূপ ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা ও হাইকেলে সুলাইমানি নির্মাণে কোনো শক্তি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে না। এই নিরাপত্তা অর্জনেরই লক্ষ্যে খোরাসানকে (বর্তমান আফগানিস্তান) রক্তের সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিরাপত্তার সন্ধানেই ইরাকের নিষ্পাপ শিশুদের জীবন কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই সেই শান্তি মিশন, যার গতি এখন ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে মোড় নিয়েছে এবং এখানকার মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে বাধ্য করছে, যেন তারা নিজেদেরকে মূর্তিপূজারীদের সম্মুখে নত করে দেয়।

একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদেরকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, শুধু মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকেই নিরস্ত্র করা হচ্ছে কেন? অথচ ইহুদি/খ্রিস্টান/মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডগুলোকে সবদিক থেকে আরও অস্ত্রসজ্জিত করা হচ্ছে? উত্তর হলো, ইহুদি/খ্রিস্টান/মূর্তিপূজারী ভূখণ্ডগুলো অস্ত্রসজ্জিত হওয়া ‘বিশ্ব নিরাপত্তা’র জন্য জরুরি আর মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর অস্ত্রসমৃদ্ধ থাকা কথিত ‘বিশ্বশান্তি’র জন্য হুমকি।

এছাড়া আরও বহু পরিভাষা আছে, যেগুলো ইহুদিরা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, বিশ্বশান্তি, সন্ত্রাসবাদ, সুবিচার,

সমঅধিকার, লিঙ্গবৈষম্য, নারী স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসব পরিভাষার মর্ম বুঝতে আমাদেরকে ইহুদিদের পরিকল্পনাসমূহ জানতে হবে। অন্যথায় কিয়ামত পর্যন্ত আমরা শান্তি, নিরাপত্তা ও জাতীয় পরিভাষাসমূহের যথার্থ প্রয়োগের দুঃখ-কান্না কাঁদতেই থাকব, কোনো লাভ হবে না।

বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ড ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা করে পূর্ব-তিমুরকে খ্রিস্টপ্রধান স্বাধীন ভূখণ্ডে পরিণত করা হচ্ছে, অথচ ফিলিস্তিন-কাশ্মীর-আরাকানের ক্ষেত্রে ইহুদি আর মূর্তিপূজারীদের মদদ জোগানো হচ্ছে। একজন ইহুদির মৃত্যুতে সমগ্র বিশ্বের মিডিয়া চিৎকার করে উঠছে আর মুসলিম উম্মাহর রক্তে নদী-সাগরকে লাল করা হলেও কারও মানবাধিকারের কথা মনে পড়ছে না। মিয়ানমারের রাখাইনের মুসলিমনিধন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। লক্ষ লক্ষ মুসলিম সেখানে হত্যা করা হলেও মানবাধিকার লজ্জিত হয় নি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয় নি; কারণ, তারা মুসলিম।

‘জাতিগত বন্ধুত্ব’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম রাষ্ট্রের ওপর পূর্ণ আস্থা আনিয়ে ভৌগলিক নিরাপত্তার বিষয় গুরুত্বহীন করে তোলা। সুতরাং এখন আর তোমার আধুনিক অস্ত্রের কোনো দরকার নেই। কাজেই এখন থেকে তুমি তোমার অর্থনীতিতে উন্নতি সাধনের প্রতি মনোনিবেশ করো এবং রাষ্ট্রকে অস্ত্রমুক্ত করে সেনাবাহিনীকে ‘পুতুল’ বানিয়ে রাখো। এসব প্রতারণাপূর্ণ পরিভাষাগুলো তারা জাতিসংঘের সহযোগিতায় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং শান্তিপূর্ণ অস্ত্রমুক্ত পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যেই তারা জাতিসংঘ সৃষ্টি করেছে।[২৬] জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য হলো, পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা এবং যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত না হয় বরং যুদ্ধের পরিবেশই তৈরি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা। জাতিসংঘ সৃষ্টির ভায়া হয়ে ইহুদিরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন সৃষ্টি করেছে, যা সারা বিশ্বের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তৈরি করেছে ওয়ার্ল্ড ফুড অর্গানাইজেশন যা সারা বিশ্বের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন সৃষ্টি করেছে—যা বিশ্বের স্বাস্থ্যভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া আরও প্রচুর সংস্থা আছে, যেগুলোর মাধ্যমে জাতিসংঘকে পুতুল বানিয়ে ইহুদিরা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

---

২৬ ntv news, Online, 8 December 2017;

আমরা বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা ভালো মনে করলেও এর পেছনে ইহুদিদের আসল উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ তারা বাস্তবায়ন করে নিচ্ছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, মুসলিমবিশ্বকে অস্ত্রমুক্ত রাখা। রাশিয়ার হাতে সাত হাজারের বেশি পারমাণবিক বোমা রয়েছে, আমেরিকার হাতে রয়েছে ছয় হাজারের বেশি। ইসরাইল মাত্র ২২ হাজার বর্গকিলোমিটারের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হয়েও তাদের হাতে ২০০-এর বেশি পারমাণবিক বোমা রয়েছে; তা নিয়ে জাতিসংঘের কোনো মাথাব্যথা নেই। অথচ ইরান পরমাণু বোমা বানাতে গেলে সমস্যা। মুসলিমরা অস্ত্র তৈরি করতে গেলে শান্তি নষ্ট হয়, সন্ত্রাসবাদের উত্থান হয়। আর আমেরিকা-রাশিয়া-বৃটেন-ফ্রান্স পরমাণু অস্ত্র তৈরি করলে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা হয়! আসলে এভাবে মুসলিম বিশ্বকে সামরিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার চেষ্টা করা হচ্ছে, বলা চলে ইতোমধ্যে তারা সফলও হয়ে গেছে। আপনি জেনে অবাক হবেন, আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের বেশ ভালো বন্ধুত্ব রয়েছে। অথচ স্বাধীনতার সময় আমেরিকা বাংলাদেশের বিপক্ষে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব এনেছিল। যদি সেই প্রস্তাব সেদিন জাতিসংঘে পাশ হয়ে যেত, আমাদের হয়তো সিরিয়া, ফিলিস্তিন বা আফগানিস্তানের মতো অবস্থায় পড়তে হতো। আজও আমাদের পাকিস্তানের অত্যাচার সহ্য করতে হতো। অর্থাৎ আমেরিকা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। সেদিন দুবলার চরের ছয় মাইলের মধ্যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর 'এন্টারপ্রাইজ' অবস্থান করছিল।[২৭] আজ আমরা জাতিসংঘের সদস্য হতে পেরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে ভাবছি, বিশ্ব পর্যায়ে আমরা বুঝি জাতে উঠতে পারলাম। অথচ এর পেছনে কাজ করছে সম্পূর্ণ ইহুদি চক্রান্ত। না-জেনে না-বুঝে তাদের একবিশ্ব-একরাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা আমরা পূরণ করার সুযোগ করে দিচ্ছি জাতিসংঘের মাধ্যমে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর ইলুমিনাতি ইইউ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন করেছে। এর মাধ্যমে বর্তমান ২৯টি দেশে ভিসা ফ্রি ভ্রমণ করা যায়।[28] দিন দিন এটা আরও অনেক বেশি বিস্তৃত হবে। বর্তমানে অনেক দেশ তাদের সীমান্ত খুলে দিচ্ছে। চীন নির্মাণ করছে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড'[২৯], এমনকি বাংলাদেশও ইতোমধ্যে 'এশিয়ান হাইওয়ে'র সাথে যুক্ত হওয়ার চুক্তি

২৭ বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯; roar media, ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮;

২৮ politics news 24, March 17, 2018;

২৯ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ অক্টোবর, ২০১৬; ইউকিপিডিয়া;

[১২]

প্রটোকল; ফাঁস হয়ে যাওয়া ইহুদি চক্রান্তের এক ঘৃণ্য দলিল

ফ্রিম্যাসন-ইলুমিনাতি বা ইহুদি রাজত্বের কথা বললে অনেকে বিদ্রুপের হাসি দেয়। এসব ব্যাপার সন্দেহের চোখে দেখে। এই উত্তরাধুনিক যুগে এ-ও কি সম্ভব যে, গুটিকয়েক ইহুদির এক গোষ্ঠী পুরো বিশ্ব দখল করে আছে? গত দুশো বছরে জাতিরাষ্ট্র গঠনের যে আন্দোলনগুলো হয়েছে, যা আমাদের স্বকীয়তা এবং স্বাধীন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব এনে দিয়েছে—তা কি শুধুই ধোঁয়াশা ছিল? এও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। হ্যাঁ, 'স্বাধীনতা','উদারতা', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'গণতন্ত্র' শব্দগুলো নিছক কিছু অক্ষরের বাহার মাত্র। এগুলোর বাস্তব উদাহরণ সমাজে অনুপস্থিত। হ্যাঁ, একটা সময় আমরা ঠিকই প্রকৃতভাবে স্বাধীন ছিলাম। আমাদের একসময় খেলাফতব্যবস্থা ছিল। ইউরোপে ধর্মীয় প্রভাব ছিল। যখনই আমরা উদারতা, ভ্রাতৃত্ব আর গণতন্ত্রের শ্লোগান তুলেছি, তখনই আমরা পরাধীন হতে শুরু করেছি। দালালগোষ্ঠী আমাদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের তুলে দিয়েছে। নির্মম সত্য হলো, আমাদের পৃথিবী এখন আমাদের হাতে নেই। এটা বিশ্বাস না হলেও, বিশ্বাস করতে হবে।

'বিশ্বে ইহুদি-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে'—এই বিশ্বাস দৃঢ় করেছে জায়োনিস্ট ইহুদিদের প্রটোকোল। প্রটোকোল হলো ইহুদিদের বিশ্ব দখলের পরিকল্পনার ছকগুচ্ছ। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাশিয়ায় প্রটোকোলের প্রথম প্রকাশ হলে দাবানলের মতো এর খবর ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বে। ইংল্যান্ড, জার্মান, আমেরিকায় খুব দ্রুতই এর অনুবাদ প্রকাশ হয়। তৎকালীন বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাথে প্রটোকোলের অদ্ভুত মিল পাওয়া গিয়েছিল। ইসলামি খেলাফত ধ্বংস, বলশেভিক বিপ্লব, ফ্রান্স, ইটালি, স্পেন, অস্ট্রিয়াসহ পুরো ইউরোপে রাজতন্ত্র ধ্বংসের মতো ঘটনগুলোর ইঙ্গিত ছিল প্রটোকোলে। তাই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এর ওপর প্রবল বিশ্বাস রাখতে শুরু করেন; এর সত্যতার ব্যাপারে

কথা বলতে শুরু করেন। ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাব 'তালমুদে'র মূলমন্ত্রই যেন এই প্রটোকোল। তালমুদের ভবিষ্যৎবাণীগুলো বাস্তবায়নের স্ট্রেটেজিই ধরা যায় এই প্রটোকোলকে। জায়োনিস্ট মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা থিউডর হার্জেল[৩৩]-এর *DER JUDENSTAAT* (*ইহুদিবাদী রাষ্ট্র*) বইয়ের ভাষ্যই যেন এই প্রটোকোল। এই সবকিছু বিবেচনা করলে এর মধ্যে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, প্রটোকোল ইহুদিদেরই ভাবনাপ্রসূত।

প্রটোকোলের ইতিহাস

১৮৯৭-১৯৫১ সাল পর্যন্ত জায়োনিস্ট ইহুদিদের মোট তেইশটি কংগ্রেস সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সুইজারল্যান্ডের বাসেলে ১৯৯৭ সালে। আর শেষটি হয়েছিল ১৯৫১ সালে কুদস শহরে। প্রতি সভাতেই জায়নবাদী ইহুদিদের তিনশত সদস্য উপস্থিত থাকত। এইসব সভায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন, ইসরাইল রাষ্ট্রের সীমানা এবং বৈশ্বিক ইহুদি রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হতো। সভাগুলোতে এতই গোপনীয়তা অবলম্বন করা হতো যে, আলোচিত বিষয়গুলো অনেক প্রভাবশালী ইহুদিরাও জানত না। আর সাধারণ মানুষের কাছে এর খবর পৌঁছা ছিল কল্পনাতীত।

১৯০১ সাল। ফ্রান্সে জায়োনিস্টদের এক সভা হচ্ছিল। সেই সভা থেকে ফ্রান্সের এক ভদ্রমহিলা কিছু ডকুমেন্ট চুরি করেন। যা কিছু পান, নিয়ে চলে আসেন। সেই মহিলার চুরিকৃত ডকুমেন্টই আজকের প্রকাশ্য প্রটোকোল।

---

৩৩ থিওডোর হার্জেল : যিনি বেঞ্জামিন জে'ইভ হার্জল (হিব্রু ভাষায়: בִּנְיָמִין זְאֵב הֶרְצֵל) (এবং חוֹזֵה הַמְּדִינָה নামেও পরিচিত; হাঙ্গেরীয় ভাষায় : Herzl Tivadar লেখা হয়।) থিউডোর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির একজন ইহুদি সাংবাদিক ও লেখক। মে ২, ১৮৬০-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাকে আধুনিক ইহুদি রাজনীতির জনক এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হার্জেল 'বিশ্ব ইহুদি সংস্থা' গঠন করেন এবং বিভিন্ন দেশের ইহুদিদের অভিবাসী হিসেবে ফিলিস্তিনিতে নিয়ে আসেন ও একটি সতন্ত্র ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। জুলাই ৩, ১৯০৪ সালে তিনি মারা যান।

ডকুমেন্টগুলো তিনি নিজের কাছে রাখেন নি। এর গুরুত্ব বুঝে পূর্ব-রাশিয়ার একজন রাজনৈতিক নেতা নিকোলা নেভিচের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনিও তা নিজের কাছে রাখলেন না। এর বেশ কিছু অংশ ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় তিনি এটা সার্জ নাইলোস (১৮৬২-১৯২৯) নামের এক পাদরির কাছে দিয়ে দেন। এই সার্জ নাইলোসই প্রটোকোলের প্রথম প্রকাশক।

সন্দেহ নেই তিনি এই প্রটোকোলকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। এর উপাদানগুলোকে তৎকালীন পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বাস্তব উপলব্ধিই করতে পেরেছিলেন। প্রটোকোল পড়ে তিনি কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যেগুলো পরে বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছিল। তার ভবিষ্যৎবাণীগুলো ছিল অনেকটা এরকম :

- ✓ ১. রাশিয়ার রাজতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। কম্যুনিস্টরা রাশিয়ার ক্ষমতায় আসবে। বিশ্বজুড়ে ফাসাদ, গণ্ডগোল এবং দমনের মাধ্যমে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে এবং এর মূল কেন্দ্র হবে রাশিয়ায়।

- ✓ ২. ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগেই ইসলামি খেলাফত ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিকল্পনার ছক আঁকবে এই ইহুদিরাই।

- ✓ ৩. দলে দলে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন করবে। সেখানে এক ইহুদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে।

- ✓ ৪. ইউরোপের রাজতন্ত্রগুলো আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে।

- ✓ ৫. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে। পরাজিত অপরাজিত সব পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মাঝখানে লাভবান হবে শুধু ইহুদিরা।

- ✓ ৬. প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে।

- ✓ ৭. স্বর্ণকে কেন্দ্র করে অর্থব্যবস্থা চালু করা হবে। কারণ, স্বর্ণ আজ ইহুদিদের দখলে চলে গেছে।

যেভাবে প্রকাশ পেল প্রটোকোল

পাদরি সার্জ নাইলোস নিজ উদ্যোগে রাশিয়ার সেইন্ট পিটারবর্গের *জানাইম ম্যাগাজিন*-এ প্রথমবারের মতো প্রটোকোল প্রকাশ করেন৷ এতে রাশিয়ার সম্রাট নিকোলা দ্বিতীয় (১৮৬৮-১৯১৮) এবং রাশিয়ান পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা ইউনিট 'উকরানা'র প্রকাশ্য সমর্থন ছিল৷ প্রটোকোল প্রকাশের পরই ইহুদিদের টনক নড়ে ওঠে৷ রাশিয়ায় ইহুদিঘৃণা চরম আকার ধারণ করে৷ রাশিয়াজুড়ে ইহুদি দমন শুরু হয়৷ কতগুলো গণহত্যার ঘটনাও ঘটে৷ এক গণহত্যায় তো প্রায় দশ হাজার ইহুদিকে হত্যা করা হয়৷ থিউডর হার্জেল, মুসা জায়োনিস্ট নেতারা এর সত্যতা অস্বীকার করেন; কিন্তু কাজ হয় নি৷ তৎকালীন বিশ্ব-পরিস্থিতির সাথে এর মিল থাকায় এর সত্যতার প্রতি মানুষের ব্যাপক আস্থা জন্মে যায়৷

সার্জ নাইলোসের চেষ্টা থেমে থাকে নি৷ ১৯০৫ সালে প্রটোকোলের নতুন এডিশন প্রকাশ করেন তিনি৷ এই এডিশনে তার দারুণ একটি ভূমিকা আছে৷ (তার ভূমিকাটি আরবি অনুবাদের সঙ্গে ১৯৬১ সালে ছাপা হয়েছে৷[৩৪] এই এডিশনও দ্রুত ফুরিয়ে যায়৷ ইহুদিরাই বেশি বেশি কিনে নেয়৷ ১৯১১ সালে এর তৃতীয় সংস্করণ বের হয়৷ আর ১৯১৭ সালে বের হয় এর চতুর্থ সংস্করণ৷ সে-বছর বলশেভিক বিপ্লব তুঙ্গে ছিল৷ এই আন্দোলনটি ইহুদি-প্রভাবিত হওয়ায় রাশিয়ায় এর নতুন কোনো সংস্করণ হয় নি; এবং ধীরে ধীরে পরবর্তী সময়ে এর প্রচারও বন্ধ হয়ে যায়৷

ব্রিটেনে প্রটোকোলের প্রকাশ

১৯১৭ সাল৷ বলশেভিকরা রাশিয়ার ক্ষমতায়৷ ইংল্যান্ডের *মোর্নিং পোস্ট*[৩৫]-এর নিজস্ব প্রতিবেদক ভিক্টর এমিল মার্সডেন (১৮৬৬-১৯২০) কম্যুনিস্ট রাশিয়ার খবর আনতে রাশিয়ায় যান৷ সেখানে তিনি এই প্রটোকোলের কথা বার বার শুনতে পান৷ ব্রিটেনেও এর কপি কোথাও যেন দেখেছিলেন তিনি৷ তার মনে

৩৪ দেখতে পারেন, খলিফা তিউনিসির আরবি অনুবাদ : *ব্রোতোকোলাত হুকামা সাহয়ুন*, পৃষ্ঠা : ১০৫-১১০

৩৫ *দ্য মর্নিং পোস্ট* (*The Morning Post*) হলো একটি রক্ষণশীল দৈনিক পত্রিকা; যা লন্ডনে ১৭৭২ থেকে ১৯৩৭ প্রকাশিত *দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ* (*The Daily Telegraph.*) দ্বারা অধিকৃত ছিল।

পড়ছে না। দেশে ফিরেই তিনি এর খুঁজে বের করেন। প্রটোকোল পড়তে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, প্রকাশক নাইলোস ১৯০৫ সালে বলশেভিক বিপ্লবের যেই ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, তা আজ প্রতিফলিত হচ্ছে। তার কৌতূহল বেড়ে যায়। তিনি এর অনুবাদের ইচ্ছা করেন। রাশিয়ার ১৯০৫ সালের প্রকাশের একটি কপি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে। তার ওপর তারিখ লেখা ১০ আগস্ট ১৯০৬। মার্সডেন সেই কপিকে সামনে রেখে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এই কপিকে সামনে রেখে ১৯৬১ সালে মিশরের সাহিত্যিক খলিফা তিউনিসি এর আরবি অনুবাদ করেন। ইংল্যান্ডে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। ১৯২১ সাল পর্যন্ত এর মোট পাঁচটি সংস্করণ বের হয়। ১৯২১ সালের পর আর কোনো সংস্করণের খবর জানা যায় নি।

জার্মানিতে প্রটোকোলের প্রকাশ

১৯১৯ সালে লুডাফিগ মিলার 'জায়োনিস্ট নেতাদের রহস্য' শিরোনামে জার্মান ভাষায় প্রটোকোল প্রকাশ করেন। প্রকাশের পর ওইস্সের জার্মান পার্লামেন্টে এর পাঠসভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯২০ সালে পিউটের নিকোলাভিচ এবং ফায়ডর ভিকট্রোভিচ নিজেদের এক বইয়ের সঙ্গে জার্মান অনুবাদটি যোগ করে দেন। নাৎসিবাদী জার্মানিতে এর বেশ প্রভাব পড়ে। পরবর্তী সময়ে এই প্রটোকোলই জার্মানে ইহুদি-দমনের নেপথ্য কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আলফ্রেড রোজেনবার্গ (১৮৯৩-১৯৪৬) আগা-গোড়া একজন নাৎসি আন্দোলনের পুরোধা। নাৎসিবাদী জার্মানের 'ফরেইন পলিসি অফ অফিস'-এর অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন (১৯৩৩-১৯৪৫)। তিনিই নাৎসি শিবিরে এর পরিচিতি ঘটান। ইহুদি, জায়োনিস্ট, ফ্রিম্যাসন ষড়যন্ত্র নিয়ে পাঁচটি রচনা লেখেন। তার রচনাগুলো ছিল :

এক. Immorality in Talmud (তালমুদের নীতিভ্রষ্টতা) ১৯২০।

দুই. The crime of freemasonary: Judism, Jesuitsm, German Christnanity (ফ্রিম্যাসনের অপরাধনামা : ইহুদিবাদ, খ্রিস্টবাদ (একটি বিশেষ মতবাদ), জার্মান খ্রিস্টবাদ) ১৯২১।

তিন. Zionism the enemy of state (জায়নবাদ দেশের শত্রু) ১৯২২।

চার. The protocols of the elders of zion and the jews world politics (জায়নিস্ট নেতাদের প্রটোকোল এবং বৈশ্বিক ইহুদি রাজনীতি) ১৯২৩।

পাঁচ. The Myth of the 20th Century (বিংশ শতাব্দীর শ্রুতিকথন) ১৯২৩।

নাৎসি শিবিরে তার রচনাগুলো প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫), হেইনরিড লুইটপোল্ড হিমলার (১৯০০-১৯৪৫), আলফ্রেড রোজেনবার্গের মতো নেতারা প্রটোকোলের সত্যতায় বিশ্বাস করতেন। হিটলার তার জীবনীগ্রন্থ *মাইন ক্যাম্প* এ লেখেন—

> 'The Protocols are based on a forgery, the *Frankfurter Zeitung* moans every week. which is the best proof that they are authentic. the important thing is that with positively terrifying certainty they reveal the nature and activity of the Jewish people and expose their inner contexts as well as their ultimate final aims.'[36]

> *ফ্রাঙ্কফোর্টৰার জেইতুং* পত্রিকা প্রতি সপ্তাহে বিলাপ করে, 'প্রটোকোলগুলো জালিয়াতির ওপর ভিত্তি করে বানানো হয়েছে'। এটাই প্রমাণ করে সেগুলো খাঁটি। প্রটোকোলগুলোতে সুনিশ্চিতভাবে ইহুদিদের প্রকৃত স্বভাব এবং কার্যকলাপ প্রকাশ পেয়েছে এবং এটাও জানা গেছে, তাদের সর্বশেষ উদ্দেশ্য আসলে কী'।

জার্মানের বাহিরে অস্ট্রিয়ার নাৎসিবাদী নেতা ডক্টর এ জানডের ১৯৩৪ সালে প্রটোকোল নিয়ে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রটোকোলের ওপর তার বিশ্বাস এবং এর সত্যতার কথা বলেন। প্রবন্ধ লেখার কারণে তাকে আদালতের মুখোমুখি হতে হয়। আদালত বলে এগুলো মিথ্যা। পরে তার আর্থিক জরিমানা হয়।

---

৩৬ ফায়ারবর্ণের ছাপা, পৃষ্ঠা : ৩০৩

আমেরিকায় প্রটোকোলের প্রকাশ

১৯২০ সালে হেনরি ফোর্ডের মালিকানাধীন *ডেয়ারবর্ন ইন্ডিপেন্ডেন্ট* নামক সাপ্তাহিত পত্রিকা প্রটোকোল প্রকাশ করে। এরপর হেনরি নিজ খরচে বই আকারে প্রটোকোলের প্রায় পাঁচ লক্ষ কপি ছাপান।

আরববিশ্বে প্রটোকোলের প্রকাশ

বেলফর ডিকলারেশনের পর ১৯২১ সালে আরব খ্রিস্টানরা প্রটোকোলের অনুবাদ প্রকাশ করে। ফিলিস্তিনে প্রকাশ হয় ১৯২৫ সালে। সিরিয়ায় প্রকাশ হয় ১৯২৬ সালে। মুসলিমদের হয়ে মিশরের মুহাম্মাদ খলিফা তিউনিসি আরবি অনুবাদ করেন। খলিফা তিউনিসির ১৯৬১ সালের শক্তিশালী এবং পূর্ণ এই অনুবাদটিই পরে আরববিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

প্রটোকোলের মূলমন্ত্র

✓ ১. ইহুদিকতৃক বিশ্ব দখলের পরিকল্পনা, যার পরিচালনায় রয়েছে তাদের ধর্মীয় নেতারা। এই ভাবনা অন্য ধর্মের প্রতি চরম ঘৃণা থেকে সৃষ্টি।

✓ ২. প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলো অপসারণ করা। সরকারকতৃক জনগণকে নিপীড়ন এবং জনগণকতৃক বিদ্রোহ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। উভয় পক্ষই তখন আতংকের ভেতরে থাকবে। এক সময় দেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সরকারের পতন হবে।

✓ ৩. গোপন সভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেওয়া।

✓ ৪. ইহুদিদের বিশ্বাস হলো, প্রতিষ্ঠিত সরকার এবং প্রচলিত রাজনীতি হলো নোংরা। এই নোংরামির মাত্রা বাড়িয়ে বিশ্বে ইহুদিরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করা।

✓ ৫. চতুষ্পদ জন্তুকে যেমন শাসন করা হয় অ-ইহুদিদেরও তেমন শাসন করা। অ-ইহুদি নেতাদের দাবার গুটি বানিয়ে রাখা। তাদেরকে নারী, সম্পদ এবং পদের লোভ দেখিয়ে বশে আনা।

✓ ৬. প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া, ইউনিভার্সিটি, থিয়েটার, ফিল্ম প্রতিষ্ঠান, বিনোদনমূলক প্রতিষ্ঠান—সবই তাদের হাতে আসার চেষ্টা করা। এগুলোর অসৎ ব্যবহার করে 'সুপার গভর্নমেন্ট' প্রতিষ্ঠা করা।

✓ ৭. বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা স্বর্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা। যে স্বর্ণের সিংহভাগ রয়েছে তাদের-ই দখলে।

✓ ৮. অর্থনৈতিক মন্দা সৃষ্টি করা। দেউলিয়াপনার শিকার হয়ে যেন রাষ্ট্রগুলো একদিন তাদের কাছে হাত বাড়াতে বাধ্য হয়ে, সে ব্যবস্থা করা।

✓ ৯. অসচ্ছল রাষ্ট্রগুলোর ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া। যেন এ সুযোগ ব্যবহার করে তাদের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পাঠক, নিশ্চই এ পর্যায়ে চরম কৌতূহল ও ঘোরের মধ্যে আছেন। হয়তো প্রটোকোলে কী আছে তা জানার প্রবল আগ্রহ জন্মেছে। আমরা পাঠকদের আশাহত করছি না। আব্দুল খালেক সম্পাদিত *ইহুদী চক্রান্ত* বই থেকে প্রটোকোলের চুম্বক অংশগুলো তুলে ধরছি :

'স্বাধীনতা' 'উদারতা' 'ভ্রাতৃত্ব'-এর আসল রূপ

'রাজনৈতিক আযাদী একটা খেয়ালমাত্র, বাস্তবসম্মত কিছু নয়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা দলকে অপসারণ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে নিজের দলে শামিল করা দরকার, আর ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আযাদীর এই কাল্পনিক ছবিটিকে কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, তা জেনে নেয়াই হচ্ছে কীর্তিমান ব্যক্তির কৃতিত্ব।'[৩৭]

৩৭ ইহুদী চক্রান্ত, পৃষ্ঠা : ৬৮

'অতি প্রাচীনকালে আমরাই সর্বপ্রথম জনগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উদারনীতি','সমান অধিকার' ও ভ্রাতৃত্বের ধোঁয়া তুলেছি। বোকা তোতা পাখীর দল এরপর থেকে এ শব্দগুলোকে অসংখ্যবার উচ্চারণ করছে এবং চারদিক থেকে ছুটে এসে আমাদের এ ফাঁদে ধরা দিয়ে পৃথিবীর সত্যিকার কল্যাণ ও জনগণের প্রকৃত আযাদী হরণ করায় সহায়তা করেছো তারা দেখতে পায়নি যে, প্রাকৃতিক জগতেই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয় এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই আযাদী বলতে কিছু নেই। তারা দেখতে পায়নি যে, প্রকৃতি মন, চরিত্র ও কর্মক্ষমতার তারতম্য সৃষ্টি করেছে এবং যেভাবে সে সকলকে প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে নিতে বাধ্য করেছে ঠিক সেভাবেই সামাজিক তারতম্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।'[৩৮]

'পৃথিবীর কোণায় কোণায় 'উদারনীতি', 'সমান অধিকার' ও 'ভ্রাতৃত্ব' এর বুলি বিপুল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করেছে এবং এক বিরাট বাহিনী সোৎসাহে আমাদের ঝাণ্ডা নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে। এ সাফল্যের জন্য এজেন্টগণ ধন্যবাদার্হ।

'আমাদের প্রবর্তিত শ্লোগানগুলো গইম (অইহুদি) সমাজের সুখ-সমৃদ্ধিকে উইপোকার মতো খেয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র শান্তি, সুখ, সংহতি ও যাবতীয় সংস্থা ধ্বংস করে চলছে। এই ধ্বংসলীলা আমাদের বিজয়ে সহায়ক হয়েছে।[৩৯]'

'আযাদী শব্দটির অর্থগত অস্পষ্টতার দরুণ আমরা সকল দেশের জনতাকে এ-কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ আর সরকার তাদের প্রতিনিধি মাত্র। আর পুরাতন ছিন্ন দস্তানার মতোই প্রতিনিধিকে যেকোন সময় বদলানো যেতে পারে। জনসাধারণের প্রতিনিধিকে পরিবর্তনের এ সম্ভাবনাটিই তাদের নেতাগণকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে এবং ক্ষমতাবলে আমরা তাদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার গুপ্ত অধিকার লাভ করেছি।[৪০]'

---

৩৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭২-৭৩
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৩
৪০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৮

'আমরা শাসনতন্ত্রে জনগণের জন্য এমন সব অধিকারের ফিরিস্তি লিখে দিয়েছি যা জনগণের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। এসব তথাকথিত 'গণঅধিকার' শুধু চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এ চিন্তা কখনো বাস্তব কর্মক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না।[৪১]'

'আযাদী শব্দটি মানুষকে যে কোনো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে দাঁড় করিয়ে দেয়। এ শব্দের মোহে পড়ে মানুষ যে কোনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, এমনকি খোদা এবং প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধেও লড়তে প্রস্তুত হয়ে যায়।[৪২]'

'আযাদী সত্যি কল্যাণকর হতে পারে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা ক্ষতির পরিবর্তে উপকার করতে পারে যদি আযাদী আন্দোলনের ভিত্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান ও মানবজাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ওপর স্থাপিত হয়। সকলের সমান অধিকার দাবীই হচ্ছে সকল অনর্থের মূল। কেননা, সৃষ্টিকর্তাই কোনো মহলকে কোনো কোনো মহলের ওপর প্রাধান্য দান করছেন।[৪৩]'

'আমাদের ম্যাসনদের (ফ্রিম্যাসন) প্রবর্তিত 'উদারতা' 'সাম্য' ও 'ভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি শ্লোগানগুলোকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা এমনভাবে পরিবর্তন করবো যেন শ্লোগান হিসেবে এদের মূল্য খতম হয়ে যায় এবং এগুলো আদর্শ প্রচারের বাহনস্বরূপ ব্যবহার হয়।[৪৪]'

রাজনীতির মঞ্চে ইহুদি

'কোনো রাষ্ট্র নিজস্ব অব্যবস্থার দরুন ধ্বংস হোক অথবা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ বহিঃশত্রুকর্তৃক পদানত—হোক উভয় অবস্থায়ই যে এ রাষ্ট্রের পতন ঘটে এটা অনস্বীকার্য সত্য। আর এই উভয় ধরনের পতন ঘটানোর উপায়-পন্থা আমাদেরই আয়ত্তে। পুঁজির সর্বাত্মক ক্ষমতা

---

৪১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৯
৪২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৩
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৪
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯৬

সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই করায়ত্ত। রাষ্ট্রকে এমন অবস্থায় পৌঁছানো হবে যে, সে পুঁজির সামান্য একটু খড়-কুটার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে সাহায্যের আশায় হাত বাড়াবে। অন্যথায় ধ্বংসের গহ্বরে ডুবে যাবে।[৪৫]'

'আমাদের দৃষ্টিতে শক্তিই 'ন্যায়'। 'ন্যায়নীতি' একটি গুণবাচক শব্দমাত্র। বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। ন্যায়নীতির সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা হচ্ছে, আমি যা চাই তা আমাকে দাও যেন আমি প্রমাণ করতে পারি যে,আমি তোমার তুলনায় বেশি শক্তিশালী।[৪৬]'

'বর্তমান জরাজীর্ণ কর্তৃত্বের মুকাবেলায় আমাদের কর্তৃত্ব হবে অত্যন্ত পরাক্রান্ত। যে পর্যন্ত আমরা এতটা ক্ষমতা সঞ্চয় করতে না পারছি যেন কোন ধূর্ততম ব্যক্তির পক্ষেও আমাদের ক্ষমতাকে হেয়-প্রতিপন্ন করা সম্ভব না হয়; সে পর্যন্ত আমাদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অদৃশ্য থাকবে।[৪৭]'

'বর্তমানের সকল শাসনতান্ত্রিক কাঠামো শিগগিরই ভেঙে পড়বে। কারণ, শাসনতন্ত্র প্রণয়ের সময়ই আমরা এতে এমনভাবে ভারসাম্যের অভাব রেখে দিয়েছি—যেন সর্বদা একটা দোদুল্যমান অবস্থা বিরাজ করে; যতক্ষণ পর্যন্ত না চাকা ঘুরে যায়।[৪৮]'

'আমাদের দালালগোষ্ঠীর যেসব ভৃত্যকে আমরা শাসনক্ষমতায় বসিয়ে দিই তাদের স্বপক্ষে অথবা আমাদের নির্দেশিত ব্যক্তির স্বপক্ষে ভোট প্রদানের পুরস্কারস্বরূপই আমরা সর্বহারাদের সামান্য উচ্ছিষ্ট দান করি।[৪৯]'

'বর্তমান বিশ্বশক্তি হিসেবে আমরা একটা অপরাজেয় শক্তি। কেননা, এক শক্তি যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে বহু শক্তি আমাদের সাহায্য করে।[৫০]'

---

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৮
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭০
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭০
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৮
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮০
৫০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮২

'আমরা পূর্ববর্তী শাসকের স্থলে একটি তামাশা দেখানো সরকার কায়েম করেছি। উত্তেজিত জনতার মধ্য থেকে আমাদেরই হাতের পুতুল ও দাসশ্রেণির এক ব্যক্তিকে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছি।[৫১]'

অর্থনীতি ইহুদিদের প্রধান হাতিয়ার

'শীঘ্রই আমরা বড় বড় ইজারাদারি কায়েম করতে শুরু করবো। সম্পদ আমাদের হাতে এমনভাবে পুঞ্জীভূত করবো যে, গইম সমাজের বড় বড় সম্পদশালী ব্যক্তিগণকেও আমাদের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে এবং রাজনীতির ধ্বংস সাধনের পর রাষ্ট্রের যাবতীয় দায়পত্র নিয়ে গইম ধনপতিগণ সর্বনিম্নস্তরে নেমে যাবে।[৫২]'

'রাষ্ট্রগুলোর সকল যন্ত্রের চাকা ইঞ্জিনের শক্তিতেই ঘোরে, আর সেই ইঞ্জিন, অর্থাৎ, সোনা একমাত্র আমাদেরই দখলে।[৫৩]'

'শিল্প-কারখানাসমৃদ্ধ দেশ থেকে শ্রম ও সম্পদ কুঁড়িয়ে হস্তগত করবে এবং ফটকা বাজারের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল সম্পদ আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গোটা গইম সমাজকে সর্বহারায় পরিণত করবে।[৫৪]'

'আমাদের গভর্নমেন্টের চারদিকে আমরা অর্থনীতিবিদদের একটা জগত সৃষ্টি করে দেবো। এইজন্যই ইহুদিদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বিষয় হচ্ছে, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান। পুনরায় আমাদের চারদিকে ব্যাংক মালিক, শিল্পপতি, পুঁজিপতি এবং প্রধানত লক্ষপতিদের এক বিপুল বাহিনী থাকবে। কেননা, সকল জটিল বিষয়ই অর্থনীতির অঙ্কের হিসেবে মীমাংসিত হয়।[৫৫]'

'ঋণ অর্থই হচ্ছে দুর্বলতা এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কিত জনগণের অভাব। বিদেশি ঋণ জোঁকের মতো গইমদের রক্ত শোষণ করে যায়। যতক্ষণ না এ জোঁক নিজে নিজেই কিংবা রাষ্ট্র একে টেনে জোর করে দেহ থেকে আলাদা না করে ততক্ষণ পর্যন্ত জোঁকের শোষণ থেকে মুক্তি নেই। 'গইম

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০৩
৫২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯১
৫৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৮
৫৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯২
৫৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯৫

রাষ্ট্রগুলো কখনো এ জোঁককে দেহ তেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না; বরং তারা দেহের ওপর আরও জোঁক বসাতে থাকে। তাই তাদের রক্তদানের এ পন্থা গইম রাষ্ট্রকে মরণের পথে ঠেলে দিয়েছে।[৫৬]'

'আমরা যখন ঋণগ্রহণের ব্যাপারটিকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র থেকে বর্হিজগতের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম তখন থেকেই গইম রাষ্ট্রের সম্পদ নদীস্রোতের মতো বয়ে এসে আমাদের তহবিল ফাঁপিয়ে দিচ্ছে।[৫৭]'

মিডিয়ায় ইহুদিদের হাত

'আধুনিক যুগের রাষ্ট্রগুলোতে জনগণের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টিকারী একটি বিরাট শক্তি রয়েছে; আর সেটা হলো প্রেস। বাক-স্বাধীনতার বিজয় প্রেসের মাধ্যমেই হয়েছে; কিন্তু গইম রাষ্ট্রগুলো এ শক্তিটিকে কাজে লাগানোর কৌশল আয়ত্ত করতে পারে নি। তাই প্রেস আমাদের হস্তগত হয়েছে। আমাদের হাতে স্বর্ণও আছে। আর প্রেসকে দখল করার জন্য আমাদের অশ্রু ও রক্তের সাগর মন্থন করে স্বর্ণ হাসিল করতে হয়েছে।[৫৮]'

'আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া একটি খবরও জনসাধারণের কাছে পৌঁছতে পারবে না। এমনকি এখনই আমরা এ কাজে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছি। মাত্র অল্প কয়েকটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানই দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে খবর সংগ্রহ এবং তা বিভিন্ন স্থানে পরিবেশন করতে পারে। এগুলোকে আমরা এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করবো যে, এগুলো একমাত্র আমাদের নির্দেশিত তথ্যই পরিবেশন করবে।[৫৯]'

ফ্রিম্যাসন ইহুদিদের এজেন্ট

---

৫৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৪২
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৪৩
৫৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭৬-৭৭
৫৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১১১

'ভদ্রবেশী ম্যাসনরা আমাদের গুপ্ত শক্তির আবরণ হিসাবে কাজ করে। তাই আমাদের গুপ্ত পরিকল্পনা—এমনকি এর অবস্থান জনসাধারণের কাছে একটা অজ্ঞাত রহস্য হয়ে থাকবে।[৬০]'

'পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত আমাদের সমাজ সরাসরি যা অর্জন করতে পারে না—তা বাঁকা পথে হাসিল করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের গুপ্ত ম্যাসনারিদের উদ্দেশ্য এটাই। গইম সমাজের যেসব পশু ম্যাসনারিদের লোক দেখানো লজগুলোর দিকে আকৃষ্ট হয়, এরা এর উদ্দেশ্য তো বুঝতেই পারেই না—এদের মনে ফ্রিম্যাসন লজের বদ মতলব সম্পর্কে কোনো সন্দেহ পর্যন্ত উদয় হয় না। ফ্রিম্যাসন লজ এদের চোখে ধুলা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।[৬১]'

'ইতোমধ্যে যেভাবেই হোক আমাদের রাজ্যে যতদিন ফিরে যেতে না পারি ততদিন পর্যন্ত আমরা দুনিয়ার সকল দেশে ফ্রিম্যাসন লজের সংখ্যা বাড়াতে থাকবো। সমাজের গণ্যমান্য সকল লোকদের এসব লজের মধ্যে শামিল করে নেবো। কেননা, ফ্রিম্যাসন লজই হচ্ছে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার সুচতুর ব্যবস্থা।[৬২]'

সুপার গভর্নমেন্ট (আপাতত তা জাতিসংঘ) ও দাজ্জাল

'আমরা এমন এক সরকার গঠন করবো—যার হাতে সমাজের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হবে। এবং এ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এ সরকারটি আমাদের হাতের মুঠোয় থাকবে।[৬৩]'

'আজকের শাসকদের স্থলে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা স্থাপন করবো—যাকে সুপার গভর্নমেন্ট শাসনব্যবস্থা বলা হবে। আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের হাত সর্বত্র সাঁড়াশির মতো নির্বিবাদে পৌঁছে যাবে এবং এর অধীন বিভিন্ন সংস্থা এমন ব্যাপক ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যে, পৃথিবীর বর্তমান

---

৬০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৪
৬১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০৮
৬২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২১
৬৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৮৬

রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করা আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন হবে না।[৬৪]'

'আমাদের সুপার গভর্নমেন্টের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য আমরা সকল সম্ভাব্য উপায়ে আমাদের বশ্যতা স্বীকারকারীদের ত্রাণকর্তা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে পেশ করবো।[৬৫]')

'যতক্ষণ তারা আমাদের আন্তর্জাতিক অদৃশ্য সরকারের নিকট পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার না করবে ততক্ষণ আমরা কিছুতেই শান্তি দেবো না।[৬৬]'

'ইসরাইলের বাদশাহ (দাজ্জাল) যেদিন ইউরোপের শাহী তাজ (স্টোন অফ দাউদ) মাথায় দেবেন সেদিন থেকে তিনি সারা দুনিয়ার কুলপতির স্থান অধিকার করবেন।[৬৭]'

'তারা পূর্ববর্তী সামাজিক কাঠামোগুলো উচ্ছেদ করে দিয়ে ইহুদি বাদশাহর শাহী আসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে; কিন্তু বাদশাহ রাজ্যে প্রবেশ করা মাত্র এসব শক্তি (গণতান্ত্রিক সরকার) খতম হয়ে যাবে৷ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ তাঁর চলার পথে সামান্যতম প্রতিবন্ধকটিও থাকতে দেবেন না।[৬৮]'

---

৬৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯০
৬৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯১
৬৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৯৭
৬৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২৭
৬৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫২

[১৩]
ইলুমিনাতির অর্থনৈতিক প্রভুত্ব

কাউকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র মাধ্যম হলো তার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা। কাউকে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব করে দিতে পারলে তাকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-ই করুন, একটা কথা হলো; আপনার টাকা নেই তো কিছু নেই। আপনি কেউ না। আপনার টাকা আছে তো সব আছে। এজন্য পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে রথচাইল্ড ফ্যামিলি ইতোমধ্যে তাদের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। বিভিন্ন দেশের সরকার এবং এনজিওগুলোকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দেওয়া এবং পরবর্তী সময়ে ঋণ খেলাপি করে তুলে বিভিন্ন দেশকে নিজেদের দাসে পরিণত করাই এদের লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তারা ব্যবহার করে তাদের উপনিবেশ এবং নিউ ওয়ার্ল্ড ওর্ডার বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে। এরা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া, বৃটেন ইত্যাদি দেশএগুলোকে ব্যবহার করেছে। সরকারি পর্যায়ে নয়, বরং বর্তমান ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পর্যন্ত নিজেদের নেটওয়ার্ক প্রসারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জোরদারভাবে।

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অর্থই হলো, বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ। ক্ষমতা ও অর্থ বর্তমান বিশ্বে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালের পৃথিবীর অর্থনীতি যাদের হাতে, তারাই পৃথিবীর রাজনীতি, সংঘটিত যুদ্ধ, গণআন্দোলন ও জনবিপ্লবের নিয়ন্তা। দৃশ্যায়নের আড়ালের জগতের অলি-গলি চষে এমন কিছু পরিবারের[৬৯] খোঁজ মিলেছে, যাদের হাতে রয়েছে সীমাহীন ক্ষমতা ও অঢেল বিত্ত-বৈভব।

বর্তমানে এই ফ্যামিলিগুলোর নজর ডিজিটাল কারেন্সির দিকে। আপনারা একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বের অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয় আমেরিকান ডলারের বিপরীতে। অর্থাৎ, অতীতে প্রত্যেকটা টাকার বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা অন্যান্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক টুকরা করে স্বর্ণ মজুদ

---

৬৯ সীমাহীন ক্ষমতা ও অঢেল বিত্ত-বৈভব নিয়ে বিশ্ব অর্থনীতি তথা বিশ্ব-রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে এমন কিছু পরিবারের ইতিহাস ও পরিচিতি পরবর্তী অধ্যায়ে তুলে ধরা হবে।

রাখত। বর্তমানে সেটার পরিবর্তে আমেরিকান ডলার মজুদ রাখা হয় এবং একবার ভেবে দেখুন, যদি আমেরিকান ডলারের পতন হয় সেক্ষেত্রে ডলারনির্ভর দেশগুলোর ভাগ্যে কী ঘটবে? আপনারা হয়তো জানেন, কিছুদিন আগে মোদি সরকার ভারতে ১০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করেছিল এবং এ ঘটনায় রাতারাতি হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল। পরে সেই সিদ্ধান্ত বিভিন্ন শর্তের আওতায় বদলে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে এই অচল ৫০০ এবং ১০০০ টাকার ভারতীয় নোট প্রায় ৬৪ কোটি রুপি পড়ে আছে। একবার ভেবে দেখুন এরকম অবস্থা যদি বাংলা টাকার সাথে হয় এবং আপনার হাতের টাকাটা যদি অচল হয়ে যায়, বাংলাদেশ সরকার এটা পাল্টে দিতে সক্ষম না হয়; সেক্ষেত্রে আপনার ভাগ্যে কী ঘটবে? আপনি একেবারে অক্ষম হয়ে পড়বেন, পঙ্গু হয়ে যাবেন।

ডলারের বাইরেও একধরনের কারেন্সি দিয়ে আমরা লেনদেন করে থাকি। আমরা এটাকে বলতে পারি ডিজিটাল কারেন্সি। এই ডিজিটাল কারেন্সিই নিয়ন্ত্রণ করবে আগামী পৃথিবীর অর্থনীতি, যেখানে কোনো কাগজের নোট বা টাকা থাকবে না। এই ডিজিটাল কারেন্সির মাধ্যমে চাইলেই যেকোনো সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে শেষ করে দিতে পারবে। এর অন্যতম হাতিয়ার হবে আরএফআইডি চিপ। আরএফআইডির পূর্ণরূপ হলো; রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন চিপ। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিশ্বের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। কীভাবে? এ্যারোন রুসো নামক এক ব্যক্তি ১০ বছর আগেই এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, হাতের মধ্যে চালের দানার আকারের একটা চিপ ইমপ্লান্ট করা হবে যার মাধ্যমে পুরোপুরি একজন মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ বিষয়ে আরও একটা নিউজ করে ভারতের 'জি নিউজ' টিভি। তাতে বলা হয়, সুইডেনের এক কোম্পানি এপিসেন্টার ১২৫ জন কর্মচারীর হাতের মধ্যে চিপ এই প্ল্যান্ট করেছে। ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রথমে শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে এটা মানুষের দেহের ভিতর সেট করে দেওয়া হয়। সাধারণত এই চিপ বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং তর্জনীর জয়েন্টে প্লান্ট করা হয়। এর মাধ্যমে যে কোনো ধরনের লেনদেন করা সম্ভব। এটা দিয়ে শুধু অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নয়, বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। বিভিন্ন ধরনের সুবিধা এতে থাকবে। পাশাপাশি সবথেকে ভয়ংকর ব্যাপার হলো, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বলতে কিছু থাকবে না। প্রত্যেকটা মানুষকে আলাদা ভাবে ট্রাক করা সম্ভব হবে এবং তাকে অনুসরণ করে তার পেছনে লেগে থাকা সম্ভব হবে। ইউনিক আইডেন্টিটি বা আইপি এড্রেসের মতো

মানুষ হয়ে উঠবে যন্ত্র। বাংলাদেশেও ডিজিটাল কারেন্সি ব্যবহারের প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষণীয়। বাংলাদেশের বিকাশ, নেক্সাস পে, রকেট, শিওরক্যাশসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে লেনদেনের বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। তদুপরি ডিজিটাল মুদ্রা ব্যবহারে আমাদেরকে রীতিমতো উৎসাহ জোগানো হচ্ছে। ডিজিটাল কারেন্সি নিয়ে কিছুদিন আগে একটা বিজ্ঞাপন দেখানো হয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি ভুলে মানিব্যাগ ছাড়া শপিংয়ে গেছে। শপিংয়ে করার পর দেখা গেল মানিব্যাগ পকেটে নেই। তারপর লোকটা নেক্সাস পে দিয়ে বিল পরিশোধ করলো এবং বলল, ভাগ্যিস নেক্সাস পে ছিল!

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আমার মাত্র কিছু অল্প কিছু টাকা আছে। হয়তো ২০ হাজার বা ৫০ হাজার। এত কম টাকা বিকাশ বা ডাচ বাংলা মেরে নিয়ে চলে যাবে না। সেক্ষেত্রে আপনাকে এটা মনে রাখতে হবে যে, শুধু আপনার নয়, সারা বাংলাদেশ জুড়ে দেখা যাবে যে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা এরকম ডিজিটাল কারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এখন এই অবস্থায় যদি একটা সংস্থার পতন ঘটে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কী অবস্থা হবে?

ভারতের আলোচিত ঘটনার প্রেক্ষীতে বলতে চিন্তা করুন, ইন্ডিয়ার ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিলের পর মোদি সরকার ঘোষণা করেছিল যে, আপনারা এটা পেটিএম থেকে নিয়ে নেবেন। অর্থাৎ পেটিএম থেকে এটা খরচ করতে পারবেন। পুরনো টাকাগুলো বা বাতিল টাকাগুলো ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর নতুন টাকা দেওয়া হবে, সেগুলো পেটিএম-এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। বস্তুত এ ঘটনার মাধ্যমে ডিজিটাল কারেন্সির সাথে সর্বসাধারণের পরিচয় করানোই উদ্দেশ্য ছিল। আর এখান থেকেই ধারণা করা হয় যে, মোদি ইলুমিনাতির সদস্য। তবে মোদির সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন দেখার বিষয় হলো, ইলুমিনাতি ভারত উপমহাদেশে আবার কেমন নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়। সে পর্যন্ত আমাদের সতর্কতার সাথে অপেক্ষা করতে হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা প্রতারিত হবো না, প্রতারণার ফাঁদে পা দেবো না এবং নিজেও কাউকে প্রতারণা করবো না—এমন প্রতিজ্ঞা করতে হবে। মুমিন হিসেবে আমাদেরকে ডিজিটাল কারেন্সির ব্যাপারটি সজাগ থাকতে হবে।[৭০]

---

৭০ *ইতিবৃত্ত*, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭; *ফুলপিন্ট*, ১৯ জুন, ২০১৭; মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়া'।

[১৪]

পরিবারতন্ত্র; বিশ্ব অর্থনীতির অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অর্থই হলো, বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ। ক্ষমতা ও অর্থ বর্তমান বিশ্বে প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালের পৃথিবীর অর্থনীতি যাদের হাতে, তারাই পৃথিবীর রাজনীতি, সংঘটিত যুদ্ধ, গণআন্দোলন ও জনবিপ্লবের নিয়ন্তা। দৃশ্যায়নের আড়ালের জগতের অলি-গলি চষে এমন কিছু পরিবারের খোঁজ মিলেছে, যাদের হাতে রয়েছে সীমাহীন ক্ষমতা ও অঢেল বিত্ত-বৈভব।

অধুনা সময়ের সবচে আলোচিত ও উচ্চারিত শব্দ, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার তথা নতুন বিশ্বব্যাবস্থা। ১৯৯১ সালে সিনিয়র বুশ আমেরিকার পার্লামেন্টে ভাষণ দিয়ে এই নতুন কালের সূচনা করেন। এরপর থেকে শুরু হয় বিশ্বায়নের নতুন যুগ। এই বিশ্বায়ন সাম্রাজ্যবাদীদের এনে দিয়েছে অবিশ্বাস্য সফলতা। তারা খুজে পেয়েছে সাম্রাজ্যবাদের নতুন স্ট্রেটেজি। দুঃখজনক হলো, আমরা সামরিক আগ্রাসনকে ভয় পাই; কিন্তু ভয় পাইনা বিশ্বায়নকে। কারণ, হালের পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার শেষ নেই। তাহলে চলুন, আড়ালের পৃথিবী থেকে একটু ঘুরে আসা যাক!

১. রথচাইল্ড ফ্যামিলি

চোখের অন্তরালে প্রকৃত ক্ষমতাশীলদের আলোচনা করতে গেলে উঠে আসে নির্দিষ্ট কিছু পরিবারের নাম। প্রভাবশালী সেসব ফ্যামিলির প্রথমেই যার অবস্থান, সেটাই হলো রথচাইল্ড ফ্যামিলির। অর্থনীতির পেছনে অদৃশ্য কলকাঠি নাড়া এই পরিবার যুগপরম্পরায় গড়ে তুলেছে সম্পদের পাহাড়। জার্মানি থেকে তাদের পথ চলা শুরু হলেও, আস্তে আস্তে পুরো ইউরোপ, এমনকি আমেরিকাতেও সম্পদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

আগাগোড়া ইহুদি এই পরিবারের রয়েছে চারশো বছরের ইতিহাস। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা আমশেল মুসার জন্ম হয় ১৭৪৩ সালে জার্মানির

ফ্রাঙ্কফোর্টে। আমশেল ছিলেন মুদ্রাব্যাবসায়ী। ফ্রাঙ্কফোর্টে তার একটি মুদ্রার দোকান ছিল। দোকানের প্রতীকী হিসেবে তিনি ব্যবহার করতেন একটি লাল ঢাল। লাল ঢালকে জার্মান ভাষায় বলা হয় রথচাইল্ড। সেই থেকে এই পরিবারকে রথচাইল্ড বলেই ডাকা হয়। পরবর্তী সময়ে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে তিনি জার্মানির অর্থনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেন। আমশেলের ঘরে জন্ম হয় তার পাঁচ ছেলের—

✓ ১. আমশেল ভন রথচাইল্ড (১৭৭৩-১৮৫৫);
✓ ২. সুলাইমান ভন রথচাইল্ড (১৭৭৪-১৮৫৫);
✓ ৩. নাথান রথচাইল্ড (১৭৭৭-১৮৩৫);
✓ ৪. কার্ল ভন রথচাইল্ড ১৭৮৮-১৮৫৫;
✓ ৫. জেমস ভন রথচাইল্ড ১৭৯২-১৭৬৮।

ঐতিহাসিকগণ লেখেন, আমশেলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে,তিনি ছেলেদের ডেকে প্রথমে তালমুদের বাণী শোনান। এরপর একটি অসিয়ত করেন। অসিয়তটি ছিল—

> শোনো, সমস্ত পৃথিবীর দখল আমাদের ইহুদিদের হাতে আসা উচিত। অ-ইহুদিরা তো কীট-পতঙ্গের মতো প্রভাবহীন জীব। তাদের কোনো কিছুরই মালিক হওয়ার সুযোগ নেই। এই পরিবারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার গল্প এখান থেকেই শুরু।

সম্পদ-লুটের ষড়যন্ত্র

ইউরোপসহ সারা বিশ্বের সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য দীর্ঘ ছক আঁকেন আমশেল। মৃত্যুর আগে সেই পরিকল্পিত ছক তিনি তার ছেলে-মেয়েদের শিখিয়ে দিয়ে যান। আমশেলের সেই ছকটি কী ছিল? হ্যাঁ, ছকটি ছিল ব্যাংক প্রতিষ্ঠা। সুদি লেনদেন চালু করার মাধ্যমে জনমানুষের সহায় সম্পদ লুট করা। ইউরোপের পাঁচটি দেশে তিনি তার পাঁচ ছেলেকে ছড়িয়ে দেন। জার্মানিতে এন্সলেমকে, অস্ট্রিয়ায় সোলাইমানকে, ব্রিটিনে নাথানকে, ইটালিতে কার্লকে, ফ্রান্সে জেমসকে চলে যেতে বলেন। পরবর্তী সময়ে আমেরিকাকে টার্গেট করে তাদের উত্তরপুরুষ শোনবার্গ।

পিতার আদেশে ছড়িয়ে পড়ে ছেলেরা। নিজেদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রেখে অর্থ হাসিলে মনোযোগ দেয়। প্রত্যেকেই নিজ দেশে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। সেই কাল থেকে এই কাল, দীর্ঘ এই সময়ের ব্যাংকের ইতিহাসের অবধারিত অংশ হিসেবে জড়িয়ে আছে এই রথচাইল্ড পরিবারের নাম। দুটি উক্তি শুনলে এই পরিবারের শক্তির মাত্রা আঁচ করতে আমাদের সুবিধা হবে :

- আমাকে সুযোগ দাও জাতির অর্থে দখল বসাতে। এরপর আমার পরোয়া থাকবে না কে নীতি নির্ধারণ করে।

  —আমশেল মুসা রথচাইল্ড।

- আমার এ-নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই যে, কোন পুতুলকে ইংল্যান্ডের রাজ সিংহাসনে বসানো হলো। যে ব্রিটেনে সাম্রাজ্য পরিচালনা করবে, যার সূর্য কখনো অস্তমিত হবে না। আসলে সম্পদের উৎস যার হাতে, সে-ই মূলত ব্রিটেন সাম্রাজ্য পরিচালনা করে। আর ব্রিটেনের সম্পদের উৎস আমার হাতে।

  — নাথান রথচাইল্ড।

২. রকফেলার ফ্যামিলি

রকফেলার ফ্যামিলি বর্তমানে আমেরিকার তেলবাণিজ্যে একচ্ছত্র আধিপত্ব বিস্তার করে রেখেছে। তেলবাণিজ্যের আধিপত্ব তাদের সুযোগ করে দিয়েছে আমেরিকার রাজনীতিতে নাক গলানোর। অর্থই যখন পুজিবাদী পৃথিবীর প্রধান চালিকা শক্তি তাই রকফেলার ফ্যামিলির সুমতি ছাড়া আমেরিকার কোনো প্রেসিডেন্ট-ই হোয়াইট হাউজে বসতে পারে না। লিঙ্কন, গারফিল্ড, উইলিয়াম কেনেডিরা তাদের বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাদের এই চাওয়ার পরিণাম ভালো হয় নি। হত্যা করে তাদের এই চিন্তার আপদ দূর করা হয়েছে। যুগে যুগে হত্যা, গুম, গণআন্দোলনের মাধ্যমে এই ম্যাসনরা নিজেদের সাম্রাজ্য টিকিয়ে রেখেছে।

রকফেলার ফ্যামিলির গল্পটা শুরু হয় ১৮৬৩ সালে৷ এই ফ্যামিলির প্রতিষ্ঠাতা জন ডি রকফেলারের জন্ম হয় ১৮৩৯ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে৷ শুরুতে কৃষি সামগ্রীর ছোট ব্যাবসায়ী ছিলেন৷ কিছুদিনের ব্যবধানে তিনি নিজের ভাগ্য বদলে ফেলেন। তেলের শোধনাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তেলবাণিজ্যে প্রবেশ করেন জন রকফেলার৷ রকফেলার তার এক সঙ্গীকে নিয়ে ১৮৬৩ সালে এই শোধনাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন৷ শুরুতে আমেরিকার শিল্প কারখানাগুলোতে তারা তেল রপ্তানি করতে থাকেন৷ ১৮৬৫ সালে সঙ্গীর শেয়ার কিনে নিলে কোম্পানিটি তার একক মালিকানায় এসে যায়৷

১৮৬৬ সালে জন ডি রকফেলার এবং তার ভাই উইলিয়াম রকফেলার আরেকটি তেলের শোধনাগার প্রতিষ্ঠা করেন৷ তবে তিনি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেন ১৮৭০ সালে৷ এই বছরই তৎকালীন সময়ের সর্ববৃহৎ তেল কেম্পানি 'স্ট্যান্ডার্ড ওয়েল' প্রতিষ্ঠা করেন৷ রকফেলার তিলে তিলে এই কোম্পানিকে প্রধান তেল কোম্পানি হিসেবে গড়ে তোলেন। একসময় দেখা যায়, আমেরিকার ৯০% তেলই এই কোম্পানির স্টকে৷ জন ডি রকফেলার নির্মিত অন্যতম কিছু প্রতিষ্ঠান হলো—

✓ ১. শিকাগো ইউনিভার্সিটি৷ প্রতিষ্ঠা সাল ১৮৭১;
✓ ২. রকফেলার ইউনিভার্সিটি৷ প্রতিষ্ঠা সাল ১৯০১;
✓ ৩. রকফেলার কর্পোরেশন৷ প্রতিষ্ঠা সাল ১৯১৩৷

পরবর্তী সময়ে এই পরিবারের নাম উজ্জ্বল রেখেছে তার অধস্তন সদস্যরা৷ তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ডেবিড রকফেলার ১৯১৫-২০১৭৷ পিতার ওয়েল কোম্পানিতে তিনি বৈশ্বিক মাত্রা যোগ করেছন৷ একজন সফল ব্যাবসায়ী ছাড়াও আমেরিকার যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি ছিলেন—

⊙ কাউন্সিল অফ ফরেইন রিলিশন-এর চেয়ারম্যান (১৯৭০-১৯৮৫)
⊙ চেস মেনহাটন ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান (১৯৬৭-১৯৮১)

তিনি এতটাই ধনী ছিলেন যে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য ২০০৭ সালে তিনি একাই একশো মিলিয়ন ডলার দান করেন৷

আমেরিকাতে রকফেলার পরিবারের গড়ে তোলা আরও কিছু প্রতিষ্ঠান হলো—

এক. ট্রাইলাটরেল কমিশন। প্রতিষ্ঠাতা ডেবিড রকফেলার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৭৩।

দুই. রকফেলার সেন্টার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৩৯।

তিন. রকফেলার ফাউন্ডেশন। প্রতিষ্ঠাতা জন ডি রকফেলার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯১৩।

চার. রকফেলার ব্রাদাস ফান্ড। প্রতিষ্ঠাতা ডেবিড রকফেলার, নিলসন রকফেলার, ওয়িনথ্রোপ রকফেলার, জন রকফেলার, লরেন্স রকফেলার।

পাঁচ. রকফেলার আরকাইভ সেন্টার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৭৪।

ছয়. ইন্টারন্যাশনাল হাউজ নিউ ইয়র্ক। প্রতিষ্ঠাতা জন ডি রকফেলার।

সাত. মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্ট। প্রতিষ্ঠাতা এলড্রিচ রকফেলার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯২৯।

আট. এশিয়া সোসাইটি। প্রতিষ্ঠাতা জন ডি রকফেলার।

নয়. ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৬৮-১৯৮৪। এই প্রকল্পের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ডেভিড রকফেলার।

দশ. কাউন্সিল অফ আমেরিকাস। প্রতিষ্ঠাতা ডেভিড রকফেলার। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৬৩।

৩. এস্টোর ফ্যামিলি

এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জন জ্যাকব এস্টোর (১৭৬৩-১৮৮৪)। আমেরিকার ব্যাবসা, রাজনীতি এবং সমাজে উজ্জ্বল হয়ে থাকা পরিবারগুলোর একটি এস্টোর ফ্যামিলি। জনের জন্ম জার্মানির ওয়ালড্রোফে, ১৭৬৩ সালে। ১৭৮৪ সালে কিছুকাল লন্ডনে থাকার পর আমেরিকায় পাড়ি জমান তিনি। ১৮১৭ সালে আমেরিকায় পশমের ব্যাবসা শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে আমেরিকার সরকারি ব্যাংকের অন্যতম সদস্য হয়ে ওঠেন তিনি।

এই পরিবারের নাম গৌরবান্বিত করেছেন ভিনসেন্ট এস্টোর (১৮৯১-১৯৫৯)। তিনি আমেরিকার যেসব প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন—

১. আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানি। প্রতিষ্ঠা সাল ১৮৫০।

২. মেনহাটন চেস ব্যাংক। প্রতিষ্ঠাতা সাল ১৮৫০।

৩. সিটি এন্ড সাবারবেইন কোম্পানি। প্রতিষ্ঠা সন ১৯১৩।
৪. পার্ক ন্যাশনাল ব্যাংক। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯০৮।
৫. এটলান্টিক ফ্রুট কোম্পানি। প্রতিষ্ঠা সাল ১৯০৫।
৬. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কোম্পানি। প্রতিষ্ঠা সাল ১৮৫১।

৪. ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানি

নামটি শোনার পর নিশ্চই আমেরিকান ফাস্টফুড কোম্পানি ম্যাকডেনাল্ড কর্পোরেশনের কথা মনে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, এই কোম্পানির মালিকদের কথাই বলছি। ম্যাকডোনাল্ড ফ্যামিলির গল্পটা শুরু হয় স্কটল্যান্ডে বসবাসরত ক্যাপ্টেন ম্যাকডোনাল্ড থেকে। ১৮১২ সালে তিনি পাড়ি জমান আমেরিকায়। আমেরিকাতেই তার সন্তানেরা বড় হয়; রোবাট ম্যাকডোনাল্ড, এলেকজেন্ডার ম্যাকডোনাল্ড, ভার্জিনিয়া ম্যাকডোনাল্ড।

১৯৪০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান বার্নারদিনহোতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফাস্টফুড কোম্পানি 'ম্যাকডোনাল্ডস' প্রতিষ্ঠা করেন মেরিস ম্যাকডোনাল্ড এবং রিচার্ড ম্যাকডোনাল্ড। ফাস্টফুডের বৈশ্বিক বাজারে দাপটের সঙ্গে এখনো টিকে আছে কোম্পানিটি।

৫. ডুপন্টস ফ্যামিলি

১৭৩৭ সালে ডুপন্টস ফ্যামিলির শুরুটা হয় ফ্রান্সের স্যার ডুপন্টস এর মাধ্যমে। ১৭৯২ সালে তার ছেলেরা পাড়ি জমায় আমেরিকায়। আমেরিকার নাগরিকত্ব হাসিল হলে সেখানেই তার অধস্তনরা থেকে যায়। আমেরিকার বেশ কিছু ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই পরিবারের সদস্যরা। তাদের আমেরিকার রাজনীতিতেও বিশেষ দখল ছিল। এই পরিবারের যেসব সদস্য আমেরিকার সিনেট ছিলেন—

১. কোলমেন ডুপন্টস
২. রিচার্ড ডুপন্টস
৩. নোডেন ডুপন্টস
৪. জোন ওয়িলস ডুপন্টস

৫. জোন থাউনসেন্ড ডুপন্টস
৬. জোন ওয়িলস ডুপন্টস
৭. ওইলিয়াম ডুপন্টস

প্রতাপশালী ফ্যামিলির নাম নিলে আরও যেসব নাম উঠে আসে—

১. বান্ডি ফ্যামিলি
২. কলিন্স ফ্যামিলি
৩. ফ্রিমেন ফ্যামিলি
৪. কেনেডি ফ্যামিলি
৫. লি ফ্যামিলি
৬. ওনাসেস ফ্যামিলি
৭. রাসেল ফ্যামিলি
৮. ডিসনে ফ্যামিলি
৯. ভেন ডানি ফ্যামিলি
১০. রেনোল্ডস ফ্যামিলি
১১. মেরোভিনজিয়ান ফ্যামিলি
১২. ক্রাপ ফ্যামিলি

[১৫]
পেট্রোডলার : শোষণের হাতিয়ার

তেলের বিপরীতে পরিশোধিত ডলারই হচ্ছে পেট্রোডলার। অর্থাৎ, আপনি যদি পেট্রোলিয়াম জাতীয় তেল কিনতে চান আপনাকে তা ডলার দিয়েই কিনতে হবে; কিন্তু সরল প্রশ্ন হলো, এতে সমস্যা কী?

সমস্যা হলো, সবক্ষেত্রে আপনাকে তাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে—যারা ডলার বানায়। ধরেন, আপনি সৌদিতে গিয়ে বললেন যে, আমি তেল কিনবো আপনাদের কাছ থেকে। তারা বলবে ইউএস ডলার দাও, তেল নাও। আপনি বললেন, নাহ! আমার কাছে ইউএস ডলার নেই। আর ইউএস ডলার আনতে গেলে আমরিকা তাদের বিভিন্ন অনাচার চাপিয়ে দেবে, তাই অন্য কোনো সম্পদের বিনিময়ে তেল চাচ্ছি। তারা বলবে, নাহ! হবে না। আমরা পেট্রোডলার চুক্তি করেছি, আমরা এ চুক্তি ভাঙতে পারবো না।

১৯৭১ সালে আমরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ঘোষণা দেয়, গোল্ড নয়; ইউএস ডলারই হবে মূল রিজার্ভ বা স্ট্যান্ডার্ড মানি! যা নিক্সন শক্ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের ভয়ে মিত্রশক্তি তাদের রিজার্ভ গোল্ডগুলো আমরিকায় পাঠানো শুরু করে। অথচ পরে পরবর্তী সময়ে আমরিকা প্রতারণা করে বলে, গোল্ড আমাদের কাছেই থাকুক, আর তোমরা ডলার নাও। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২৫% গোল্ড আমরিকা দখল করে বসে আছে। তারা বলছে, ডলারকে তোমরা রিজার্ভ হিসেবে ইউজ করো, এবং ডলারের এগেইন্সেটে তোমাদের কারেন্সি ছাপাও। কেন ইউএস ডলার? কেন গোল্ড নয়? যদি ইউএসের পতন হয়, তাহলে এই রিসার্ভ ডলারের কোনো মূল্য নেই। কারণ, এগুলো ফিয়াট মানি। এগুলো শূন্যের বিপরীতে বানানো, আইমিন, জাস্ট ছাপানো কাগজ। আর এখন এর মূল্য ইউএসের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এভাবে ইউএস পুরো বিশ্বকে তাদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে শোষণ করছে, আর তাদের দাসত্ব বরণ করতে বাধ্য করছে।

কিন্তু জাস্ট ঘোষণা করেই কি ডলার ওয়ার্ড রিজার্ভ কারেন্সি হয়ে গেছে? কারণ, ডলার যদি কোনো কিছুর এগেইন্সেটে না বানানো হয়, তবে ইউএস যতখুশি তত ডলার ছাপাবে, যাকে তাকে যখন খুশি কিনবে, কিন্তু একটা সময় এত এত ডলার

থাকায় মুদ্রাস্ফীতি হয়ে ডলারের মান আর থাকবে না। তাই এর জন্য ইউএসের দরকার এমন কিছু—যা গোল্ডের চেয়েও মূল্যবান, এবং যার বিশ্বজুড়ে অনেক চাহিদাও আছে। গোল্ড তাদের পরিবর্তন করতেই হতো; কারণ, তারা এত এত ব্যাবসায়িক ডিল করেছিল যে, সেগুলোর শোধ করার মতো ডলার, আরও ভালো করে বললে গোল্ড তাদের কাছে ছিল না। অথচ ঠিকই তারা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন, জিলিয়ন জিলিয়ন ডলারের ডিল করছে, খরচ করছে। আদৌ কি তাদের থেকে গোল্ড অথবা অন্য কোনো সম্পদ কমছে? কেবল ছাপানো ডলার কমছে! তারা সেটাই তো চায় যে তাদের ডলারই হোক একমাত্র ওয়ার্ল্ড কারেন্সি, কোনো বাধা ছাড়াই।

সে লক্ষ্যে ১৯৭৪ সাথে তারা গেল সৌদি আরবে। বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১০% তেল সৌদি বিক্রি করে। তাদের প্রস্তাব দিল যে, আমেরিকা তোমাদের সবরকম সামরিক এবং রাজনৈতিক সমর্থন, অস্ত্র এবং টেকনোলজি সাপ্লাই দেবে। এর বিপরীতে তোমরা তেল শুধুমাত্র ডলারে বিক্রি করবে। মাথামোটা সৌদিরা রাজী হয়ে গেল। কারণ, সৌদি এমন শক্তিশালী সেনাবাহিনী বানাতে ভয় পায়, যারা কিনা তাদের সিংহাসনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। স্বাভাবিকভাবেই একজন যোগ্য সেনাপ্রধান যখন দেখবে যে, পেট আর মাথা মোটারা সিংহাসনে বসে আছে, সে লাথি মেরে আগে তাদের সরাবে। সৌদি রাজবংশ এজন্য শক্তিশালী সেনাবাহিনী বানাবে না। তাদের দরকার তাদেরই মতো পেট আর মাথামোটা সেনাবাহিনী। এজন্য নিজ দেশে তারা আমরিকান বেইস বানাতে দিয়েছে। খেয়ে-দেয়ে ফূর্তি করে রাজতন্ত্র, আর ব্যাবসাপাতি ধরে রাখতে পারলেই তারা খুশি।

তারপর থেকে সৌদিরা তেল ডলারে বিক্রি করা শুরু করল। তেল বিক্রি করে আয় করা ডলারগুলো নিয়ে তারা আবার আমরিকাকেই দিল। বিপরীতে আমরিকা তাদের বন্ড ধরিয়ে দিল যে, নো প্রবলেম যখন দরকার বন্ড ভাঙিয়ে খরচ করো। কারণ, যত ডলার আমরিকা ছাপাচ্ছে, তত ডলারের সম্পদ কিন্তু আমরিকার কাছে নেই। তাই অতিরিক্ত ডলার না ছাপানোর জন্য, যখনই কোনো দেশ ডলার জমায়, তখনই তাদের বন্ড ধরিয়ে দিয়ে সেই ডলার আবার অন্য কাজে লাগায়। আবার নিজেদের কাছেও অনেক ডলার রাখে না, নতুবা আমরিকার মধ্যে ডলারের মান কমবে। তাই তারা চায় ডলার পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে থাকুক। কোথাও জমে গেলে সেটার বিপরীতে বন্ড দিয়ে সেই ডলারগুলো নিয়ে আরেক জায়গায় ব্যবহার করা হয়, যেন ডলারের ব্যাবসা জারি রাখা যায়, এবং মানুষকে মুখাপেক্ষী থাকতে বাধ্য করা যায়। বন্ড বলতে ধরেন ব্যাংকের প্রাইজ বন্ড। আপনারা তা কিনতে পারবেন, আবার ব্যাংকের কাছে একই মূল্যে ভাঙাতে পারবেন। তেমনি অনেক ইউএস ডলার আপনি নিজের কাছে জমিয়ে কী করবেন? আমরিকা বলে, আমাদের কাছেই রিজার্ভ রাখুন,

ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে রাখুন, পরে ইন্টারেস্টসহ পাবেন। আর কত রেখেছেন সেটার দলিল হিসেবে বন্ড রাখুন। এই বন্ডকে তারা বলে ট্রেসারি বন্ড। এভাবে বার বার আর অপ্রয়োজনে ডলার না ছাপিয়েই আমরিকা তাদের কাজ চালাচ্ছে। পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতিও এড়িয়ে চলছে।

তাহলে তেলের দাম আসলে কারা ভোগ করছে? আমরিকা না সৌদি? ভেবে দেখেন, তেল আসলে বিক্রি করছে কিন্তু আমরিকা। সৌদি কেবল আমরিকার একটি প্রদেশ হিসেবে কাজ করছে। শুধু সৌদিই না, কাতার, কুয়েত, আমিরাতও মূলত ইউএসের অংশ হিসেবে কাজ করছে, এবং তাদের অর্থনীতি মূলত ইউএসের অর্থনীতির অংশ। এসব দেশের রাজা বা সরকারপ্রধানরা এর বিপরীতে রাজনৈতিক এবং সামরিক সাপোর্ট পাচ্ছে। আমরিকাকে নিজেদের দেশে সেনাঘাঁটি দিয়েছে। সাদ্দাম, গাদ্দাফি আমেরিকাকে সরানোর চেষ্টা করেছিল, তারা নিজেরাই সরে গেছে। সম্ভবত বাদশাহ ফয়সালের ক্ষেত্রেও একই কারণ ছিল। আর আমরিকা তাদের ঘাড়ে চড়ে অর্থনীতিতে মনোপলি সৃষ্টি করে নিজেদের মনগড়া বিধান মানুষের ওপর চাপাচ্ছে। ফেরাউনের মতো নিজেকে আল্লাহর সাথে শরিক করছে, আল্লাহর বিধান রিপ্লেস করার মতো স্পর্ধা দেখাচ্ছে। আর এতসব কিছু করছে কেবল পেট্রো ডলারের বদৌলতে।

সৌদির সাথে এই চুক্তি টিকে থাকলে, আমরিকার যে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন খরচ, সেগুলোর ভার আমাদের বহন করতে হবে। কারণ, গোল্ড আমরিকার দখলে, তেল আমরিকার দখলে। তারা কেবল ডলার আর বন্ডের লুপিং চালিয়ে যুদ্ধ করছে। নিজেদের বাজার চালু রাখছে। অথচ তাদের এত সম্পদ নেই যত সম্পদ তারা অলরেডি খরচ করে ফেলেছে। আর কত ডলারের ডিল বাকি আছে সেগুলো হিসাব নাইবা করলাম। এই সব ঋণ আমার আপনার শোধ করতে হবে! কীভাবে? এই যে আমাদের টাকা, যা ডলারের বিপরীতে ছাপা হচ্ছে, সেই ডলারের মান কমলে আমাদের কষ্টে উপার্জিত টাকার মানও কমে যাবে। এই যতটুকু মান কমল সেটা মূলত আমরিকার খরচের হিসাব ঠিক রাখতে কাটা গেছে। আর যতদিন পেট্রো ডলার চুক্তি থাকবে, তেলের বিনিময়ে ডলার তার প্রভুত্ব এভাবেই চালিয়ে যাবে।[৭১]

৭১ তথ্যসূত্র : ইত্তেফাক, ২৬ নভেম্বর ২০১৪; টাকার গন্ধ, ড. মাহমুদ আহমাদ

[১৬]
ইলুমিনাতির খাদ্য নিয়ন্ত্রণ

মানুষের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম মাধ্যম হলো তার খাদ্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। বর্তমানে ইলুমিনাতি এ-বিষয়ে বেশ এগিয়ে গেছে। তারা ইতোমধ্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অরগানাইজেশন এবং ওয়ার্ল্ড ফুড অরগানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করেছে মানুষের খাদ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের হাইব্রিড ফসল তারা তাদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা বাজারে আনছে। যার ভালো দিক হলো, এটার মাধ্যমে অল্প খরচে অল্প সময়ে সহজে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায়; কিন্তু খারাপ দিকে হলো; এটা এক বছরে মাত্র একবার ফলন হয়। দ্বিতীয় বছরে আর এরকম ফলন হবে না। সেক্ষেত্রে ইলুমিনাতির পরিকল্পনা হলো, মানুষ খাদ্যের ব্যপারে পরিপূর্ণ ইলুমিনাতির ওপর নির্ভরশীল হোক। তারা যেন এক বছর উৎপাদন করে সেই উৎপাদিত পণ্য সারা বছর খাওয়ার পর আর দ্বিতীয়বার উৎপাদনের মতো কিছু না থাকে এবং পরের বছর উৎপাদনের জন্য যেন আবারও বহির্বিশ্বের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ায়। এক্ষেত্রে ইলুমিনাতির শর্ত হলো, তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত ধান বা বীজ দিয়েই চাষাবাদ করতে হবে।

বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাষাবাদযোগ্য ভূমি রয়েছে তার তুলনায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানে অনেক বেশি। এই পরিমাণ জমিতে বাংলাদেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ করা যাবে না। ফলে আমরা ইতোমধ্যেই বিদেশি সংস্থার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বাংলাদেশের হাতে এমন প্রযুক্তি নেই যে, নিজেরা নিজেদের ল্যাবরেটরিতে ধান প্রস্তুত করে সেই হাইব্রিড ধান দিয়ে ফসল ফলাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ বিদেশি-শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এখন যদি বাংলাদেশ তাদের কোনো চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বা তাদের বেঁধে দেওয়া অন্যায্য কোনো সীমারেখা অতিক্রম করে যেতে চায়, সেক্ষেত্রে তারা এই প্রযুক্তি সুবিধা বা হাইব্রিড ফসল দেওয়া বন্ধ করবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ দুর্ভিক্ষে পতিত হবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যাবে।

তাছাড়া আরও ভয়ংকর বিষয় হলো; হাইব্রিড বীজের ভিতর অনেক পার্টিক্যাল[৭২] মিশিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে আমাদের মধ্যে জিনগত পরিবর্তন আসছে। বর্তমানে দেখা যায়, মিসক্যারেজ[৭৩] এর সংখ্যা বেড়ে গেছে অনেক। এর পেছনের কারণ হলো—খাদ্যাভাসে এমন কিছু পরিবর্তন আনছে ইলুমিনাতি যেগুলো আমাদের দেহের সাথে সাংঘর্ষিক। এসব ক্ষতিকর পার্টিকেল আমাদের দেহে অ্যান্টিবডিকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিভিন্ন রকমের ক্যান্সার কোষ দানা বাঁধছে শরীরে। এর ফলে আমরা দিন দিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ছি। ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে আমাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য যেতে হচ্ছে। তাছাড়া এমন কিছু রোগ তৈরি হচ্ছে যেগুলো অতীতে কখনো দেখা যায় নি।

শুধু খাদ্যপথে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ নয়। ইলুমিনাতি অন্যভাবেও আমাদের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। বর্তমানে এন্টার্কটিকা মহাদেশ বা বরফাচ্ছাদিত যে এলাকাগুলো রয়েছে এখানে বিমান দিয়ে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ছিটানো হয়। আপনারা জেনে অবাক হবেন, এই কার্বন স্প্রে করার ফলে সূর্যরশ্মি কার্বনের ভেতর দিয়ে নিচের দিকে ঢুকতে পারে কিন্তু বেরোতে পারে না। যার ফলে বরফ গলে যায় এবং সমুদ্রের লেভেল উঁচু হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত এটার কারণে গ্লোবাল ওয়ার্মিং[৭৪] সৃষ্টি হয়। কার্বন ভেদ করে তাপ বেরিয়ে যেতে না পারার কারণে উষ্ণ আবওহাওয়ার দেশগুলো রয়েছে, সেগুলোর আবহাওয়াও চরম বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক কার্বন

---

৭২ পার্টিক্যাল ফিজিক্স বা কণা পদার্থবিদ্যা, হলো এক ধরনের যৌগিক কণা বা কম্পোজিট পার্টিকেল যা কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত। তড়িৎচুম্বকীয় শক্তির সাহায্যে যেভাবে অণু ও পরমাণুসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে, তেমনি কোয়ার্কও পরস্পরের সাথে দৃঢ় শক্তির সাহায্যে সংঘবদ্ধ থাকে।

৭৩ ডিম্বানু নিষিক্ত হওয়ার পর পরবর্তী পাঁচ মাসের (২০ সপ্তাহ) মধ্যে যে কোনো সময়ে প্রসাবের রাস্তা দিয়ে মৃত সন্তান প্রসব করাকে মিসক্যারেজ, গর্ভপাত বা Abortion বলে।

৭৪ ভূমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বা বিশ্ব উষ্ণায়ন (ইংরেজি: Global Warming) হলো জলবায়ু পরিবর্তনের একটি বিশেষ ঘটনা। সাধারণত সময় বা কারণ নিরপেক্ষ হলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ বলতে মূলত ইদানিং কালের উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই নির্দেশ করা হয় এবং এটি মানুষের কার্যক্রমের প্রভাবে ঘটে থাকে। UNFCCC নামক সংগঠন বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে মানুষের কারণে সৃষ্ট, আর জলবায়ুর বিভিন্নতাকে অন্য কারণে সৃষ্ট জলবায়ুর পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করে। কিছু কিছু সংগঠন মানুষের কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনসমূহকে মনুষ্যসৃষ্ট (anthropogenic) জলবায়ুর পরিবর্তন বলে।

চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কল কারখানাগুলো থেকে নিঃসারিত হয় এবং এই কার্বন বায়ুমন্ডলে আটকা পড়ার ফলে ক্রমেই সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ছে। ফলে ঝড়, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। এগুলো প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের কৃষি এবং খাদ্য উৎপাদনের ওপর নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। ফলে আমরা ক্রমেই বিদেশের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। তাছাড়া হাইব্রিড বীজ উৎপাদনের সময় জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর[৭৫] মাধ্যমে এর ভেতর এমন কিছু বিন্যাস তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে—যা আমাদের দেহের কোষগুলোকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে এবং নতুন নতুন রোগ আমাদের শরীরে দানা বাঁধছে যা পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। পৃথিবীতে যে পরিমাণ আবাদযোগ্য ভূমি আছে তার সামান্যই মুসলিম দেশগুলোর হাতে রয়েছে। বাকি আবাদযোগ্য ভূমির অধিকাংশই রয়েছে রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত এবং চীনের হাতে। এগুলো থেকে প্রচুর পরিমাণ ফসল প্রত্যেক বছর উৎপন্ন হয় এবং লাখ লাখ টন ধান-গম সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। শুধু খাদ্যের বাজারে সমতা রাখার জন্য। ভবিষ্যতে যখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো খাদ্য উন্নয়নে ব্যর্থ হবে তখন তাদের ইলুমিনাতির দালাল আমেরিকার সাথে চুক্তিতে যেতে হবে। আত্মসম্মান বিলিয়ে দিয়ে খাদ্য ভিক্ষা চাইতে হবে। চুক্তি করতে হবে এবং চুক্তির বিনিময়ে তারা এই খাদ্য দিয়ে তৃতীয় বিশ্বের খাদ্য সমতা রক্ষা করবে। এতে করে তাদের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে আমাদেরকে স্বীকার[৭৬] করে নিতে হবে ইলুমিনাতির দাসত্ব।

বর্তমান বাজারে দেখে থাকবেন, শিশুখাদ্যের সিংহভাগ বাজারজাত করে ইসরাইলি কোম্পানি নেসলে। ইহুদি কোম্পানিগুলো প্রত্যেক খাবারে স্পারটন নামক একধরনের পার্টিক্যাল মিশিয়ে দেয়, যা স্বাভাবিকভাবে আমাদের শিশুর সুরক্ষার বদলে ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাছাড়া জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর

---

৭৫ ভিন্ন প্রকৃতির একাধিক DNA অণু পরস্পর সংযুক্ত করে জৈব পদ্ধতিতে কোনো জীবকোষে বা জীবদেহে প্রবেশ করানোর কৌশলকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। প্রাকৃতিকভাবেও এই প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হতে পারে। তবে দ্রুত ও অতিরিক্ত ফলাফল লাভের জন্য কৃত্রিমভাবে এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। উচ্চতর জীবের ক্ষেত্রে এই কৌশল ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে, এমন কোনো বৈশিষ্ট্য ধারক জিন প্রবেশ করানো, যা আগে উক্ত জীবের দেহে ছিল না। একে অনেক সময় (Genetic modification)-ও বলা হয়।

৭৬ বিডিনিউজ ডটকম, ৬ মে, ২০১২; কিউ আর ইসলামের কলাম অবলম্বনে

মাধ্যমে আমাদের খাদ্যে এমন কিছু জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেগুলো মুসলিম মায়েদের দুধ কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বাচ্চা বুকের দুধ খেতে পারছে না। বাধ্য হয়ে এ সমস্ত নেসলের পণ্য কিনে খাওয়াতে হচ্ছে। এতে করে শিশুর মধ্যে হিংস্রতার জন্ম হচ্ছে, হ্রাস পাচ্ছে মানবিক কোমলতা। আমদের উচিত, শিশুদেরকে যথাসম্ভব বিদেশি খাদ্য বর্জন করে মায়ের দুধ খাওয়ানো।

ইলুমিনাতি আমাদের ঈমান ধ্বংসের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের হারাম খাদ্য বাজারজাত করে থাকে। তারা জানে, যতদিন মুসলিমরা হালাল খাদ্য খাবে ততদিন তাদেরকে বিপথে নেওয়া সম্ভব হবে না। এ-জন্য প্রথমত তারা আমাদের দেহকোষে হারাম জিনিস ঢুকিয়ে দিতে আমাদের নৈতিক শক্তি কমিয়ে ফেলতে চাইছে। কোকাকোলা, পেপসিসহ সফট ড্রিংকসের নামে অ্যালকোহল জাতীয় হারাম জিনিস আমাদের খাওয়ানো হচ্ছে। আমরাও বাছ-বিচার ছাড়া বোকার মতো সেগুলো খেয়ে যাচ্ছি।

খাদ্যের প্রভূত্ব

আগেই বলা হয়েছে, One world order প্রতিষ্ঠার জন্য ইলুমিনাতি পৃথিবীর জনসংখ্যা কমাতে চায়। তাই বিশ্বযুদ্ধের পাশাপাশি এটাও মানুষ মারার আরেকটা অস্ত্র; বরং এটা ইলুমিনাতির সবচেয়ে মারাত্মক হাতিয়ার। তারা আমাদের দৈনন্দিন খাবারেও অনেক পরিবর্তন আনছে। তারা আমাদের দৈনন্দিন সব খাবারে এস্পারটেম মিলায়। সেটা হোক একটা চকলেট, কোক, বাটার বা সামান্য সস। এখন এমন কোনো খাবার নেই যেখানে Aspartem নেই। আগে আসুন জেনে নিই এস্পারটেম (Aspartem) কী?

এস্পারটেম হলো আর্টিফিশিয়াল সুগার। আসলে এটা একটা ব্যাক্টেরিয়া। এটাকে কিছু মডিফাই করে সুগার হিসাবে ব্যবহার করে। এই সুগার মানবদেহের জন্য প্রচুর ক্ষতিকর। এটা মানবদেহে বাচ্চা জন্মদানের ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। শুধু তাই না, এখন প্রচুর প্রেগনেন্সি মিসক্যারেজ হয়, যা আগে এতটা হতো না। আবার বর্তমানে সময়ের আগে বাচ্চা জন্ম হওয়া খুবই সাধারণ ব্যপার হয়ে গেছে। এটাও এই এস্পারটেমের কারণে।

Searle নামে একটি কম্পানি ১৯৬৫, ১৯৭৭, ১৯৮১ সালে আমেরিকান সরকারের কাছে এস্পারটেম ব্যবহারের জন্য ৩ বার অনুমিত চেয়েছিল; কিন্তু কোনোবারই আমেরিকা তাদেরকে অনুমতি দেয় নি; কারণ, Searle এই

মেডিসিন যেই বানরগুলোর ওপর টেস্ট করেছিল, সবগুলোই ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

ভাবা খুবই কষ্টকর, যেই আস্পারটেমযুক্ত খাবার ৩ বার চেষ্টা করেও বাজারে আনা যায় নি, বর্তমানে এমন কোনো খাবার নেই যেখানে এস্পারটেম ব্যবহৃত হয় না।
কোম্পানি এটাকে ইউজেনিক্স (Eugenics) হিসাবে প্রকাশ্যে জনসাধারণে আনছে। জনসংখ্যা কমিয়ে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করাকে Eugenics বলে।

জন পি হোল্ড্রেন হলেন হোয়াইট হাউজের একজন সাইন্টিস্ট। তিনি তার বই ইকোসাইন্স-এ এই ব্যাপারগুলো এত পজেটিভভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, পাঠকমাত্রই মনে করবে কাজটা খুবই ভালো করছে সরকার। তিনি বলেছেন, খাবার আর পানীয়তে এমন কিছু মেলানো উচিত—যাতে বাচ্চা জন্ম নিতে সমস্যা হয়।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, আমেরিকা সরকারও এই কথা স্বীকার করেছে যে এই প্রসেস যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করা পৃথিবীর প্রতি ১০ জনের ৮ জনই বাচ্চা জন্মদানে অক্ষম হবে। ইউএস সরকার বলেছে, এটা তাদের প্ল্যান যে তারা পৃথিবীর জনসংখ্যা ৮০% কমিয়ে ফেলবে। আমেরিকা ও ইউরোপে অলরেডি এর প্রভাব শুরু হয়ে গেছে। এই চক্রান্তের পেছনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় ব্যক্তিত্বদের হাত রয়েছে। বিলগেটসের 'এজেন্ডা ২১'-ও এই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 'এজেন্ডা ২১' এর জন্য বিল গেটস ৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। এই টাকা দিয়ে আফ্রিকা, ইন্ডিয়া আর পাকিস্তান এ কিছু ভেক্সিন দেওয়া হচ্ছে। রিসেন্ট একটা সার্ভেতে দেখা গেছে, এই ভেক্সিনের কারণে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানে অনেক বাচ্চা বিকলাঙ্গ হয়ে মারা গেছে।

এজেন্ডা ২১ এর একটা অ্যাডে বলা আছে, বর্তমানে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম হয়। এদের পেছনে টাকা খরচ না করে আমাদের উচিত যারা সুস্থ তাদের পেছনে টাকা খরচ করা। অর্থাৎ, এবনর্মাল সবাইকে মেরে ফেলাই এদের টার্গেট। বাচ্চারা এমন এবনর্মাল আর বিকলাঙ্গ হচ্ছে 'এজেন্ডা ২১'-এর ভেক্সিন

আর খাবারের এস্পারটেম্পের জন্য। আর এ-সবকিছুর পেছনে রয়েছে ইলুমিনাতির অদৃশ্য শক্তিশালী হাত।[৭৭]

---

৭৭ বিস্তারিত জানতে ক্লিক কররতে পারেন:
http : //ams- bd.blogspot.com/2018/12/blog-post_99.html?m=1

[১৭]
পানি নিয়ে যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্র

হজরত হুজাইফা রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি—

> দাজ্জাল যখন বের হবে তখন তার সাথে পানির নহর ও আগুন থাকবে; কিন্তু মানুষ যাকে আগুন বলে দেখবে সেটাই হবে শীতল পানি। আর যেটা পানি বলে দেখবে সেটা হবে প্রকৃতপক্ষে ভস্মকারী আগুন। অতএব, তোমাদের কেউ যদি দাজ্জালকে পায়, সে যেন সেই বস্তুটিতেই অবতরণ করে—যাকে সে আগুন বলে দেখবে। কেননা, সেটিই হলো ঠান্ডা সুমিষ্ট পানি।[৭৮]

আপনি হয়তো ভাবছেন, পানি নিয়ে যুদ্ধের সাথে এই হাদিসের কী সম্পর্ক? সম্ভবত এটাও বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না যে, দাজ্জাল পানি নিয়ে যুদ্ধ করবে কেন। পানি তো সব জায়গায় পাওয়া যায়। বিষয়টি বুঝতে হলে আপনাকে বর্তমান পৃথিবীতে পানির বাস্তবতা বুঝতে হবে। পৃথিবীতে সুপেয় পানির দুটি বড় ভান্ডার আছে। একটি হলো তুষারময় পর্বত। এই ভান্ডারের পানির পরিমাণ ২৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার। দ্বিতীয়টি পাতাল। এই ভান্ডারটির পানির পরিমাণ ৮ মিলিয়ন কিউবেক কিলোলিটার। এভাবে পৃথিবীতে বিদ্যমান পানযোগ্য পানির বড় পরিমাণটি হলো বরফ, যা গলে পৃথিবীর বিভিন্ন নদীর মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে ভূগর্ভস্থ পানি সে তুলনায় কম। বরফের এই মজুদ এন্টার্কটিকা ও গ্রিনল্যান্ডে সবচেয়ে বেশি। আর এই দুই স্থানের ওপর কোনো মুসলিমরাষ্ট্রের অধিকার নেই। বাকি থাকল ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ। এক্ষেত্রেও দুধরনের অঞ্চল থাকে। একটি সমতল অঞ্চল আরেকটি

---

৭৮ সহীহ বুখারি : ৭২৬১

পার্বত্য। সমতল এলাকায় শহরাঞ্চলের পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন কিছু নয়। কেননা, শহরাঞ্চলের পানির সমুদয় স্টক কোনো-না-কোনো জলাধার বা সরকারি পাম্প থেকে পাইপ লাইনের মাধ্যমে আসে। সেজন্য শহুরে মানুষ পানির জন্য পুরোপুরিভাবে সেখানকার প্রশাসনের দায়ভার ও অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

দাজ্জালের ফিতনা গ্রামের তুলনায় শহর এলাকায় বেশি কঠোর হবে এবং শহরাঞ্চলের বেশিরভাগ নাগরিক উক্ত ফিতনার শিকার হয়ে যাবে। তবে পল্লী অঞ্চলের পানির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যও দাজ্জালি শক্তিগুলো তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে।

ভবিষ্যতে পৃথিবীতে পানি নিয়ে যুদ্ধ হবে—এমন গুজব আপনি শুনে থাকবেন। জর্ডান, ফিলিস্তিন, লেবানন ও সিরিয়ার সঙ্গে ইসরাইলের, ইরাকের সঙ্গে তুরস্কের, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের পানি নিয়ে বিরোধ-বিবাদ জীবন-মৃত্যুর সমান মর্যাদা রাখে। ইহুদি ও হিন্দু এই উভয় জাতিরই চরিত্র হলো, তারা শুধু নিজেরা বেঁচেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রতিবেশীকে মেরে তবেই নিজেরা বাঁচার দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। এ কারণেই ভারতের মতো ইসরাইলও আগে আগেই তাবরিয়া উপসাগরের গতি পুরোপুরি নিজেদের দিকে নিয়ে নিচ্ছে এবং মুসলামনদের পানিবঞ্চিত করে পিপাসায় মারার চেষ্টা করেছে।

দাজ্জালি শক্তিগুলো যদি মুসলিমবিশ্বের ওপর প্রবাহমান নদী ও সাগরগুলোর ওপর ড্যাম তৈরি করে এবং সেই ড্যামগুলোর ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তারা নদীগুলোর প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে এই জগতটিকে মরুভূমিতে পরিণত করে দিতে পারবে। নদী যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন ভূগর্ভস্থ পানি অনেক নিচে চলে যাবে। তারপর এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের কাছে পানযোগ্য কোনো পানি থাকবে না। ফলে মানুষ এক ফোঁটা পানির জন্য ওদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে।

তাবরিয়া উপসাগর বর্তমান পূর্ব-ইসরাইলের জর্ডান সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত। বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ২৩ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য বেশির ভাগ উত্তর দিকে, যার পরিমাণ ১৩ কিলোমিটার, সর্বোচ্চ গভীরতা ১৫৭ ফুট। মোট

ভূখণ্ডের পরিমাণ ১৫৬ কিলোমিটার। বর্তমানে এতে নানা প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়।

এই তাবরিয়া উপসাগর ইসরাইলের মিষ্টি পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। আর এই সাগরের পানির প্রধান মাধ্যম হলো জর্ডান নদী, যেটি গোলান পর্বতমালার ধারা জাবালুশ শাইখ থেকে এসেছে। ইসরাইল এখন যে কাজটি করেছে, তা হলো তারা আগেভাগেই তাবরিয়া উপসাগরের গতি ঘুরিয়ে ইসরাইলের দিকে নিয়ে গেছে। এর দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করছে। অবশিষ্ট পানি তারা মরুভূমিতে নিয়ে ফেলছে, যাতে মুসলিমদের পানি-বঞ্চিত করা যায়। ফলে জর্ডানের ভূমিগুলো অনুর্বর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

১৯৬৭ সালের যুদ্ধে সিরিয়া থেকে গোলানের পর্বতমালা ছিনিয়ে নেয় ইসরাইল। জাবালুশ শাইখ গোলানের পাহাড়ি ধারার সবচেয়ে উঁচু চূড়া, যেখান থেকে একদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং অপরদিকে দামেস্ক পরিদৃশ্য হয়। পাহাড়টির উচ্চতা ৯২৩২ ফুট। বর্তমানে জাবাল আশ শায়খের ওপর লেবানন, সিরিয়া ও ইসরাইলের কব্জা প্রতিষ্ঠিত। কিছু এলাকা রয়েছে জাতিসংঘের অসামরিক অঞ্চল হিসেবে। এভাবে ভৌগলিক দিক থেকে ও পানির বিবেচনায়ও এই পাহাড়ি ধারা উক্ত অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাছাড়া সেই হাদিসগুলোও সামনে রাখতে হবে, যেগুলোতে তাবরিয়া উপসাগর, বাইতুল মুকাদ্দাস ও আফিক ঘাঁটির উল্লেখ রয়েছে। সর্বোপরি একথাটিও মনে রাখতে হবে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মনে করে, আসন্ন মহাযুদ্ধ মেগড এর মাঠে অনুষ্ঠিত হবে; সেই মাঠের অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের কাছাকাছি পশ্চিমে। আফিকের যে ঘাঁটিতে দাজ্জাল মুসলিমদের অবরোধ করবে, তার অবস্থানও তাবরিয়া উপসাগরের দক্ষিণে।

এদিকে ইরাকে দুটি বড় নদী প্রবহমান, দজলা ও ফোরাত। উভয়টি এসেছে তুরস্ক থেকে। তুরস্ক ফোরাত নদীর ওপর 'আতাতুর্ক ড্যাম' তৈরি করেছে, যেটি পৃথিবীর বড় ড্যামগুলোর একটি, যার পানি ধারণক্ষমতা ৮১৬ বর্গ কিলোমিটার। এই ভান্ডারটি ভরতে হলে ফোরাত নদীকে বর্ষা মৌসুমে এক মাস পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তাতে ঢালতে হবে। এর অর্থ হলো, তুরস্ক তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ফোরাত নদীর পানি এক মাস পর্যন্ত ইরাক যেতে দেবে না। হজরত আবু জায়িরার এক বর্ণনায় ফোরাত নদীর তীরে দাজ্জালের যুদ্ধের কথা এসেছে। তিনি বলেন, হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিকট দাজ্জালের আলোচনা উত্থাপিত হলে তিনি বললেন—

> তার আবির্ভাবের সময় মানুষ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল তার অনুগামী হয়ে যাবে। একদল অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে পরিজনের সাথে ঘরে বসে থাকবে। একদল এই ফোরাতের তীরে এসে শক্তপায়ে দাঁড়িয়ে যাবে। দাজ্জাল তাদের সাথে যুদ্ধ করবে আর তারা দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি তারা শামের (সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন, ও দখলকৃত প্যালেস্টাইন নিয়ে গঠিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল) পশ্চিমাঞ্চলে লড়াই করবে। তারা একটি সেনা ইউনিট প্রেরণ করবে,যাদের মাঝে চিত্রা বা ডোরা বর্ণের ঘোড়া থাকবে। এরা ওখানে যুদ্ধ করবে। ফল এই দাঁড়াবে যে, এদের একজনও ফিরে আসবে না।[৭৯]

মিশরের সবচেয়ে বড় নদী হলো নীলনদ; কিন্তু এটিরও উৎপত্তি আফ্রিকার উগান্ডা সেন্ট্রালের ভিক্টোরিয়া ঝিল থেকে। নীলনদের পানির সবচেয়ে বড় মাধ্যম রুয়ান্ডা নদী। ২০১১ সালে ইথিউপিয়া সরকার ৪.৮ বিলিয়ন ডলার ব্যায়ে 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেজিস্টেন্স ড্যাম' নামে ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নীল নদের ওপর ড্যাম নির্মাণ শুরু করে, যার নির্মাণ কাজ শেষ হবার কথা ২০১৭ সালে। শুরু থেকেই মিসরের সরকার নীল নদের ওপর এই ড্যাম নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে। সর্বশেষ ৩রা জুন ২০১৩ সালে প্রেসিডেন্ট মুরসি প্রয়োজনে এই ড্যাম ধ্বংস করার জন্য যুদ্ধ করার ঘোষণা দেন এবং এর কয়েক সপ্তাহ পরেই ক্ষমতাচ্যুত হন।[৮০]

এখন আমরা মহাযুদ্ধের পূর্বে ক্ষয়ক্ষতি বা ধ্বংসের ব্যাপারে কিছু হাদিসকে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করবো। শহর-নগরীর ধ্বংস বা ক্ষয়ক্ষতি যে সব হাদিস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে 'খারাবুন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দটি পুরোপুরি হোক বা আংশিক সব ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা ধবংসের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

হজরত মাসজুর ইবনে গায়লান হজরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন—

> 'সবার আগে ধ্বংস হওয়া ভূখণ্ড হলো বসরা (বর্তমান ইরাক) ও মিশর।' বর্ণনাকারী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কারণে তাদের ধ্বংস নেমে আসবে; ওখানে তো অনেক বড় সম্মানিত ও বিত্তবান ব্যক্তিরা আছেন?' উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে সামিত রাজিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

---

৭৯ মুসতাদরাকে হাকেম : ৪/৬৪১

৮০ https://bit.ly/2tqxSi3

> 'রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা। আর মিশরের নীলনদ শুকিয়ে যাবে আর এটিই মিসরের ধ্বংসের কারণ হবে।'[৮১]

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলের পর থেকে আজ পর্যন্ত সেখানকার রক্তপাত, গণহত্যা ও অত্যাধিক ক্ষুধা সম্পর্কে প্রায় সব চৌকস ঈমানদারগণই ওয়াকিবহাল। আর জুলাই ২০১৩ তে মুরসির ক্ষমতাচ্যুতির পরে মিসরের রক্তপাত ও গণহত্যা সম্পর্কেও প্রায় সব সচেতন ঈমানদারগণই জানেন। এখন অপেক্ষা কেবল নীলনদের করুন দশার।

হজরত ওহব ইবনে মুনব্বিহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন—

> মিশর ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত জাজিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন) নিরাপদ থাকবে। কুফা (বর্তমান ইরাকে) ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মহাযুদ্ধ সংগঠিত হয়ে গেলে বনু হাশিমের এক ব্যক্তির হাতে কুস্তুন্তুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) বিজিত হবে।'[৮২]

এখানেও মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রথমে মিশর ও ইরাকের ধ্বংস বা ক্ষতির কথা বলা হয়েছে এবং এই ভূখণ্ডগুলোর (ইরাক ও মিশর) ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত জাজিরাতুল আরব (বর্তমান সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান ও ইয়েমেন) এর নিরাপদে থাকার কথা বলা হয়েছে। আর এই জাজিরাতুল আরবেই মুসলিমবিশ্বের দুই প্রাণপ্রিয় নগরী মক্কা ও মদিনা অবস্থিত।

হজরত মুআজ ইবনে জাবাল রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> 'বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া মদিনার ক্ষতির কারণ হবে। মদিনার ক্ষতি মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে। মহাযুদ্ধ কুস্তুন্তুনিয়ার (ইস্তাম্বুলের) বিজয়ের কারণ হবে। কুস্তুন্তুনিয়ার বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের কারণ হবে।'
>
> বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই হাদিসের বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ, স্বয়ং তাঁর) উরুতে কিংবা

---

৮১ আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান : ৪/৯০৭

৮২ আসসুনানুল ওয়ারিদাতু ফিল ফিতান : ৪/ ৮৮৫

কাঁধের ওপর চাপড় মেরে বললেন, 'তোমার এই মুহূর্তে এখানে উপবিষ্ট থাকার বিষয়টি যেমন সত্য, আমার এই বিবরণও তেমনই বাস্তব।[৮৩]'

'বাইতুল মাকদিসের আবাদ হওয়া' দ্বারা উদ্দেশ্য ওখানে ইহুদীদের শক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া (ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই ঘটনাটি ঘটে গেছে)। এখন ইহুদীদের নাপাক দৃষ্টি পবিত্র মদিনার ওপর নিবদ্ধ। প্রকৃত ঈমানদারগণ ইহুদিদের এই ষড়যন্ত্র বুঝে ফেলেছে। এভাবে তখন থেকে শুরু হওয়া কুফর ও ইসলামের লড়াই এখন দ্রুতগতিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বেশির ভাগ নদী এসেছে ভারত থেকে। ভারত সেগুলোর ওপর ড্যাম তৈরি করছে। ভারতে নির্মিত ফারাক্কা ড্যামের কারণে বাংলাদেশের জটিলতা সম্পর্কে আর নতুন করে লেখার কিছু নেই। আর বাংলাদেশের সাথে তিস্তার পানিচুক্তি নিয়ে চলমান নাটক সম্পর্কেও সবাই ওয়াকিবহাল।

চন্নাব নদীর ওপর বাগলিহার ড্যাম নির্মাণ এবং নিলাম নদীর ওপর কাসনগঙ্গা ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানের পানির গতিরোধ করে ভূখণ্ডটির পানির ওপর নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস সম্পন্ন করেছে।

২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৩ সালে বাংলাদেশের 'আমাদের সময়' নামে এক দৈনিকে "পানি নিয়ে সংঘাতে জড়াবে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ" নামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে তারা লেখে, 'সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ কিংবা ভিন্ন কোনো সমস্যা নয়, পানির সংকটই দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় সমস্যায় পরিণত হতে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের বাংলাদেশ ও পাকিস্তান প্রায় সমানভাবেই পানির সংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে পানির অধিকার থেকে একইভাবে বঞ্চিত করে আসছে ভারত।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যেই পাকিস্তান পানির সংকটে পড়বে। এছাড়া ২০50 সালের মধ্যে দেশটি পানির অভাবগ্রস্থ দেশে পরিণত হবে। একইভাবে, বাংলাদেশেও ভূ-নিম্নস্থ পানির মজুদ কমছে। ভারত-বাংলাদেশের অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন সুষম না হওয়া, বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া পুরনো খবর। ফলে, বাংলাদেশও

---

৮৩ সুনানু আবি দাউদ : ৪২৯৪

অচিরেই পানির তীব্র সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পানির সহজলভ্যতা প্রায় ৩০ ভাগ কমে যাবে। আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি অবৈধভাবে দখলে রাখা ভারতেও পানির সংকট সৃষ্টি হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে দেশটিতে বর্তমান সময়ের তুলনায় পানির সহজলভ্যতা ২৮ ভাগ কমে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের পানির অধিকার পদদলিত করে ভারত আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানি নিয়ন্ত্রণে একাধিপত্য বজায় রাখছে। পাকিস্তানের সাথে অভিন্ন নদীগুলো থেকে অধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার ছাড়াও পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণেও চালকের ভূমিকা পালন করছে ভারত। একই দৃশ্য বিদ্যমান বাংলাদেশের সাথে ভারতের অভিন্ন নদীগুলোর প্রবাহের ক্ষেত্রেও। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০ সালে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তির মাধ্যমে ভারত বিয়াস, রাভী ও সুলেজ নদীর ওপর কর্তৃত্ব পায়। অপরদিকে পাকিস্তান সিন্ধু, চেনাব ও ঝিলাম নদীর কর্তৃত্বও তাদের। তাছাড়া সবগুলো নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতে হওয়ায় তারা পানি প্রবাহের প্রায় পুরোটাই তারা নিয়ন্ত্রন করে। এ-কারণে, পাকিস্তান সবসময়ই পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাকিস্তান বারবার আন্তর্জাতিক সংস্থা ও কূটনীতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করলেও তারা নিজেদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে।

একইভাবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন নিয়েও রয়েছে সমস্যা। পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের নদীগুলোতেও পানি প্রবাহে ভারতের অবৈধ নিয়ন্ত্রনের কারণে পানির সংকট সৃষ্টি হয়েছে। অনেকগুলো অভিন্ন নদী মৃত বা অর্ধ মৃত অবস্থায় আছে।

পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় দেশেরই অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। উভয় দেশেরই কৃষি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে, সামাজিক স্থিতিশীলতা চরম হুমকির মুখোমুখি হচ্ছে। আশংকা করা হচ্ছে, পানির সংকট ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জন্য কূটনৈতিক লড়াই ও সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণে পরিণত হবে।' আর দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে এই অঞ্চলের মুজাহিদদের সংশ্লিষ্টতা হাদিসে উল্লেখ রয়েছে।

হজরত নাহিক ইবনে সারিম রাজিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিকদের (মূর্তিপূজারীদের) সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এমনকি এই যুদ্ধে তোমাদের বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জর্ডান নদীর তীরে দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এই যুদ্ধে তোমরা পূর্ব দিকে অবস্থান গ্রহণ করবে আর দাজ্জালের অবস্থান হবে পশ্চিম দিকে।[৮৪]'

এখানে মুশরিকদের দ্বারা উদ্দেশ্য উপমহাদেশের মূর্তিপূজারী জাতি। তার মানে এটি সেই 'গাজওয়াতুল হিন্দ', যেখানে মুজাহিদরা এই উপমহাদেশে আক্রমণ চালাবে, আল্লাহ তাদেরকে বিজয় দান করবেন, ক্ষমা করে দেবেন, বেঁচে যাওয়া মুজাহিদরা জেরুজালেমে ফিরে যাবে এবং সেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাত পাবে এবং ঈসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে দাজ্জালের বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে।[৮৫]

উপরের ঘটনাগুলো ছাড়াও বর্তমানে বাংলাদেশে পানি নিয়ে আরও কিছু ঘটনা ঘটছে। বিশেষত রাজধানী ঢাকার পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ওয়াসাকে নিয়ে বলা হচ্ছে ওয়াসার পানি নিরাপদ না; কিন্তু বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন এই ব্যাপারে? বুয়েটের প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. আশরাফ আলী বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'এমনিতে ঢাকা ওয়াসার পানি মূল উৎসে নিরাপদ; কিন্তু বিতরণ লাইন এবং বাড়ির ওভারহেড ট্যাংকে এসে পানি দূষিত হয়।' অর্থাৎ ওয়াসার পানির মূল সমস্যা রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির সময় দেখা যায়। একদল অন্য দলের পাইপ ছিদ্র করে ফেলে যার ফলে কখনো সুয়ারেজের পানি আবার কখনো বৃষ্টির পানি ঢুকে ময়লা হয়ে যায়। আর সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ওয়াসার পানির এই ধূম্রজালকে কেন্দ্র করে ইহুদিবাদী কোম্পানি ইউনিলিভারের পিওরইট ব্যাপক ব্যাবসা শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ ওয়াসার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত 'মিডিয়া ক্যু' সৃষ্টি করে বাংলাদেশের পানির উৎসকে জায়োনিস্টরা নিজেদের আয়ত্তে নিয়ে নিচ্ছে। অথচ সমীকরণ বলছে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম নিরাপদ পানির দেশ। এই ক্যু বর্তমানে রাজধানী ঢাকায় শুরু হলেও খুব শীঘ্রই তা পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়বে।

এখন প্রশ্ন হলো, দাজ্জাল পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর অসংখ্য কূপ ও নালা কীভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হবে? এই প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে একটি

---

৮৪ আল-ইসাবা : ৬/৪৭৬

৮৫ কিতাবুল ফিতান : ১/৪০৯, ৪১০

বিষয় মস্তিষ্কে বসিয়ে নিতে হবে যে, দাজ্জালের ফিতনা পার্বত্য অঞ্চলে কম হবে এবং যেসব পাহাড় আধুনিক জাহেলি সভ্যতা থেকে পুরোপুরি পবিত্র হবে দাজ্জালের ফিতনা সেখানে পৌঁছাবে না। কাজেই পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ পানির প্রশ্নে কম দুর্ভোগ পোহাবে। তার অর্থ এই নয় যে, দাজ্জালি শক্তিগুলো বসে রয়েছে; বরং তাদের সর্বশক্তি বর্তমানে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর পানির ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত আছে। আগে মানুষ রাস্তা ও হাট-বাজার দেখে বসতি গড়ত না। মানুষ বসতি গড়ত পানির উপস্থিতি দেখে, যদিও সেটা হতো পাহাড়ের চূড়া; কিন্তু এখন সে চিত্র পালটে গেছে। এখন বসতি গড়ায় প্রাধান্য দেওয়া হয় যেখানে মানুষের ভিড়-ভাট্টা বেশি সেই এলাকাকে। অর্থাৎ এখন বসতি গড়ার ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয়, প্রাকৃতিক পানির ভান্ডার নয় বরং মানুষ পানির জন্য সেইসব ট্যাংকগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে, যেগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের অর্থায়নে সেসব এলাকায় স্থাপিত হচ্ছে। এটা চিন্তার সেই ব্যাপক পরিবর্তন, যা আন্তর্জাতিক ইহুদি চক্র পাহাড়ি লোকদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে। যাতে পাহাড়ি লোকেরা প্রাকৃতিক পানির ওপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে আর বোতল বা ট্যাংকজাত পানির ওপর নির্ভরশীল হয়। চিন্তার এই বিপ্লবের লক্ষ্যে পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে পশ্চিমাদের অর্থায়নে পরিচালিত এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চলছে। এসকল প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য, দূর-দূরান্তের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে আধুনিক জাহেলি সভ্যতার ক্রিয়া পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য আন্তর্জাতিক ইহুদি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ বরাদ্দ আছে, যা পর্যটন, উন্নয়ন, নারীশিক্ষা ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিস্তার ও প্রসারের নামে চালিয়ে দেওয়া হয়। আর এই পাহাড়ি অঞ্চলগুলোর সড়ক ও বিদ্যুতের সরবরাহ আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের বিশেষ নির্দেশনায় হয়ে থাকে। এই অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান কূপগুলোর পানির ব্যাপারে এই প্রোপাগান্ডা শুরু হয়ে গেছে যে, এই পানি পান করলে অসুখ হয়। এভাবেই তারা পাহাড়ে বসবাসরত লোকদের সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত পানি থেকে বঞ্চিত করে নেসলের বোতলজাত পুরনো পানিতে অভ্যস্ত করে তোলার চেষ্টা করছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল কুফুরি ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। আমিন।

[১৮]

প্রযুক্তি : ইলুমিনাতির ALL SEEING EYE বা সর্বদ্রষ্টা

এই ডিজিটাল যুগে আমরা ক্রমেই হয়ে উঠছি প্রযুক্তিনির্ভর। প্রযুক্তির কারণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। সকালে ঘুম থেকে উঠে শুরু করে রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের জীবনে রয়েছে ব্যাপক প্রযুক্তিপণ্যের ব্যবহার। কম্পিউটার, স্মার্টফোন এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক ডিভাইস ছাড়া আমাদের জীবন যেন বর্তমানে কল্পনারও অতীত। দিনে দিনে আমরা হয়ে উঠছি ইলেকট্রিক ডিভাইস আসক্ত। ইমু, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার ছাড়া আমাদের বর্তমান জীবন যেন কল্পনা করা যায় না। কমিউনিকেশন মিডিয়াম থেকে শুরু করে মেডিকেল সাইন্স পর্যন্ত প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ডিভাইস আমাদের জীবনে ব্যবহৃত অক্সিজেনের মতো হয়ে উঠেছে। অক্সিজেন ছাড়া জীবন যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনিভাবে ডিজিটাল ডিভাইস বা প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের জীবন বর্তমান কল্পনাতীত হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের বই পড়া, প্রবীণদের যোগাযোগ মাধ্যম, ব্যাবসায়ীদের লেনদেনের মাধ্যমসহ সর্বক্ষেত্রে বর্তমান ডিজিটাল ডিভাইসের ব্যবহার লক্ষণীয়। এর সুবিধা গ্রহণ করলেও এর ক্ষতিকারক দিক গুলো থেকে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। মূলত এই ডিজিটাল প্রযুক্তি সুবিধার তুলনায় ব্যাপক আকারের ক্ষতি করছে।

কীভাবে? বলা চলে, এর মাধ্যমে তরুণ সমাজকে বিপথগামী করা হচ্ছে। বর্তমানে ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমাণ পর্নো ভিডিও পাওয়া যায়। এই পর্নোগ্রাফির বিষাক্ত থাবায় যুবক সম্প্রদায় তাদের নীতি-নৈতিকতা হারাচ্ছে; এমনকি শারীরিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়ছে। বিষন্নতায় আক্রান্ত হওয়া, জীবনের প্রতি মোহ হারানো এবং ব্রেনে ডোপামিন[৮৬] ক্ষরণের ফলে বার বার একই

---

৮৬ ডোপামিন হলো একটি হরমোন এবং ক্যাটেকোলামাইন ও ফেনাথ্যালামিন পরিবারের নিউরো ট্রান্সমিটার—যা মানব-মস্তিষ্ক ও শরীরে বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিকভাবেই এটি মানব-শরীরে উৎপন্ন হয়।

ধরনের পর্নোগ্রাফি দেখার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া প্রযুক্তির একটি মারাত্মক ক্ষতিকর দিক।

এরপর রয়েছে অনলাইন গেম। অনলাইন গেমের মাধ্যমে বর্তমানের তরুন সমাজ অনেক বিপথগামী হচ্ছে। ইতোমধ্যে ব্লু হোয়েল খেলার কারণে অনেক তরুণ আত্মহত্যা করেছে এবং অনেকেই বিষন্নতায় ভুগছে। মোমোর চ্যালেঞ্জ নিয়ে ইন্ডিয়ায় 'মণীশ সাকী' নামে একজন আত্মহত্যা করেছে। তাছাড়া অনেকেই ব্লাকমেইলিংয়ের শিকার হচ্ছে।

তদুপরি রয়েছে অনলাইন নজরদারি। আপনি হয়তো কুরআনে কারিমের বাণী শুনেছেন যে, আমাদের দুই কাঁধে দুজন ফেরেশতা সারাক্ষণ আমাদের কর্মকাণ্ড লিখে যাচ্ছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এই কর্মকাণ্ডগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরবেন এবং মানুষ এগুলো অস্বীকার করে বলবে যে, আমি এগুলো কখনো করি নি তখন মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া হবে তার পাপ-পূণ্যগুলো। ঠিক সেভাবেই আপনি আপনার স্মার্টফোনটা বা কম্পিউটারটা হাতে নিয়ে যে কাজগুলো করছেন, তার প্রত্যেকটা রেকর্ড এই গুগল সার্ভারে সেভ হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্য। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে চাইলে আপনি আজই আপনার গুগল অ্যাকাউন্ট থেকে myactivity.google.com[৮৭] অ্যাড্রেস এ লগইন করুন। এবং সেখানে দেখতে পাবেন আপনার স্মার্টফোন থেকে বা আপনার কম্পিউটার থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলো অ্যাপ ইনস্টল দিয়েছেন, কবে কোন অ্যাপ ইন্সটল দিয়েছেন, যতগুলো মানুষকে মেসেজ বা ইমেইল পাঠিয়েছেন, যতগুলো ভিডিও আপনি ইন্টারনেট থেকে দেখেছেন এবং যত রকমের কাজ করেছেন প্রত্যেকটি রেকর্ড গুগল ডটকম-এর এই অ্যাড্রেসে জমা আছে। ভাবতে পারেন, এখানে আপনার একান্ত গোপনীয় জিনিসগুলো গুগল সার্ভারের মাধ্যমে ইলুমিনাতি জেনে নিচ্ছে।

এ-ছাড়াও গত বছর বলিউড অভিনেতা জন আব্রাহামের একটা মুভি রিলিজ হয়েছে। মুভিটার নাম 'পরমাণু : দ্য স্টোরি অভ পোখরান'।

---

৮৭ *এইসময়*, ইন্ডিয়া টাইমস ডট কম; myactivity.Google. com. *KBD news*, ২২ অক্টোবর, ২০১৮

এই মুভিতে দেখানো হয়েছে, কীভাবে আমেরিকার স্যাটেলাইট আমাদের (ভারতের) বিভিন্ন স্থাপনা এবং কার্যক্রমের দিকে নজর রাখছে। কীভাবে আমেরিকার কঠোর নিরাপত্তা ফাঁকি দিয়ে তারা পরমাণু বোমার পরীক্ষা করে। মুভিতে আরও দেখানো হয় যে, আমেরিকান স্যাটেলাইটগুলোর ক্যামেরা এত শক্তিশালী যে, এটা আপনার হাতঘড়ির কাঁটা কয়টার ঘরে আছে সেটাও ছবি তুলতে পারে। অবশ্যই এই স্যাটেলাইটগুলো বাংলাদেশের ওপরও নজর রাখছে!

এবার আসি অতিমাত্রায় অনলাইননির্ভরতা সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে। আপনি হয়তো জানেন যে, বাংলাদেশে ইন্টারনেট সরবরাহ করা হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ানের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান তৈরি করেছে ফ্রান্সের থালেস অ্যালেনিয়া স্পেস কোম্পানি। এটা লঞ্চ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা থেকে এবং এর অরবিটাল স্লট[৮৮] রাশিয়া থেকে ১৫ বছরের জন্য ভাড়া করা। একবার ভেবে দেখুন, গত ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন উপলক্ষে ২৮ ডিসেম্বর থেকে থ্রিজি এবং ফোরজি ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও অডিও কল, ম্যাসেজ টুজিসহ অন্যান্য সেবা চালু ছিল। তারপরও শুধু থ্রিজি এবং ফোরজি ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। একবার ভেবে দেখেন, ইহুদিশক্তি বা ইলুমিনাতি যদি আমাদের ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল যোগাযোগের মাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেয় তাহলে আমাদের কী অবস্থা হবে?

এমতাবস্থায় একজন মুসলিম, ঈমানদার, মুমিন হিসেবে আমাদের করণীয় হলো; প্রযুক্তির সীমিত এবং নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। ইহুদি খ্রিস্টানের তৈরি প্রযুক্তির ওপর এতটা নির্ভরশীল না হওয়া যে, তারা চাইলেই এটা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের অচল করে দিতে পারে, নিয়ন্ত্রণ শুরু করতে পারে।

---

৮৮ স্পেসে স্যাটেলাইটের অবস্থানের নির্দিষ্ট জায়গাকে অরবিটাল স্লট বলে।

[১৯]

হার্প : ইলুমিনাতির ঐশ্বরিক শক্তি

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক জোর দাবি করেছেন নেপালের ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্প[৮৯] প্রাকৃতিক ছিল না; বরং বিশেষ প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র এই ভূমিকম্প ঘটিয়েছে। এই ভূমিকম্পের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আবিষ্কৃত হার্প প্রযুক্তিকে দায়ী করছেন তিনি।

সাম্প্রতিককালে নেপালে স্মরণকালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে পর্যটন-সমৃদ্ধ দেশটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত নেপালসহ ভারত, চীন ও বাংলাদেশে সর্বমোট ৮৫০০ জনেরও অধিক মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু শহরে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থানসমূহ ভূমিকম্পের ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৩৪-এর নেপাল–বিহার ভূমিকম্পের পর এটি ছিল নেপালে আঘাত হানা সবচেয়ে শক্তিশালী ভূমিকম্প।

কানাডীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বেঞ্জামিন ফালফোর্ড তার নিজস্ব ব্লগে জোরালোভাবে দাবি করেছেন, নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্প যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি। তিনি অভিযোগ করেন, 'যুক্তরাষ্ট্র এই ঘটনার মাধ্যমে ভারত এবং চীনকে বার্তা প্রেরণ করেছে। চীন এবং ভারতকে বোঝাতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সম্পর্কে। চীনের হাত থেকে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই ভারতকে বাঁচাতে পারে—এটা বোঝানোও অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর ঠিক

---

৮৯ ২০১৫-এর নেপাল ভূমিকম্প (হিমালয়ান ভূমিকম্পও বলা হয়) ৭.৮ বা ৮.১ মাত্রার একটি ভূমিকম্প ছিল, যা শনিবার ২৫শে এপ্রিল, ২০১৫ সালে ১১:৫৬ এনএসটি (৬:১২:২৬ ইউটিসি) সময়ে নেপালের লামজংয়ের পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব কেন্দ্রস্থল থেকে আনুমানিক ২৯ কি.মি. ব্যাপী এলাকায় ভূপৃষ্ঠের প্রায় ১৫ কি.মি. (৯.৩ মা) গভীরে সংগঠিত হয়।

এজন্যই এ ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। আর তাদের এই ম্যাসেজ দেওয়ার জন্য বলির পাঁঠা হতে হয়েছে নেপালের হাজার হাজার সাধারণ মানুষকে।'

তিনি তার ব্লগে আরও বলেন, নেপালে সৃষ্ট ভূমিকম্প মূলত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (হার্প প্রযুক্তি)-এর মাধ্যমে ঘটানো হয়েছে।

হার্পের পুরো নাম হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাকটিভ অরোরাল রিসার্চ প্রোগ্রাম। যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনীর আর্থিক সহায়তায় আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিরক্ষা উন্নয়ন গবেষণা কর্মসূচি সংস্থা (ডিআরপিএ) হার্প গবেষণা চালাচ্ছে ১৯৯৩ সাল থেকে। এ কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুতের ওপর প্রভাব তৈরি করা। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি সমুদ্রের নিচে অথবা মাটির অভ্যন্তরে শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে সুনামি অথবা ভূমিকম্প তৈরি করা যায়। গবেষকদের দাবি, এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে কৃত্রিমভাবে এই ভূমিকম্প সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এ ধরনের অভিযোগের পক্ষে বিপক্ষে নানা মত রয়েছে।

শুরুতে হার্প নিয়ে অভিযোগকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব হিসেবে দেখানো হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হার্প দিয়ে মানববিধ্বংসী অস্ত্রের পরীক্ষার অভিযোগ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। জানা যায়, এই প্রকল্প শুরু হয় স্নায়ুযুদ্ধের শুরু থেকে। রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র আলাদাভাবে এ নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। হার্পের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়েই কৃত্রিমভাবে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক সৃষ্টির অস্ত্র তৈরি করেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। হার্প নিয়ে রাশিয়ার চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই অভিযোগ বেশি আসছে বিভিন্ন মহল থেকে।

এর আগে হাইতিতে ভূমিকম্পের পর পরই ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ অভিযোগ করেন, আমেরিকা হাইতিতে টেকটোনিক ওয়েপন বা ভূ-কম্পন অস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। ওই পরীক্ষার ফলে হাইতির পরিবেশ মারাত্মক বিপর্যয়ের কবলে পড়ে সৃষ্টি হয় রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্প।

তিনি আরও বলেন, এই অস্ত্র দূরবর্তী কোনো স্থানের পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পরিবেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। শক্তিশালী বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিকম্প সৃষ্টি করতে পারে বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে। শ্যাভেজ আমেরিকাকে এই ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প অস্ত্র প্রয়োগ

থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। হাইতির ঘটনায় প্রায় এক লাখ ১০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে ৩০ লাখেরও বেশি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি সূত্র থেকে দাবি করা হয়, এ ধরনের অপর এক অস্ত্র পরীক্ষায় চীনের সিচুয়ান প্রদেশে ২০০৮ সালের ১২ই মে ৭ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাশিয়া ২০০২ সালের মার্চে আফগানিস্তানে অনুরূপ এক পরীক্ষা চালিয়ে ৭ দশমিক ২ মাত্রার ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া গবেষণার প্রকল্প হার্প নিয়ে পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ ভীষণ উদ্বিগ্ন। তারা মনে করেন, ওই প্রকল্প থেকে যুক্তরাষ্ট্র এমন অস্ত্র তৈরি করেছে—যা দিয়ে তারা আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এর দ্বারা কৃত্রিমভাবে সুনামি ও ভূমিকম্প সৃষ্টিও সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ক্যাটরিনা ঝড় আঘাত হানার পর প্রথম অভিযোগ ওঠে এটি ছিল হার্পের ভুল পরীক্ষার ফল। এরপর পাকিস্তানে বন্যা, হাইতিতে ভূমিকম্প এবং সাম্প্রতিক জাপান বিপর্যয়ের জন্যও দায়ী করা হচ্ছে হার্প প্রকল্পকে। অনেকেই বলে থাকে যে, হার্প একটি অগুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম; কিন্তু সমালোচকেরা এক্ষেত্রে হার্পের বাজেটকে পুঁজি করেন। তারা মনে করেন, ২৩০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিশ্চয়ই ছেলেখেলা করছে না। কী এই হার্প? কীভাবে তা কাজ করে?

জাপান বিপর্যয়ও আমেরিকার সৃষ্টি!

সম্প্রতি জাপান বিপর্যয়ের পর এর সঙ্গে হার্পের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কানাডীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো বেঞ্জামিন ফালফোর্ড কাজ করেন যুক্তরাষ্ট্রের 'নাইট রাইডার' পত্রিকার জাপান প্রতিনিধি হিসেবে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি জাপানে অবস্থান করছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নানা গোপন গবেষণাই সাংবাদিকতায় তার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। ২০০৯ সালে তিনি অভিযোগ করেন যে, হার্প হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের গোপন এক সামরিক অস্ত্র। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র তরঙ্গের শক্তি ব্যবহার করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্তকরণ এবং ভূমিকম্প সংঘটনের মতো ভয়াবহ কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামির পরপরই তিনি এক সাক্ষাৎকারে দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেন যে, জাপানে সুনামি ও ভূমিকম্প যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি। তিনি দেখান কীভাবে ভূমিকম্পের কয়েক

দিন আগে থেকে গ্যাকোনার হার্প কেন্দ্র থেকে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। ফালফোর্ডের হিসেবে দেখা যায়, ৬ মার্চ থেকে বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ উৎক্ষেপণ শুরু হয়। প্রতি ঘণ্টায় এর মাত্রা বাড়তে থাকে। এভাবে ১১ মার্চ সুনামি ও ভূমিকম্প শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে তরঙ্গ উৎক্ষেপণের কাজ।

হার্প-ঘটিত কিছু ঘটনা

হার্প কার কার হাতে রয়েছে—এ নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়াই পরস্পরকে এ নিয়ে অভিযোগ করেছে। ১৯৯৭ সালে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেন রাশিয়াকে ইঙ্গিত করে একবার বিশ্ব ইকো টেরোরিজমের বিপদ সম্পর্কে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছিলেন, ‘এ ধরনের ইকো সন্ত্রাসীরা উচ্চপ্রযুক্তির যন্ত্রের মাধ্যমে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ পাঠিয়ে আবহাওয়া পরিবর্তন, ভূমিকম্প সৃষ্টি বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারে।’ তবে হার্পের ভয়াবহতার দিকে লক্ষ্য রেখে আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয় পরাশক্তিই এই বিষয়টাকে কখনো লাইম লাইটে আসতে দেয় নি। তবে মাঝে মধ্যেই স্লিপ অফ টক হিসাবে ওই দু’দেশের অথরিটির মুখ থেকেই বেরিয়ে এসেছে হার্পের কথা।

২০০২ সালে জর্জিয়ার গ্রিন পার্টির নেতা দেশটিতে কৃত্রিম ভূমিকম্প সৃষ্টির জন্য রাশিয়াকে অভিযুক্ত করেন। তেমনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকরী সুনামির জন্য রাশিয়াও একই অভিযোগ এনেছিল আমেরিকার ওপর।

রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় নৌবহরের ২০১০ সালের প্রতিবেদনেও যুক্তরাষ্ট্রের হার্প পরীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়। সরকারিভাবে স্বীকার না করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের ফক্সনিউজ ও রুশ টিভি চ্যানেল ‘রাশিয়া টুডে’র মতো কিছু গণমাধ্যম খবরটিকে গুরুত্বের সাথে পরিবেশন করে। রাশিয়ার অসমর্থিত রিপোর্টের বরাত দিয়ে ভেনেজুয়েলার ভিভে টিভি জানায়, জানুয়ারির গোড়ার দিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে একই ধরনের একটি পরীক্ষা চালিয়েছিল এবং এর ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার ইউরেকা শহরের কাছে ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। ওই ভূমিকম্পে কেউ গুরুতর আহত না হলেও ইউরেকা শহরের অনেক ভবন বিধ্বস্ত হয়। চ্যানেলটি আরও জানায়, তাদের পরীক্ষার ফলে যে এ-ধরনের মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটতে পারে সে ব্যাপারে মার্কিন নৌবাহিনী ‘সম্পূর্ণ অবগত’ ছিল। সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্যই মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষ কিছুদিন আগে

ক্যারিবীয় এলাকায় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডের উপপ্রধান জেনারেল পি কে কিনকে মোতায়েন করে।

পাকিস্তানের বন্যা

পাকিস্তানের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায়[৯০] আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে বলা হয়, মৌসুমিবৃষ্টির কারণে এ বন্যার সূত্রপাত ঘটে। তারা জানায়, চব্বিশ জুলাই থেকে পরের ৩৬ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি পড়েছে। তবে এ ঘটনায় পাকিস্তানের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেশকিছু সংস্থা ও গোষ্ঠী দাবি করছে, দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হার্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ বন্যা সৃষ্টি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা বলেছেন, পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল যেহেতু তালেবান ও আল কায়েদার নিয়ন্ত্রণে সেহেতু হার্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যার মাধ্যমে এ অঞ্চলে পুরোদস্তুর বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

হার্প সম্পর্কে নানা পক্ষের বক্তব্য

বিজ্ঞানীরা অনেকে আশঙ্কা করেন, যুক্তরাষ্ট্রে হারিকেন ক্যাটরিনা সংঘটন এবং মহাকাশযান কলম্বিয়া ধ্বংসের জন্য হার্পই দায়ী। উল্লেখ্য, ক্যাটরিনা সংঘটিত হয়েছে কালো অধ্যুষিত ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হার্পের প্রাথমিক পরীক্ষায় ভুলের ফলে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এবং ভুল হতে পারে জেনেই পরীক্ষার জন্য কালো অধ্যুষিত অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হয়। যদিও তখন হার্প সংশ্লিষ্টরা এ অভিযোগকে অস্বীকার করে। হার্প প্রোগ্রামে কর্মরত বিজ্ঞানী উমর ইনান যুক্তরাষ্ট্রের একটি ম্যাগাজিনকর্তৃক এ সম্পর্কিত প্রশ্নের মুখোমুখি হন। সে সময় উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, 'হার্পের ভেতরে এমন কিছু নেই—যা দিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটানো যায়। তাছাড়া হার্পের শক্তিও অনেক কম। এটা ৫০ থেকে ১০০টি ফ্লাশলাইটের সমপরিমাণ তরঙ্গ তৈরি করতে পারে; যা দিয়ে এমন কিছু করা

---

৯০ ২০১০ সালে পাকিস্তানে একটি বন্যা হয়েছিল। বিগত ৯০ বছরের পাকিস্তানের ইতিহাসে মধ্যে এটই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যায় উত্তর-পশ্চিমের খাইবার-পাখতুনখোয়া প্রদেশ, এছাড়া পাঞ্জাব, বালুচিস্তান, সিন্ধ ভেসে গিয়েছিল। জুলাই আর অগাস্টে দু'দুবার মওশুমি বৃষ্টি প্লাবন সৃষ্টি করে প্রায় দু-হাজার মানুষের প্রাণ নিয়েছিল। দু-কোটি মানুষের প্রায় ১৭ লাখ বাড়িঘর ধ্বংস করেছিল এই বন্যা।

সম্ভব না।' যদিও এটা স্বীকৃত সত্য যে, হার্প একধরনের উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট চুল্লি, যার কার্যকরী তেজস্ক্রিয়তার শক্তির পরিমাণ ১ গিগাওয়াট অথবা ৯৫ থেকে ১০০ ডেসিবেল ওয়াট থেকেও বেশি। সহজ কথায় এটি আয়নমন্ডলকে[৯১] নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী গবেষণা।

হার্পের সঙ্গে যুক্ত অনেক বিজ্ঞানী এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পেরে হার্প থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তারা জানিয়েছেন, আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করার জন্য তাদের ডাকা হলেও কাজ করতে গিয়ে তারা টের পান আবহাওয়াকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধা পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিরক্ষা দপ্তর। হার্পের সাবেক প্রোগ্রাম ম্যানেজার জন এল হ্যাকশেয়ার বলেন, 'জনগণকে বলা হয় যে, হার্পের কোনো মিলিটারি ভ্যালু নেই। যদিও এটি বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী দ্বারা পরিচালিত; কিন্তু এর গভীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে কখনো জানানো হয় না। এর দ্বারা হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত শত্রু এলাকার আবহাওয়ায় প্রভাব ফেলা যাবে।'

৮ আগস্ট, ২০০2 রাশিয়ার সরকার হার্প নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়, 'হার্প প্রকল্পের অধীনে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তরঙ্গকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর মধ্যভাগের ভূতত্ত্বে আঘাত হানার জন্য নতুন গোপন অস্ত্র তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ঠাণ্ডা ইস্পাতকে অগ্নিপ্রজ্বলিত করা বা সাধারণ অস্ত্রকে পারমাণবিক অস্ত্রে রূপান্তর করার মতো ক্ষমতাশালী এ অস্ত্র। পূর্বের অস্ত্র থেকে এটার পার্থক্য এই যে, ভূতলের মধ্যভাগে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যক্ষ প্রভাব ঘটাতে এটি সক্ষম। যা আর কোনো অস্ত্রের পক্ষে সম্ভব না।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'হার্প কর্মসূচির অধীনে বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। বেতার যোগাযোগের মাধ্যম ভেঙে ফেলতে সক্ষম নতুন অস্ত্রটি। এটি বিমানের ওপর

---

৯১ আয়নমণ্ডল মূলত বায়ুমন্ডলের একটি স্তরের নাম। বায়ুমন্ডলের স্তর মোট ৪টি: ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, আয়নমন্ডল ও মেসোমন্ডল। আর বায়ুমণ্ডল বলতে পৃথিবীর চারপাশে ঘিরে থাকা বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত স্তরকে বোঝায়, যা পৃথিবী তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা ধরে রাখে। একে আবহমণ্ডলও বলা হয়। এই বায়ুমন্ডল সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করে। এছাড়াও তাপ ধরে রাখার মাধ্যমে (গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ায়) ভূপৃষ্ঠকে উওপ্ত করে এবং দিনের তুলনায় রাতের তাপমাত্রা হ্রাস করে।

রকেট নিক্ষেপণ এবং গ্যাস পাইপলাইন, তেল, বৈদ্যুতিক সংযোগে বিপজ্জনকভাবে আঘাত হানতে পারে। আক্রান্ত অঞ্চলে জনসাধারণের মানসিক ক্ষতিও ঘটতে পারে।' মস্কো দুমা, প্রতিরক্ষা কমিটি, আন্তর্জাতিক কমিটি এবং রাশিয়ার সরকার কমিশন এই লিখিত বিবৃতি দিয়েছিল। এ বিবৃতিতে রাশিয়ার ৯০ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্বাক্ষর ছিল। জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের কাছে প্রচারও করা হয়েছিল বিবৃতিটি।

স্টিভেন মিজরাখ ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বের শিক্ষক হলেও তার আগ্রহের প্রধান জায়গা মহাকাশতত্ত্ব। তিনি 'হার্প কি তারকা যুদ্ধের হাতিয়ার?' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মার্কিনীদের তারকাযুদ্ধের পেছনে কাজ করা ব্যাপকভাবে কমে যায়; কিন্তু বর্তমান সময়ে সামরিক কাজে তারকাযুদ্ধের জন্য সময় ও অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। হার্প প্রকল্পটি বিশেষভাবে চালু করা হয়েছিল আমেরিকান নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার আড়ালে বায়ুমন্ডলের ওজোনস্তরে শক্তিশালী রশ্মি প্রক্ষেপণের মাধ্যমে ওজোনস্তরকে উত্তেজিত করে সামরিক কাজে ব্যবহার করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ওজোনস্তর সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি এবং ভূপৃষ্ঠ ও বিভিন্ন স্যাটেলাইট হতে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত রশ্মি শোষণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই ওজোনস্তরের স্থিতিশীলতার সাথে পরিবেশের নানা ভারসাম্যের দিক জড়িত।' তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, 'বিগত ৫০-এর দশকে এবং ৬০-এর শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়া ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটে তা পরবর্তী ২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাহলে হার্প প্রকল্পে ওজোনস্তর উত্তেজিত করার মাধ্যমে আমরা কি এই ধরনের একটি পরিবেশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি?' তিনি ওই প্রবন্ধে আরও বলেন, 'পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবস্থা বলে দাবি করা এই প্রকল্পটির অবকাঠামোগুলো বর্তমানে আলাস্কার গ্যাকোনাতে নির্মাণাধীন। এই ধরনের আরও হার্প হিটার ইতোমধ্যেই নরোয়ে, ইউক্রেন, রাশিয়া, তাজাকিস্তান, পুর্তোরিকায় চালু করা হয়েছে। এই ধরনের গবেষণা ও পরীক্ষা কি বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তন আনছে? গতবছর ঘটে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের বন্যার জন্য কি এই প্রকল্পই দায়ী? জিরিনোভস্কি কি এই ধরনের গোপন অস্ত্রের কথাই বলেছিলেন? এই হিটার কি ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন আনবে? আমাদের ওজোনস্তরে নতুন সৃষ্টি হওয়া ফুটো দিয়ে আগত সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে

নিজেদের রক্ষা করা কি প্রয়োজনীয় নয়? হার্প প্রকল্পের অবকাঠামোগুলোর নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসকারী মানুষগুলো কি তড়িৎচৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে নেই?

শিল্প, প্রযুক্তি, সেনাবাহিনীর দূষণ বা কর্মকান্ডের অপক্রিয়া নিয়ে কাজ করতেন যুক্তরাষ্ট্রের মানবাধিকার ও স্বাস্থ্যকর্মী ড. রোসালি বারটেল। হার্পের অপব্যবহারের বিষয়টি তিনি সবার নজরে আনার চেষ্টা করেন। ব্যাকগ্রাউন্ড অব হার্প প্রজেক্ট শীর্ষক প্রবন্ধে উপসংহার টানতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ধরে নেওয়া যায় যে হার্প কোনো বিচ্ছিন্ন গবেষণা নয়। এটি ৫০ বছরের নিবিড় এবং বর্ধনশীল ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম যা আয়নমন্ডলের ওপর নিয়ন্ত্রণ নিতে চালানো হচ্ছে। হার্প মহাশূন্য গবেষণাগার তৈরির পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এটা মহাশূন্য গবেষণা এবং সমরবিদ্যা উন্নয়নের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। যা সামরিক প্রয়োগের যৌথ কার্যক্রমের ইংগিত দেয়। এই প্রকল্পের মূল কাজ হলো, যোগাযোগব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বৈরী প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক অবস্থা এবং প্রকৃতির নির্ভরতার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই একটি বড় ক্ষমতা। লেজার এবং আহিত কণার রশ্মি নির্গমনের মাধ্যমে এবং মহাশূন্য গবেষণাগার ও রকেটের সমন্বয়ে হার্প পৃথিবীর যে কোনো স্থানে অনেক শক্তি সরবরাহ করতে পারে। যা পারমাণবিক বোমা সমতুল্য। এটা অনেক ভীতিকর।'

হার্পের ইতিহাস

যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার গ্যাকোনার টক হাইওয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকায় হার্পের অবস্থান। ৪০ একর আয়তনের বিশাল জমিতে ১৮০টি এ্যালুমিনিয়াম অ্যান্টেনার সমাবেশের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে এর গবেষণা কর্মকাণ্ড। বিমানবাহিনীর ফিলিপস ল্যাবরেটরি এবং নৌবাহিনীর অফিস অব নেভাল রিসার্চ অ্যান্ড নেভাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে কাজ করে যাচ্ছে। রেথন কর্পেরেশন এর ডিজাইন এবং নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল। বার্নার্ড ইস্টল্যান্ড কাজ করতেন তারকাযুদ্ধ নিয়ে। অনেক বছর ধরে তিনি হার্প ধারণাটির সমালোচনা করেছেন; কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে হার্প যন্ত্রটির পেটেন্ট হয়েছে তার নামে। যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট বিভাগ হার্প সম্পর্কে বলেছে, এটি পৃথিবীর যে কোনো এলাকার বায়ুমণ্ডল, আয়নমণ্ডল বা চৌম্বকমণ্ডলের

পরিবর্তনের একটি পদ্ধতি ও যন্ত্র। পেটেন্ট[92] বিভাগ হার্পের আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে পদার্থবিদ বার্নার্ড ইস্টল্যান্ডকে। এজন্য তারা সূত্র হিসেবে নিউইয়র্ক টাইমস ও লিবার্টি ম্যাগাজিনে ইস্টল্যান্ডের প্রকাশিত এ বিষয়ক কয়েকটি নিবন্ধকে উল্লেখ করেছেন। (হার্প ১১ আগস্ট, ১৯৮৭ পেটেন্টভুক্ত হয়। পেটেন্ট নং ৪,৬৮৬,৬০৫)

ইস্টল্যান্ড রেথন কর্পোরেশনের যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আধুনিক বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতেন সেই প্রতিষ্ঠানই এখন হার্পের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। ইস্টল্যান্ড হার্প নিয়ে কাজ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এটা মানবসমাজ এবং যোগাযোগব্যবস্থার ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে; কিন্তু ইস্টল্যান্ডের মৃত্যুর পর দেখা যায় যে, হার্প তার নামে পেটেন্ট হয়েছে। তার ঘনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটিই এ নিয়ে কাজ শুরু করছে। এ অবস্থায় ড. নিক বেগিচ হার্পের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। তিনি এ নিয়ে ড. ম্যানিংয়ের সঙ্গে যৌথভাবে *এঞ্জেলস ডোন্ট প্লে দিস হার্প* শীর্ষক একটি বইও লেখেন। তিনি বলেন, ‘আমি বলছি না এটা বন্ধ করে দিতে হবে। আমি বলছি এটা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। কারণ, এর অপব্যবহারের শঙ্কাটা কিন্তু সব সময়েই থাকছে। তিনি আরও বলেন, ‘এতে প্রকৃতির নানা অংশকে ব্যবহার করে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা হার্প কর্মসূচির এই অংশটি জনগণের সামনে উন্মুক্ত করেন নি।’ তিনি আরও চিন্তিত ছিলেন যে, হার্প মানুষের মস্তিষ্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, এর সিগনালগুলো মস্তিষ্কে প্রভাব ফেলার ক্ষমতাসম্পন্ন।

---

92 পেটেন্ট (কৃতিস্বত্ব) বা পেটেন্ট হলো, সরকারকর্তৃক একজন উদ্ভাবককে এক ধরনের অধিকার প্রদানের অনুমোদনপত্র, যে অধিকারবলে অন্য কোনো পক্ষ (সাধারণত সীমিত সময়ের জন্য) তার উদ্ভাবনের প্রস্তুতি, ব্যবহার বা বিক্রয় করতে পারে না। উদ্ভাবনটি হতে পারে যেকোনো পণ্য, বা হতে পারে এমন কোনো পদ্ধতি—যা মানুষের কাজে আসে। একটি কৃতিস্বত্বের মাধ্যমে এর মালিক বা উদ্ভাবক তার উদ্ভাবনের জন্য সুরক্ষা লাভ করেন। সাধারণত আদালত কর্তৃক পেটেন্ট সম্পর্কিত অধিকারগুলো কার্যকর করা হয় এবং এই অধিকার সাধারণত ২০ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকে।

হার্প আবিষ্কার

প্রথম ব্যক্তি যার মাথায় হার্পসদৃশ অস্ত্রের ধারণাটি আসে তিনি হচ্ছেন সার্বীয় বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী নিকোলা তেসলা। যার ব্যাপারেই বলা হয়ে থাকে, 'দ্য ম্যান হু ইনভেন্টেড দ্য টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী'। তিনি এসি বিদ্যুৎ যন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের বহুমুখী ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের পথ উন্মুক্ত করেন। ১৯০৬ সালে তিনি একটি ম্যাগাজিনকে বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ তারবিহীন বার্তা আদান-প্রদানে সক্ষম হবে। বর্তমান মোবাইল ও ইন্টারনেটভিত্তিক যোগাযোগব্যবস্থার ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন তিনি। মহান এই বিজ্ঞানী ৭ জানুয়ারি, ১৯৪৩ রহস্যজনকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৩ সালের মার্চেই তড়িৎ প্রকৌশলী ড. জন জি ট্রায়াম্ফের নেতৃত্বে নিকোলা তেসলার সব ধরনের গবেষণাপত্র সংগ্রহ করে সরকার। ট্রায়াম্ফ ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন দপ্তর অধিভুক্ত জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা কমিটির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তখন ওটাকে গবেষণার জন্য সংগ্রহ বলে চালানো হলেও আদতে তা ছিল দৃশ্যপট থেকে এগুলো সরিয়ে ফেলা বা জব্দ করারই নামান্তর। ট্রায়াম্ফ তার কাজের শেষে নিয়মমাফিক একটি রিপোর্ট দেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'তেসলার কাজের অধিকাংশই অমীমাংসিত। এমনও কাজ আছে যেগুলোতে দশ বছরের ধুলো জমেছে।' তাই বলে এগুলোকে যেন অবহেলা না করা হয় সে বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। ট্রায়াম্ফ রিপোর্টের শেষে উল্লেখ করেন, 'তেসলার গবেষণায় এমন একটি বাক্যও নেই—যা অবন্ধুত্বপূর্ণ কারও হাতে পড়লে বিপদ ডেকে আনবে না।' এরপর থেকে তেসলার গবেষণাপত্রগুলোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে আজ পর্যন্ত। তেসলার গবেষণাপত্র এর আগেও বেহাত হয়েছে। ১৮৯৫ এর মার্চে তার ল্যাবরেটরিতে আগুন লেগে যায়। অনেক কাগজপত্র খোয়া যায় তখন। ধারণা করা হয়—প্রতিরক্ষা দপ্তর তখন বুঝতে চেয়েছিল তেসলা আসলে কী করছেন। এজন্য আগুনের আড়ালে তার কাগজপত্র হাতিয়ে পরীক্ষা চালায় তারা।

নিকোলা তেসলা হার্প সম্পর্কে গবেষণা করেছেন তার মৃত্যু পর্যন্ত। 'কীভাবে প্রাকৃতিক শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে একে একটি অস্ত্র হিসেবে কাজে লাগানো যায়' শিরোনামে এক প্রবন্ধে তিনি হার্প সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'একে অনেকটা লেজার গানের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লেজার গানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমনভাবে নির্দিষ্ট একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত করে রশ্মিটি ফেলা হয়। এ ক্ষেত্রেও তেমনি ঘটবে। শুধু রশ্মিটি আসবে প্রাকৃতিক মাধ্যম থেকে।

হার্পের কাজ

হার্প কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে ব্যাপক মতভেদ আছে। আছে অস্পষ্টতাও। বিষয়টি কাগজে কলমে উন্মুক্ত হলেও এর আসল অংশটি একেবারে টপ সিক্রেট। পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের একাংশ মনে করেন, হার্প একটি অস্ত্র। যা দিয়ে ভূমিকম্প, সুনামি, বন্যা, ঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটানো সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের হার্প প্রকল্প থেকে জানা যায়, প্রকল্পে স্থাপিত অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্টেনাগুলো দিয়ে আয়নমণ্ডলে তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। এই তরঙ্গ প্রেরণ করা হয় ভূমি থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরবর্তী অবস্থান থেকে। এর ফলে সূর্যরশ্মির গমন পথে আহিত কণা সৃষ্টি হয়। এটি নিম্ন আয়নমলে কম্পন সৃষ্টি করে। এই কাঁপুনির ফলে এক ধরনের সাময়িক অ্যান্টেনার উৎপত্তি ঘটে। এই অ্যান্টেনাগুলো পৃথিবীতে অনেক ক্ষুদ্র ও নিচু মাত্রার তরঙ্গ পাঠাতে থাকে। এই তরঙ্গগুলো সাগরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি উচ্চমাত্রার তরঙ্গ গ্রহণ করতে সক্ষম। ফিরে আসা এ তরঙ্গকে হার্প আবার পাঠাতে পারে নির্দিষ্ট কোনো স্থানে। এছাড়া পৃথিবীর যে অংশে রাত থাকে সূর্যরশ্মি না থাকার ফলে সেখানে আয়নমলের নিচের স্তরটি সাময়িকভাবে অনুপস্থিত থাকে। এ কারণে হার্প পরীক্ষার জন্য রাত বেশি উপযোগী। হার্পের প্রোগ্রাম ম্যনেজার পল কুসি এই তরঙ্গ সম্পর্কে বলেছেন, 'এটিই হচ্ছে সত্যিকারের তরঙ্গ। এগুলো ওপর থেকে আসে এবং অনেক গভীরে যেতে পারে। এটা কোনো ধরনের তার দিয়ে সৃষ্টি করা সম্ভব না।'

আমরা জানি, সূর্যের অভ্যন্তরে অগ্নিঝড়ের দমকা চলতে থাকে সারাক্ষণ। পর্যায়ক্রমে এর হার বাড়তে ও কমতে থাকে। একেকটি দমকার সঙ্গে প্রচণ্ড তাপবাহী সৌরশিখা সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে। এই শিখার সঙ্গে বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তেজস্ক্রিয়তার (ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন) আণবিক বিস্ফোরণ ঘটে। তেজস্ক্রিয় শিখা যখন পৃথিবীর দিকে আসতে থাকে, তখন বায়ুমন্ডলের বাইরের পরিমন্ডল কতৃক তা বাধাগ্রস্ত হয়। এতে ভূ-পৃষ্ঠে থাকা মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়; কিন্তু হার্পের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলের ওজনস্তরে ফাটল ধরিয়ে সরাসরি তেজস্ক্রিয় শিখাকে প্রবেশের রাস্তা করে দেওয়া হয় এবং এভাবে সৃষ্টি করা হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

আবার হার্প দ্বারা সরাসরি ভূমির অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটে বিদ্যুৎচৌম্বকীয় তরঙ্গ প্রেরণ করে তাতে ফাটল ধরানোর মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয় ভূমিকম্প ও সুনামি। পৃথিবীর উপরিতল একাধিক শক্ত স্তরে বিভক্ত। এগুলোকে টেকটনিক

প্লেট বলা হয়। কোটি কোটি বছর ধরে এগুলো পৃথিবীর উপরিতলে এসে জমা হয়েছে। টেকটনিক প্লেট মূলত পাথরের তৈরি, এর উপরিভাগ মাটি, বালি ও জীবাশ্ম দিয়ে তৈরি। টেকটনিক প্লেট ১৫ কিলোমিটার থেকে ২০০ কিলোমিটার পুরু হতে পারে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকা গলিত ম্যাগমা বা লাভার ওপর এগুলোর অবস্থান।

হার্প পরিচালনাকারীদের মতে, এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ঘটনা সনাক্তকরণ এবং অনুসন্ধান করা। এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কাজগুলো করা যাবে এটা তারাই স্বীকার করেছেন।

- ১) আয়নমণ্ডলের বৈশিষ্ট, চরিত্র সনাক্ত করতে ভূবিদ্যা সম্পর্কিত কিছু পরীক্ষা চালানো যাতে করে ওজনস্তরের নিয়ন্ত্রণ লাভ করা যায়।

- ২) আয়নমণ্ডলে লেন্সের মাধ্যমে অতি উচ্চকম্পাঙ্কের শক্তিকে ফোকাস করা এবং আয়নমন্ডলের প্রক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

- ৩) প্রেরিত ইনফ্রারেড তরঙ্গ আয়নমন্ডলের ইলেকট্রন গুলোকে আরও গতিশীল করবে এবং অন্যান্য আলোক তরঙ্গ নির্গমনের মাধ্যমে রেডিও ওয়েভের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে।

- ৪) ভূচৌম্বকীয় গঠনের পরিবর্তনের মাধ্যমে রেডিও তরঙ্গের প্রতিফলন নিয়ন্ত্রণ করা।

- ৫) পরোক্ষভাবে তাপ দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত রেডিও ওয়েভ এর চলাচলের ওপর প্রভাব ফেলা যা আয়নমন্ডলের নিয়ন্ত্রণের সামরিক উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারিত করে।

- ৬) আয়নমলের ৯০ কি. মি. নিচে রেডিও ওয়েভের প্রতিফলক স্তর তৈরি করা, যা দিয়ে অনেক দূরদূরান্ত পর্যন্ত নজরদারি করা যাবে।[৯৩]

HAARP নিয়ে বানানো কিছু ভিডিও ডকুমেন্টারিও আছে, সেগুলো দেখলেও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। এ ধরনের একটি ভিডিও প্রতিবেদনের লিংক রেফারেন্স দেওয়া হচ্ছে—যা আপনাকে এই HAARP কে বুঝতে আরও বেশি সহায়তা করবে।[৯৪]

---

৯৩ https //m.youtube. com >watch.; Www.bdlive24.com >details; https //www.techtunes.com.bd; *বেশতো*

৯৪ ভিডিওটির লিংক : https : //vimeo.com/86241046

[২০]

নাইন ইলেভেন : ইলুমিনাতির সাজানো নাটক

২০১১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর। এই দিনটি আমেরিকার ইতিহাসের একটি কালো দিন। এইদিন আমেরিকার দুইটি বিখ্যাত স্থাপনার ওপর মোট ৪টি আত্মঘাতী বিমান হামলা হয়। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন জুনিয়র বুশ। তিনি পরবর্তী নির্বাচন এর ক্যান্ডিডেটও ছিলেন।

সকাল ৭ : ৪০, সুন্দর রৌদ্রজ্জ্বল দিনটিতে বোয়িং-৭৬৭ নামক একটি এরোপ্লেন হঠাৎ এয়ারপোর্টের রাডার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ধারণা করা হয়েছিল প্লেনটি হাইজেক হয়েছে। ২০,০০০ লিটার ফুয়েলসহ সকাল ৮ : ৪৫ এ প্লেনটি আমেরিকার বিখ্যাত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার (টুইন টাওয়ার)-এর উত্তর পাশের বিল্ডিং এর ৮০তম তালায় আঘাত করে (ক্রাশ করে)। প্রায় ১০০ জন তখনই মারা যায়। এবং আরও অনেক জন উপরের তলাগুলোতে আটকা পড়ে।

প্রথম হামলার ১৮ মিনিট পর ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স-এর ফ্লাইট-১৭৫ (সেটাও বোয়িং-৭৬৭) মাটি থেকে আকাশে ওঠে এবং দক্ষিণ পাশের বিল্ডিংটিতে ক্রাশ করে। এই আঘাতটা বিশাল বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে। আবার ৯ : ৪৫ এ ওয়াশিংটনে অবস্থিত পেন্টাগনের পশ্চিম দিকে আঘাত করে আমেরিকান এয়ারলাইনের আরেকটি বোয়িং-৭৬৭(ফ্লাইট-৭৭)।

পেন্টাগন হচ্ছে আমেরিকার মিলিটারি হেডকোয়াটার। পেন্টাগণে হামলায় ১২৫ সামরিক ব্যক্তি ও সিভিলিয়ানসহ ফ্লাইটে অবস্থিত আরও ৬৪ জন মারা যায়। আরেকটি প্লেন ৫০০ মাইল প্রতি ঘণ্টা গতিতে ওয়েস্টার্ন পেনসিলভানিয়াতে আঘাত করে। এই দিনের হামলায় প্রায় ৩,০০০ জন নিহত ও ১০,০০০ জন আহত হয়। পরে জানা যায়, সবগুলো প্লেনই হাইজ্যাক হয়েছিল। এবার আসেন আমরা ঘটনাটি বিশ্লেষণ করি। আমার বিশ্লেষণ আপনাদের মতের বিরুদ্ধেও যেতে

পারে।[৯৫] প্রথমে world trede center ৯/১১-এ বিমান দিয়ে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করার যে দৃশ্যটি আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি তার সত্যতা, বৈজ্ঞানিক

---

৯৫ ৯/১১ এর টুইন টাওয়ার হামলার ঘটনা বর্তমান পৃথিবীতে বহুল আলোচিত একটি ঘটনা। এই হামলার আগপরের ইতিহাস ভিন্ন। তবে এই হামলা বাস্তবিকপক্ষে কারা ঘটিয়েছে সেটা নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। লেখক এখানে একপাক্ষিক বক্তব্য পেশ করেছেন। লেখকের এ-বক্তব্যের সূত্র এলেক্স জেনসসহ আরও কিছু বিধর্মী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। মুসলিম গবেষকদের অনেকে এর সাথে একাত্মতাও প্রকাশ করছেন। এই মতের পক্ষে তাদের কিছু যুক্তিও রয়েছে, যার কয়েকটি লেখক উল্লেখ করেছেন।

তবে একদল মুসলিম গবেষক এক্ষেত্রে মনে করেন, ৯/১১ এর ঘটনা আল-কায়েদা পরিচালিত করেছে এবং এর পেছনে ছিল শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লার নেতৃত্ব। এর পক্ষে ভুরি ভুরি দলিল উপস্থাপনের সুযোগ রয়েছে। তবে সবচে বড় কথা হলো, একিউ অফিসিয়ালি এ-মতের পক্ষে কথা বলেছেন। তাদের মিডিয়া-মুখপাত্র আস-সাহাব মিডিয়ায় পর্যাপ্ত ভিডিও ও দলিল উপাত্ত রয়েছে। তবে যারা খোদ বিন লাদিন ও তার দলকেই আমেরিকার বানানো মনে করে তাদের জন্য এগুলো যথেষ্ট না হওয়াই স্বাভাবিক।

নয়-এগারোর ঘটনা একিউ ঘটিয়েছে তার পক্ষে আমরা এখানে কিছু ভিডিওর লিংক দিচ্ছি আশা করি আমাদের দাবি প্রমাণে এগুলোই যথেষ্ট হবে।

১. আবূ আল আব্বাস আল জানুবির শেষ অসিয়ত :
http://www.archive.org/details/hijackers1

২. আল উমারির শেষ অসিয়ত :
http://www.archive.org/details/wasiyat-shaheed-alumari

৩. সাঈদ আল গামদির শেষ অসিয়ত :
http://www.archive.org/details/motaz

৪. ইলম হলো আমল করার জন্য-১
http://www.archive.org/details/high-hopes1

৫. ইলম হলো আমল করার জন্য-২
http://www.archive.org/details/high-hopes

৬. সত্যের শক্তি
http://www.archive.org/details/Power-Truth

৭. শাইখ উসামার পক্ষ থেকে বার্তা
http://al-boraq.info/showthread.php?t=53835

৮.৯/১১ এর পর ইমামগণের বার্তা
http://www.archive.org/details/LaDeN7

৯. ইউরোপের প্রতি শাইখ উসামার বার্তা, তিনি ৯/১১ এর পেছনে ছিলেন তার ঘোষণা:
https://www.youtube.com/watch?v=zM0VdyhtQKo

১০. ২০ জন হাইজ্যাকারের গল্প মিথ্যা গণ্য করে শাইখ উসামার বক্তব্য:
https://www.youtube.com/watch?v=rGTKBDqnpIM

১১. শাইখ উসামা বিন লাদিনের তোরাবোরা থেকে বক্তব্য:
https://www.youtube.com/watch?v=dls5JTD-uG0&fmt=18
১২. উম্মাহর বর্তমান অবস্থা-১
http://www.archive.org/details/stateoftheummah1

১৩. উম্মাহর বর্তমান অবস্থা-২
http://www.archive.org/details/stateoftheummah2

১৪. আমেরিকান নাগরিকদের প্রতি শাইখের বার্তা :
http://www.archive.org/details/laden_new_29_10_2004

ভিডিওগুলো দেখলে এবং এ-সংক্রান্ত ডকুমেন্টারি ঘাঁটাঘাঁটি করলে জেনে থাকবেন, স্বয়ং বিন লাদিন এ ঘটনার দায় স্বীকার করেছেন। তিনি বার বার দাবি করেছেন, ১৯ জন সক্রিয় জানবাজ মুজাহিদের দ্বীপ্তিময় হামলা এই নয় এগারো। এ ঘটনার বিভিন্ন সুরত হতে পারে। পেন্টাগনে সরাসরি বিমান আঘাত করা ছাড়াও, ঘটনার অন্য কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে। হয়তো ভেতরে কোনোভাবে বোমা রাখা ছিল, সেটা যে-কারণেই হোক। হতে পারে আল কায়েদার কয়েকজন সদস্য গুপ্তচরবৃত্তির লক্ষে পেন্টাগনে কাজ করছিল। অথবা এটা কোনো এস্তেশহাদি ঘটনা ছিল। বিভিন্ন রূপ হতে পারে। শাইখ উসামার একজন গুপ্তচর আলি মুহাম্মদ সিআইএতে দীর্ঘ ২০ বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। সেই তথ্যও একটু চাইলেই নেট ঘেঁটে জেনে নিতে পারবেন। সুতরাং, পেন্টাগনেও শাইখের গুপ্তচর থাকতে পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু না। নয় এগারোর হামলা ছাড়াও বড় বড় কয়েকটি হামলায় আল কায়িদা সরাসরি জড়িত ছিলেন। যেমন : রিয়াদ হামলা, আফ্রিকায় আমেরিকান এম্বাসিতে হামলা, ইরাকে জাতিসংঘের গোপন মিটিংয়ে হামলা, জর্ডানে ইসরাইলি জায়নবাদিদের গোপন মিটিংয়ে হামলা ইত্যাদি। অতএব, পেন্টাগন হামলায় তাদের জড়িত থাকাটা একেবারেই সম্ভব ও স্বাভাবিক। পেন্টাগনে হামলার পর এফবিআই ওই এলাকার হোটেল গ্যাস স্টেশনের ভিডিও ফুটেজগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেয়। হতে পারে তারা চাচ্ছিল না সত্যিকার ঘটনাটা পৃথিবীবাসী জানুক। তাদের সবচে নিরাপত্তাবেষ্টনীর ভেতর ঢুকে কজন মুসলিম তাদের সুপার পাওয়ারগিরি ধুলোয় মিশিয়ে

ভিত্তি নিয়ে রয়েছে বড় ধরনের প্রশ্ন। কিছুদিন আগেও এক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এমন প্রশ্ন তোলা হয়েছে। স্টিল-কাঠামোর কোনো গগনচুম্বি ভবন আগুনের কারণে ভেঙে পড়েছে, গত ১০০ বছরের ইতিহাসে এমন নজির নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের ভবনে যে স্টিল ব্যবহার করা হয় তা উন্মুক্ত স্থানে অগ্নিকাণ্ডের কারণে সৃষ্ট তাপমাত্রায় গলতে পারে না। জেট ফুয়েল হল পরিশোধিত কেরোসিন, যা সবচেয়ে অনুকূল অবস্থায় (যথাযথ বায়ুপূর্ণ অবস্থা) ৭০০-৮২০ ডিগ্রির মতো সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রায় পুড়ে। এমনকি আগুন যদি এতটা উত্তপ্ত হয়ও, সেক্ষেত্রে সেটা স্টিলের কাঠামো গলিয়ে দিতে পারে না।

কিন্তু world trade center-এ যেই স্টিল ব্যবহার করা হয় সেটা গলতে কমপক্ষে ১০৪০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন ছিল। স্টিল পুড়ে গলে পড়ে যেতে পারত, ভেঙে পড়ল কীভাবে? এবার পেন্টাগনে আসি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর পেন্টাগনের ওপর বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায়। বলা হয়ে থাকে, বিশ্বের সবচেয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংবলিত ভবন এটি। পেন্টাগনের রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে অত্যাধুনিক রাডার ও বিমান প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। রয়েছে অ্যান্ড্রুস এয়ারফোর্স ঘাঁটি, পেন্টাগনের সুরক্ষার জন্য যেখানে ১১ মাইল পর্যন্ত এলাকাজুড়ে সবসময় সতর্কতা ব্যবস্থাসহ যুদ্ধবিমান প্রস্তুত থাকে। অথচ নিউইয়র্কে কথিত হামলা শুরু হওয়ার ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট পর পেন্টাগণ আক্রান্ত হলেও সেখানে কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় করা হয় নি কেন?

দিয়েছে—তারা সেটা প্রকাশ করে লজ্জিত হতে চাচ্ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, এলেক্স জেনসদের দেওয়া খবরকে পুঁজি করে আমরা আস-সাহাব এবং খোদ বিন লাদেনের তথ্য ও স্বীকারোক্তিকে অস্বীকার করতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট প্রমাণ না মিলবে, ততক্ষণ মুমিনের কথাই মুমিনের কাছে বিশ্বাস্য হবে এটাই শরিয়তের নিয়ম। আল্লাহ বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ

মুমিনগণ, যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।

আপনি কি জানেন আমেরিকার সমরিক বাজেট পৃথিবীর সর্ববৃহৎ? চলতি ৫ বছর এর সামরিক বাজেট ৬৬২ বিলিয়ন ডলার, যেখানে রাশিয়ার ৩২৪ বিলিয়ন (২য় স্থানে), চীন ১৯৬ বিলিয়ন (৩য় স্থানে) তারা আমেরিকার ধারে কাছেও নেই। এমন কি বাজেটলিস্টে আমেরিকার পর পরবর্তী ৯টি দেশের বাজেট যোগ করলেও তাদের সমান হয় না। সেই দেশের প্রতিরক্ষা হেডকোয়াটারে হামলার কোনো ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যায় নি। যেহেতু পেন্টাগন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আমেরিকা একটি স্যাটেলাইট রাখে শুধু এর ওপর নজরদারির জন্য। সেই স্যাটেলাইট ফুটেজও পাওয়া যায় নি। এমন কি পেন্টাগনের কাছে যে একটি বিমান যাচ্ছে, স্যাটেলাইট সেই বার্তা বিমানঘাটিতে পৌছায় নি? হাউ ইজ ইট পসিবল! আমার মনে হয় বাংলাদেশের বুকেও এটা সম্ভব ছিল না। বার্তা পৌঁছালে বিমান বাহিনী সেটাকে প্রতিহত করতে পারত।

এবার আসি ওয়েস্টার্ন পেনসিলভানিয়াতে, পেনসিলভানিয়াতে এত বড় গর্ত হয়েছিল যে, বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিমানটি ৫০০ মেইল প্রতি ঘণ্টা গতিতে এসেছিল; কিন্তু একটি যাত্রীবাহী বিমান কখনোই এত গতিতে চলতে সক্ষম না। সর্বোচ্চ গতি ২০০-২৫০ হতে পারে। তাই অনায়াসে বলা যায়, এটি একটি সাজানো নাটক।

মূলত ২০০০-২০০৮ সাল পর্যন্ত জুনিয়র বুশ ক্ষমতায় ছিলেন। তার ২০০০ সালে নির্বাচনে ইলুমিনাতির হাত আছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। যেমনটা ট্রাম্পের সময় হয়েছে। বুশ ছিলেন একজন কঠোর নেতা। তাই অনেক মানুষই তাকে পছন্দ করতেন না। ৯/১১ এর ঘটনাটা ঘটার পর সবাই ভেবে নেন, এখন বুশের অবস্থান খুবই প্রয়োজন। এই সময় বুশ সব দোষ আল-কায়দা ও শাইখ উসামা-বিন লাদেনের ওপর চাপিয়ে দেয় এবং তাদেরকে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে চরম জনপ্রিয়তা পায়। এতটাই জনপ্রিয়তা পায় যে, পরের নির্বাচনেও এর অনেকটা প্রভাব পড়ে। এই নাটকে এটা ছিল বুশের লাভ। এবার বলি ইলুমিনাতি এখানে কীভাবে জড়িত—

৯/১১ এর রেশ ধরে বুশ বিভিন্ন দেশে দখলদারিত্ব শুরু করে। এই রেশ ধরেই বুশ ইরাক আক্রমণ করে। এই অজুহাতে যে, সাদ্দামের কাছে মরণাস্ত্র আছে এবং সে ৬ ঘণ্টার মধ্যে আমেরিকায় আক্রমণ করবে। ৬ ঘণ্টার মধ্যে আক্রমণের বাহানা করে স্বপ্নের শহর ইরাকে ২ দিন টানা বিমান হামলা চালায় সে। গুড়িয়ে যায় স্বপ্নের বাগদাদ। এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক ও ফিলিস্তিন থেকে এত তেল চুরি করেছে যে তা দিয়ে তাদের আগামী ৩০০ বছর তেলের চাহিদা

পূরণ করা যাবে। সাদ্দাম থাকাকালে, ইরাকের ১ দিনার ছিল বাংলাদেশের ১২৫ টাকা। আর এখন আমাদের ১ টাকা সমান ইরাকের ১৫ দিনার। বুঝে নেন, কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তেল চুরি হচ্ছে। এখানে ইলুমিনাতির OWO (One World Order)-এর উদ্দেশ্য অনেকাংশ বাস্তবায়ন হয়। কীভাবে? ইলুমিনাতি পুরো পৃথিবীতে শাসন করতে চায়। তাই সাদ্দামের মতো স্বৈরশাসক তাদের জন্য বাধা ছিল। একই কাজ এখন উত্তর কোরিয়ার 'কিম জন উন' এর সাথে করছে।

আসুন দেখি—বুশ ইলুমিনাতির সাথে কীভাবে জড়িত? ২০০০ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বুশ প্রথম মার্কিন One world order প্রস্তাব করে। যা ইলুমিনাতির মূল স্বপ্ন। বুশের পরে সব প্রেসিডেন্টরাই একই পথ ধরে কাজ করছে। শুধু তাই না, বুশ ২০০৪ সালে আবার ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন ১ ডলারের নোটে ইলুমিনাতির সাইন বা চিহ্ন বসায়। ইলুমিনাতির সাইন হলো একটি ত্রিভুজ ও তার ভেতরে একটি চোখ।

এখন আপনার মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, ইলুমিনাতির এত ক্ষমতা কীভাবে হয় যে, তারা নিজের ইচ্ছামতো দেশে প্রেসিডেন্ট বসাবেন? শুধু বুশ না, বুশ এর পর প্রায় সব প্রেসিডেন্টই ইলুমিনাতির মনোনীত। একটা মারাত্মক কথা কি জানেন? আপনারা অনেকেই সিম্পসন্স কার্টুন দেখেছেন।

অনেক জনপ্রিয় একটি কার্টুন; কিন্তু সেই কার্টুনে ভবিষ্যতে ঘটবে এমন অনেক মারাত্মক ঘটনার ইংগিত দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে, ১৯৯৭ সালের একটি এপিসোডে ৯/১১ এর ঘটনার ইংগিত আছে, সেখানে world trade center-এ বিমান হামলা হয়েছিল। আর তাছাড়া পাঁচ ডলারের নোটেও ৯/১১ এর ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। এভাবেই ইলুমিনাতি বিভিন্ন ভবিষ্যৎদ্বাণী করে সেগুলো বাস্তবায়ন করে! যেন উপহাস করে দুনিয়ার মানুষদের প্রতি যে—পারলে ঠেকাও! অথচ আমাদের কিছুই করার নেই।[৯৬]

---

৯৬ তথ্যসূত্র : বিবিসি, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭. রিসার্চ সেন্টার অভ দেওবনিয়াত

[২১]

সুইসাইড গেম : ইলুমিনাতির ভার্চুয়াল অস্ত্র

আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার এক প্রাণঘাতী 'গেম' ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে। ইতোমধ্যেই আত্মহত্যার হাতছানির ফাঁদে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কয়েক কিশোরের। কয়েকদিন আগেই কার্শিয়াঙের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র, মণীশ সার্কির মৃত্যুতে নাম উঠেছিল এই মোমো চ্যালেঞ্জের। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, মোমো গেমের চ্যালেঞ্জ নিতে গিয়েই তার মৃত্যু হয়েছে।

এই মোমো আসলে কী

একটি মেয়ের ছবি 'মোমো'। ছবিটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর। মেয়েটির চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পা দুটি অনেকটা মুরগির মতো। পায়ের আঙুলের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি এবং নখগুলি বড় বড়। মুখ চওড়া। মাথাটা লম্বা। চুলগুলি কালো। কানের পাশ দিয়ে চুলগুলো নিচে নেমে গেছে। মাথার ওপরের দিকটা দেখলে মনে হবে, টাক আছে। তারই মাঝে কিছুটা জায়গা ছেড়ে ছেড়ে রয়েছে চুল। মোমোর এই ছবিটা এঁকেছিলেন একজন জাপানি শিল্পী, মিদোরি হায়াশি। ২০১৬ সালে টোকিওর 'ভ্যানিলা গ্যালারি'তে একটি শিল্পপ্রদর্শনীর জন্যই এই ছবি এঁকেছিলেন হায়াশি।

কোথায় শুরু এই মোমো চ্যালেঞ্জ-এর?

মেক্সিকোর সাইবার ক্রাইম নিয়ে কাজ করা এক দল পুলিশ বলেছেন, এর শুরুটা ফেসবুকে। যদিও এখনো এর নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

কেন এই চ্যালেঞ্জ বিপজ্জনক?

১. ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে। ২. ব্যবহারকারীর আত্মহত্যা ঝুঁকি। ৩. নানামাত্রিক হয়রানির শিকার হতে পারে। ৪. হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা লোপাট হতে পারে। ৫. শারীরিক ক্ষতি ও মানসিক

অবসাদে আক্রান্ত হতে পারে। ৬. সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, ব্লাকমেইলের মাধ্যমে অনেক অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নেওয়া হতে পারে।

কার্শিয়াঙে ১৮ বছরের মণীশের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল একটি শুয়োরের খামার থেকে। ওই খামারের দেওয়ালে লাল ও সবুজ কালিতে সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা দেখেই পরিবার ও এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়েছিল কোনো মারণ গেমের শিকার মণীশ। যদিও পুলিশ এখনো নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারে নি।

ঘটনাস্থলের দেওয়ালে 'ইলুমিনাতি' লেখা ছিল

দেহের পাশ থেকেই উদ্ধার হয়েছিল মণীশের মোবাইল। দেখা গিয়েছে, দেওয়ালে বেশ কিছু অবিন্যস্ত শব্দ লেখা। তার মধ্যে অন্যতম 'ইলুমিনাতি'। লাল এবং সবুজ কালি দিয়ে আঁকা হয়েছে সঙ্কেত বা ছকের মতো কিছু। সবচেয়ে আশ্চর্যের, দেওয়ালে একটি ছবি যেভাবে আঁকা ছিল, মণীশের দেহ হুবহু সেভাবেই ঝুলন্ত অবস্থায় মেলে।

এই 'ইলুমিনাতি' শব্দটি এই সময়কে নতুন করে ভাবিয়েছে। কারণ, এর শিকড় অনেক গভীরে। ইতিহাসও বহু প্রাচীন। এই শব্দের মোহেই প্রাণ গিয়েছে বলে করা হয়, মাইকেল জ্যাকসন, জন লেনন, কার্ট কোবেন, জিম মরিসন, মার্লিন মনরো, হুইটনি হাউসটনের মতো অসংখ্য সেলেবের। এই তালিকায় নাম রয়েছে, বব মার্লে, প্রিন্সেস অফ ওয়েলস ডায়না, ব্রুস লি থেকে জিমি হেন্ড্রিকসদেরও। মণীশও হয়তো এদের মতোই ইলুমিনাতির শিকার। তাহলে, কার্শিয়াঙে মৃত মণীশ সার্কিও কি কোনোভাবে এই গোপন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল? কারণ, ঘটনাস্থলে মিলেছে 'ইলুমিনাতি' শব্দটির সঙ্গে মণীশের পরিচিতির প্রমাণ। 'এক্সপার্ট' হয়ে ওঠার ভাবনা থেকেই কি এমন সিদ্ধান্ত ছোট্ট পড়ুয়ার? মোমো চ্যালেঞ্জের মারণথাবার খবরের নিচে কোথাও 'ইলুমিনাতি'দের গল্প ঢাকা পড়ে যাচ্ছে না তো?

[২২]
বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল : ইলুমিনাতির হেডকোয়ার্টার

বারমুডা অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের সর্বমোট ৩০০টি দ্বীপ নিয়ে বিস্তৃত এলাকার নাম। যার মধ্যে বেশির ভাগই অনাবাদী। শুধুমাত্র ২০টি দ্বীপের মধ্যে মানুষের অবস্থান পাওয়া যায়। এর মধ্যে যে এলাকাকে আশংকাজনক মনে করা হয়, তাকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল বলা হয়। এই ট্রাইএঙ্গেলের আয়তন চারপাশ থেকে ১১৪০০০০ বর্গ কি. মি.। উত্তরে বারমুডার বিভিন্ন দ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্বে পোর্টারিকো এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মার্কিন সরকার শাসিত প্রসিদ্ধ ফ্লোরিডা শহর। অর্থাৎ এই ট্রাইএঙ্গেলের মূল অবস্থান ফ্লোরিডায়। (ফ্লোরিডা অর্থ- ওই খোদার শহর—যার অপেক্ষা করা হচ্ছে; অথবা ওই খোদা—যার অপেক্ষা করা হচ্ছে)

প্রায় ৪০০ বছর পূর্ব থেকেই এই এলাকায় কোনো মানুষ বসবাস করে নি। এমনকি অভিজ্ঞ এবং দক্ষ জাহাজের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ভয়ে ওই এলাকা থেকে দূরে থাকে। ওখানে একটি কথা খুবই প্রসিদ্ধ যে, 'ওখানকার পানির গভীরে ভয়ংকর সব শয়তানি রহস্য লুকিয়ে আছে।' এমনকি ওখানকার আকাশপথের ভ্রমণকারীরা এয়ারহোস্টেসকে পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে—আমাদের বিমান কি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ওপর দিয়ে যাবে? যদিও তারা ইতিবাচক উত্তর দিয়ে পরিস্থিতি সামলে নেয়।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের আকৃতি সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে। কারও মতে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পুরো এরিয়াটাই সমুদ্রে, যা অ্যাটলান্টিক সাগরে অবস্থিত। সুতরাং মনে প্রশ্ন আসে যে, চারদিকে শুধু পানি আর পানি, এখানে এঙ্গেল বা ত্রিভুজের আকৃতি কীভাবে সম্ভব? মূলত এই এঙ্গেল বাস্তব না বরং এটি একটি বিশেষ এলাকার নাম; যেখানে অবিশ্বাস্য ও রহস্যময় ঘটনার জন্ম হয়। ওই এলাকাকে ট্রাইএঙ্গেল হিসাবে সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে। এ-নামের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, ১৯৪৫ সালে ওই এলাকায় একসাথে কয়েকটি বিমান গায়েব হওয়ার পর এক প্রেস কনফারেন্সে সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করা হয়; কিন্তু এটা খুবই রহস্যপূর্ণ যে, নামটি ট্রাইএঙ্গেলই কেন রাখা হলো।

ওই দুর্ঘটনার পূর্বেও ওখানে বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু তখন ওই এলাকাকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের নামে জানত না মানুষ। সবাই এটাকে শয়তানের দ্বীপ হিসেবে চিনত। ক্রিস্টোফার কলম্বাস (১৪৫১-১৫০৬) সামুদ্রিক ভ্রমণের সময় যখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনিও ওখানে কিছু অচিন ও আশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেন। যেমন—আগুনের গোলা সমুদ্রে প্রবেশ করা, ওই সীমানায় প্রবেশ করলেই যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ ছাড়াই কম্পাস খারাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

কলম্বাসের আমেরিকা-ভ্রমণ পাঁচ শতাব্দী হয়ে গেল; কিন্তু আজও মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে ওখানকার পানির গভীরে বা পানির ওপরে আকাশপথে এমন কী গোপন বিষয় আছে—যা বর্তমান অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের যুগেও খুঁজে বের করা সম্ভব হচ্ছে না। ১৮৫৪ সালের পূর্বে আরব বণিকেরাও ওই এলাকা দিয়ে যাতায়াত করত, কিন্তু তাদের জাহাজ কখনো দুর্ঘটনা বা কোনো অস্বাভাবিক রহস্যের কবলে পড়ে নি। অথচ এরকম ঘটনা ১৮৫৪ সালের পূর্বেও বহুবার ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল; জাহাজের কবরস্থান

১৮১৩ সালে আমেরিকার তৃতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এরন বার (Aaron Burr)-এর কন্যা থিউডোসিয়া (Theodosia) (দক্ষিণ কেরলিনা রাজ্যের গভর্নর জোসেফ এস্টনের স্ত্রী, খুবই বুদ্ধিমতী এবং সুন্দরী কন্যা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল) বারমুডার ওই এলাকায় হঠাৎ একদিন গায়েব হয়ে যায়। থিউডোসিয়া তার পিতার সাক্ষাতের জন্য তখনকার সর্বাধুনিক জাহাজ পেট্রিয়াটে করে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পেট্রিয়াটের ক্যাপ্টেন তখনকার সুদক্ষ নাবিক হিসেবে আমেরিকায় প্রসিদ্ধ ছিল। সাথে তার ব্যক্তিগত ডাক্তার এবং আরও কিছু পরিচিতজন ছিল; কিন্তু তারা কখনোই নিউইয়র্ক এ পৌঁছাতে পারে নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরন বার তার কন্যাকে খুঁজে পওয়ার জন্য তার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, না পাওয়া গেছে কন্যার খবর, না পাওয়া গেছে জাহাজের কোনো হদিস।

১৮১৪ সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক জাহাজ WASP-কেও বারমুডা গিলে ফেলেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন কোনো সাধারণ মানের ক্যাপ্টেন ছিল না, মার্কিন জনগণের কাছে নায়ক হিসেবে পরিচিতি ছিল ওই নাবিক জনস্টন ব্লেকলে। সে ব্রিটিশ শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজ Reindeer-কে স্বীয় দক্ষতায় মাত্র ২৭

মিনিটেই পরাজিত করেছিল। এরপর আর কেউ জানতে পারে নি যে ব্লেকলে তার স্টাফ এবং জাহাজ নিয়ে কোন জগতে গিয়ে পৌঁছেছে; না মার্কিন সরকার, না মার্কিন সামুদ্রিক গবেষক টিম। তাহলে কি ট্রাইএঙ্গেল তাদের গিলে ফেলেছে? নাকি ব্লেকলের অত্যাধিক যোগ্যতা দেখে 'গোপন শক্তি' তাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছে?

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময়, মার্চ ১৯১৮ তে মার্কিন সামুদ্রিক জাহাজ সাইক্লপসও (Cyclops U.S.A) ওই এলাকায় গায়েব হয়েছে।

সাইক্লপস

এই জাহাজে যুদ্ধকালীন ব্যবহারের জন্য সাড়ে চৌদ্দ হাজার টন মাল মজুদ ছিল। তাছাড়া তিনশত কর্মীও তাতে কর্মরত ছিল। এরও কোনো নাম-নিশানা পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় নি।

জাশোয়া স্লোকোম (Jashua Slocum) এমন এক ক্যাপ্টেন; শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সামুদ্রিক বিষয়ে সে সারাবিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছিল। বাল্যকাল থেকেই পানির সাথে খেলা করে বেড়ে ওঠে সে। ইতিহাস বলে, সেই প্রথম সমুদ্রপথে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিল। সর্বদা সামুদ্রিক ঝড় আর তুফান মোকাবেলা করাই যার অভ্যাস ছিল। ১৯০৯ সালে Spray নামক নিজস্ব জাহাজে করে রওয়ানা হয়েছিল। অতঃপর বারমুডার ওই ভয়ানক এলাকায় সে তার জাহাজসহ চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে যায়।

যাত্রী গায়েব কিন্তু জাহাজ উপকূলে, এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য? যদি আপনাকে বলা হয়—একটি জাহাজ বারমুডার সমুদ্র সীমানায় দাঁড়ানো, কিন্তু যাত্রী এবং ক্যাপ্টেন গায়েব! খাবারের টেবিলে এমনভাবে খাবার গুছিয়ে রাখা, দেখলে মনে হবে হাত ধোয়ার জন্য তারা উঠে গেছে। না আছে দুর্ঘটনার নিদর্শন, আর না আছে কোনো লুটপাটের আলামত। নীরব সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ খানাপিনা রেখে তারা কার মেহমান হয়ে গেছে? অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটি ঘটেছে 'কেরল ডিরিং' (Caroll Deering) নামক জাহাজের সাথে।

তীরে জাহাজের সম্মুখভাগ বালুতে গাড়া ছিল আর পেছনের অংশ ছিল পানিতে। খাবার টেবিলে খাবার রাখা ছিল। চেয়ারগুলি কিছু পেছনের দিকে ঝুঁকে ছিল। দেখে মনে হবে, যাত্রীরা অলৌকিক কিছু দেখে আপন আপন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছিল এবং পরে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা আর পারে নি।

চেয়ার টেবিলে খাবার আর ফল দেখে কোনো হাঙ্গামা বা দুর্ঘটনার নিদর্শনও বিলকুল উপলব্ধি হয় নি। জাহাজের অবস্থা দেখেও এ-কথা মনে হয় না যে, এখানে লুটপাট বা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। আশ্চর্যের বিষয়—এতবড় জাহাজকে তীরে কে আনল? আর যাত্রীরাই-বা কীরূপ দুর্ঘটনায় স্বীকার হলো?

হেরি কোনোভার (Herrey Conover)

প্রসিদ্ধ মার্কিন কোটিপতি, সুদক্ষ জঙ্গি পাইলট, সামুদ্রিক জাহাজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ক্যাপ্টেন। ১৯৫৮ সালে তার সাথিদের নিয়ে বারমুডার গভীরে গায়েব হয়ে যান; কিন্তু এইবার শুধু যাত্রীরাই নিখোঁজ হয়েছে। কেননা, পরবর্তী সময়ে তাদের জাহাজ ফ্লোরিডার সী-বিচ থেকে ৮০ মাইল উত্তরে যাত্রীবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। অতএব, এসব ঘটনায় কি রহস্য থেকে যায় না যে, এখানে কেন শুধু অভিজ্ঞ আর যোগ্য মানুষই গায়েব হচ্ছে?[৯৭]

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল নিয়ে অন্যদের বক্তব্য; সত্য ঢাকার অপচেষ্টা

সমালোচকরা বলে থাকেন, এই ত্রিভূজের ওপর দিয়ে মেক্সিকো উপসাগর থেকে উষ্ণ সমুদ্রস্রোত বয়ে গেছে। এই তীব্র গতির স্রোতই মূলত অধিকাংশ অন্তর্ধানের কারণ। এখানকার আবহাওয়া এমন যে, হঠাৎ করে ঝড় ওঠে আবার হুট করেই থেমে যায়, গ্রীষ্মে বিরাটাকার ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। বিংশ শতাব্দীতে টেলিযোগাযোগ, রাডার ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তি পৌঁছানোর আগে এমন অঞ্চলে জাহাজডুবি ছিল খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এই অঞ্চল বিশ্বের ভারী বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলকারী পথগুলোর অন্যতম। জাহাজগুলো আমেরিকা, ইউরোপ ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করত। এছাড়া এটি প্রচুর প্রমোদতরীর বিচরণ ক্ষেত্র। এ অঞ্চলের আকাশপথে বিভিন্ন রুটে বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত বিমান চলাচল করে। ত্রিভূজের বিস্তৃতির বর্ণনায় বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত দিয়েছেন। কেউ মনে করেন, এর আকার ট্রাপিজয়েডের মতো, যা ছড়িয়ে আছে ফ্লোরিডা, বাহামা এবং ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং ইশোর পূর্বদিকের আটলান্টিক অঞ্চল জুড়ে। আবার কেউ কেউ এগুলোর সাথে মেক্সিকো উপসাগরকেও যুক্ত করেন। তবে লিখিত বর্ণনায় যে সাধারণ অঞ্চলের ছবি ফুটে ওঠে, তাতে রয়েছে

---

৯৭ ক্রিস্টোফার কলম্বাসের লগবুক, লিজান ম্যাগাজিন, ১৯৬২; আমেরিকা; The deadly Bermuda, by-Vinsent gards; Roar media bangla; Wikipedia

ফ্লোরিডার আটলান্টিক উপকূল, পুয়ের্তোরিকো, মধ্য আটলান্টিকে বারমুডার দ্বীপপুঞ্জ এবং বাহামা ও ফ্লোরিডা স্ট্রেইটসের দক্ষিণ সীমানা।

ত্রিভূজ গল্পের ইতিহাস

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল বিষয়ে যারা লিখেছেন তাদের মতে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রথম এই ত্রিভুজ-বিষয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা লেখেন। তিনি লিখেছিলেন, তার জাহাজের নাবিকেরা এ অঞ্চলের দিগন্তে আলোর নাচানাচি এবং আকাশে ধোঁয়া দেখেছেন। এছাড়া তিনি এখানে কম্পাসের উল্টাপাল্টা দিকনির্দেশনার কথাও বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১ই অক্টোবর, ১৪৯২ তে তার লগবুকে লেখেন—

> 'The land was first seen by a sailor (Rodrigo de Triana), although the Admiral at ten o'clock that evening standing on
>
> the quarter-deck saw a light, but so small a body that he could not affirm it to be land; calling to Pero Gutiérrez, groom of the King's
>
> wardrobe, he told him he saw a light, and bid him look that way, which he did and saw it; he did the same to Rodrigo Sánchez of Segovia, whom the King and Queen had sent with the squadron as comptroller, but he was unable to see it from his situation. The Admiral again perceived it once or twice, appearing like the light of a wax candle moving up and down, which some thought an indication of land. But the Admiral held it for certain that land was near...'

বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত লগবুক পরীক্ষা করে যে মত দিয়েছেন তার সারমর্ম হলো—নাবিকেরা যে আলো দেখেছেন তা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ব্যবহৃত নৌকায় রান্নার কাজে ব্যবহৃত আগুন, আর কম্পাসে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল নক্ষত্রের অবস্থান পরিবর্তনের কারণে। ১৯৫০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর ই.ভি.ডব্লিউ.জোন্স (E.V.W. Jones) প্রথম এ ত্রিভুজ নিয়ে খবরের কাগজে লেখেন। এর দু বছর পর

ফেইট *(Fate)* ম্যাগাজিনে জর্জ এক্স.স্যান্ড (George X. Sand) 'সী মিস্ট্রি এট আওয়ার ব্যাক ডোর' ('Sea Mystery At Our Back Door') শিরোনামে একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। এ প্রবন্ধে তিনি ফ্লাইট নাইনটিন (ইউএস নেভির পাঁচটি 'টিবিএম অ্যাভেঞ্জার' বিমানের একটি দল—যা প্রশিক্ষণ মিশনে গিয়ে নিখোঁজ হয়)-এর নিরুদ্দেশের কাহিনি বর্ণনা করেন এবং তিনিই প্রথম এই অপরিচিত ত্রিভূজাকার অঞ্চলের কথা সবার সামনে তুলে ধরেন।

উপরের ব্যাখাটা খুবই হাস্যকর। কেননা, যেখানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্যাপ্টেন জাহাজ নিয়ে যেতে পারেন না সেখানে নৌকায় রান্নার আগুন দেখতে পাওয়া হাস্যকরই বটে।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ফ্লাইট নাইনটিন নিয়ে আমেরিকান লিজান *American Legion* ম্যাগাজিনে লেখা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই ফ্লাইটের দলপতিকে নাকি বলতে শোনা গিয়েছে

> We don't know where we are, the water is green, no white
>
> আমরা কোথায় আছি জানি না। সবুজ বর্ণের জল, কোথাও সাদা কিছু নেই।

এতেই প্রথম ফ্লাইট নাইনটিনকে কোনো অতিপ্রাকৃতিক ঘটনার সাথে যুক্ত করা হয়। এরপর ভিনসেন্ট গডিস (Vincent Gaddis) 'প্রাণঘাতী বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল' (The Deadly Bermuda Triangle) নামে আর এক কাহিনি ফাঁদেন ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। এর ওপর ভিত্তি করে তিনি আরও বিস্তর বর্ণনা সহকারে লেখেন *ইনভিজিবল হরাইজন* (*Invisible Horizons*) মানে 'অদৃশ্য দিগন্ত' নামের বই। আরও অনেক লেখকই নিজ নিজ মনের মাধুরী মিশিয়ে এ বিষয়ে বই লেখেন, এ-বিষয়ে বই লেখার তালিকায় যারা আছেন—জন ওয়ালেস স্পেন্সার, তিনি লেখেন *লিম্বো অফ দ্যা লস্ট* (*Limbo of the Lost*, 1969, repr. 1973), মানে 'বিস্মৃত অন্তর্ধান'; চার্লস বার্লিটজ (Charles Berlitz) লেখেন *দি বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল* (*The Bermuda Triangle*, 1974); রিচার্ড উইনার লেখেন *দ্যা ডেভিল্স ট্রায়াঙ্গেল* 'শয়তানের ত্রিভূজ' (*The Devil's Triangle*, 1974) নামের বই, এছাড়া আরও অনেকেই লিখেছেন। এরা সবাই

ঘুরেফিরে একার্ট (Eckert) বর্ণিত অতিপ্রাকৃতিক ঘটানাই বিভিন্ন স্বাদে উপস্থাপন করেছেন।

কুসচ (Kusche)-এর ব্যাখ্যা

লরেন্স ডেভিড কুসচ হলেন অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি-র রিসার্চ লাইব্রেরিয়ান এবং *দ্যা বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল মিস্ট্রি : সলভড (১৯৭৫)*-এর লেখক। তার গবেষণায় তিনি চার্লস বার্লিটজ (Charles Berlitz)-এর বর্ণনার সাথে প্রত্যক্ষ্যদর্শীদের বর্ণনার অসংগতি তুলে ধরেন। যেমন যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ থাকার পরেও বার্লিটজ (Charles Berlitz) বিখ্যাত ইয়টসম্যান ডোনাল্ড ক্রোহার্স্ট (Donald Crowhurt)-এর অন্তর্ধানকে বর্ণনা করেছেন রহস্য হিসেবে। আরও একটি উদাহরণ হলো—আটলান্টিকের এক বন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়ার তিন দিন পরে একটি আকরিকবাহী জাহাজের নিখোঁজ হবার কথা বার্লিটজ বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য এক স্থানে একই জাহাজের কথা বর্ণনা করে বলেছেন সেটি নাকি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি বন্দর থেকে ছাড়ার পর নিখোঁজ হয়েছিল। এছাড়াও কুসচ দেখান যে, বর্ণিত দূর্ঘটনার একটি বড় অংশই ঘটেছে কথিত ত্রিভূজের সীমানার বাইরে। কুসচ এর গবেষণা ছিল খুবই সাধারণ। তিনি শুধু লেখকদের বর্ণনায় বিভিন্ন দূর্ঘটনার তারিখ, সময় ইত্যাদি অনুযায়ী সে সময়ের খবরের কাগজ থেকে আবহাওয়ার খবর আর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংগ্রহ করেছেন—যা গল্পে লেখকরা বলেন নি। কুসচ-এর গবেষণায় যা পাওয়া যায় তা হলো—

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলে যে পরিমাণ জাহাজ ও উড়োজাহাজ নিখোঁজ হওয়ায় কথা বলা হয় তার পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় বেশি নয়। (তার এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা) এ অঞ্চলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় (tropical storms) নিয়মিত আঘাত হানে, যা জাহাজ ও উড়োজাহাজ নিখোঁজ হওয়ার অন্যতম কারণ; কিন্তু বার্লিটজ বা অন্য লেখকেরা এধরনের ঝড়ের কথা অনেকাংশেই এড়িয়ে গিয়েছেন।

অনেক ঘটনার বর্ণনাতেই লেখকেরা কল্পনার রং চড়িয়েছেন। আবার কোনো নৌকা নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দেরিতে বন্দরে ভিড়লে তাকে নিখোঁজ বলে প্রচার

করা হয়েছে। আবার কখনোই ঘটে নি এমন অনেক ঘটনার কথা লেখকেরা বলেছেন। যেমন—১৯৩৭ সালে ফ্লোরিডার ডেটোনা সমুদ্রতীরে(Daytona Beach) একটি বিমান-দূর্ঘটনার কথা বলা হয়; কিন্তু সেসময়ের খবরের কাগজ থেকে এ-বিষয়ে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় নি।

সুতরাং কুসচ-এর গবেষণার উপসংহারে বলা যায়, লেখকরা অজ্ঞতার কারণে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে বানোয়াট রহস্য তৈরি করেছেন।

অন্যদের প্রতিক্রিয়া

ফ্লাইট নাইনটিন (Flight 19) ফ্লাইট ১৯, ৫টি টিভিএম আভেঞ্জার টর্পেডো বোমারু বিমানের একটি, যেটি প্রশিক্ষণ চলাকালে ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়। বিমানবাহিনীর ফ্লাইট পরিকল্পনা ছিল ফোর্ট লডারদেল থেকে ১৪৫ মাইল পূর্বে এবং ৭৩ মাইল উত্তরে গিয়ে, ১৪০ মাইল ফিরে এসে প্রশিক্ষণ শেষ করা। বিমানটি আর ফিরে আসে নি। যদিও নেভি তদন্তকারীরা নেভিগেশন ভুলের কারণে বিমানের জ্বালানীশূন্যতাকে বিমান নিখোঁজের কারণ বলে চিহ্নিত করে।

বিমানটি অনুসন্ধান এবং উদ্ধারের জন্য পাঠানো বিমানের মধ্যে একটি বিমান পিবিএম ম্যারিনা ১৩ জন ক্রুসহ নিখোঁজ হয়। ফ্লোরিডা উপকূলে থাকা একটি ট্যাঙ্কার একটি বিস্ফোরণ দেখার রিপোর্ট করে ব্যাপক তেল দেখার কথা বলে, কিন্তু উদ্ধার অভিযানে এর সত্যতা পাওয়া যায় নি। দুর্ঘটনা শেষে আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ হয়ে ওঠে। সূত্রমতে, সমসাময়িককালে বাষ্প লিকের কারণে জ্বালানী-ভর্তি অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটার ইতিহাস ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-ইতিহাসে সবচেয়ে মারাত্মক (যুদ্ধ ছাড়া) ক্ষতি হচ্ছে ইউএসএস সাইক্লোপস নিখোঁজ হয়ে যাওয়া। অতিরিক্ত ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ভর্তি বিমানটি ১৯১৮ সালের ৪ মার্চ বার্বাডোস দ্বীপ থেকে উড্ডয়নের পর প্রথমে একটি ইঞ্জিন বিকল হয় এবং পরবর্তী সময়ে ৩০৯ জন ক্রুসহ নিখোঁজ হয়। যদিও কোনো শক্ত প্রমাণ নেই, তবুও অনেক কাহিনি শোনা যায়। কারও মতে ঝড় দায়ী, কারও মত ডুবে গেছে; আবার কেউ এই ক্ষতির জন্য শত্রুপক্ষকে দায়ী করে। উপরন্তু, সাইক্লপস-এর মতো আর দুইটি ছোট জাহাজ প্রোটিউস এবং নেরেউস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে নিখোঁজ হয়।

সাইক্লপসের মত এই জাহাজদুটিতেও অতিরিক্ত আকরিকে ভর্তি ছিল। তিনটি ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত মালামাল ধারণে অক্ষমতার (ডিজাইনগত) কারণেই জাহাজডুবি হয় বলেই ব্যাপক ধারণা করা হয়।

ডগলাস ডি সি-৩ (Douglas DC-3)

২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে একটি ডগলাস ডিসি-৩, ফ্লাইট নাম্বার NC16002, সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকো থেকে মিয়ামি যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। বিমান থাকা ৩২ জনসহ বিমানটির কোনো হদিস পাওয়া যায় নি। সিভিল এরোনটিক্স বোর্ড তদন্ত নথিপত্র থেকে বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার সম্ভাব্য একটি কারণ পাওয়া যায়, সেটি হলো—বিমানের ব্যাটারি ঠিকমতো চার্জ না করে পাইলট সান জুয়ান থেকে রওনা দেয়; কিন্তু এটার সত্যতা জানা যায় নি।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল নিয়ে যারা লিখেছেন

- Gian J. Quasar (2003). Into the Bermuda Triangle: Pursuing the Truth Behind the World's Greatest Mystery ((Reprinted in paperback (2005) আইএসবিএন ০-০৭-১৪৫২১৭-৬)
- International Marine / Ragged Mountain Press। আইএসবিএন 0-07-142640-X
- line feed character in, at position 57; Charles Berlitz (১৯৭৪). The Bermuda Triangle (1st সংস্করণ) Doubleday. আইএসবিএন 0-385-04114-4.
- Lawrence David Kusche (১৯৭৫). The Bermuda Triangle Mystery Solved। আইএসবিএন 0-87975-971-2.
- John Wallace Spencer (১৯৬৯) Limbo Of The Lost. আইএসবিএন 0-686-10658-X.
-

  David Group (১৯৮৪). The Evidence for the Bermuda Triangle. আইএসবিএন 0-85030-413-X.

- Daniel Berg (২০০০) Bermuda Shipwrecks.
  আইএসবিএন : 0-9616167-4-1

- Richard Winer (১৯৭৪). The Devil's Triangle.
  আইএসবিএন : 0553106880.

- Richard Winer (১৯৭৫) The Devil's Triangle 2.
  আইএসবিএন 0553024647

- Adi-Kent Thomas Jeffrey (১৯৭৫). The Bermuda Triangle. আইএসবিএন : 0446599611.[৯৮]

আকাশপথের দুর্ঘটনাসমূহ

১৯৪৫ : জুলাই ১০, টমাস আর্থার গার্নার, এএমএম৩, ইউএসএন, ১১ জন অন্য সদস্যসহ বারমুডা ট্রায়াঙ্গালে হারিয়ে যান। তারা ৯ জুলাই ১৯৪৫ তারিখ ৭ : ০৭ মিনিটে ব্যানানা রিভারের নাভাল এয়ার স্টেশন থেকে রওনা দেন। তাদের সর্বশেষ অবস্থান জানা যায় ১০ জুলাই ১৯৪৫ রাত ১ : ১৬-এ; কিন্তু তারপরে তাদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি।

১৯৪৫ : ডিসেম্বর ৫, ফ্লাইট ১৯ ১৪ জন লোকসহ হারিয়ে যায় এবং একই দিনে ১৩ জন লোকসহ ফ্লাইট ১৯-কে খুঁজতে গিয়ে পিবিএম মেরিনা হারিয়ে যায়।

১৯৪৮ : জানুয়ারি ৩০, আভ্রো টুডোর জি-এএইচএনটি স্টার টাইগার ৬জন সদস্য ও ২৫ জন যাত্রীসহ হারিয়ে যায়।

১৯৪৮ : ডিসেম্বর ২৮, ডগলাস ডিসি-৩ এনসিং৬০০২ তিনজন সদস্য ও ৩৬জন যাত্রীসহ হারিয়ে যায়।

---

৯৮ প্রয়োজনীয় আরও তথ্যসূত্রের জন্য দেখুন—Bermuda Triangle source page.

১৯৪৯ : জানুয়ারি ১৭, আভ্রো টুডোর জি-এজিআরই স্টার এরিয়েল সাতজন সদস্য ও ১৩জন যাত্রীসহ কিন্ডলে ফিল্ড, বারমুডা থেকে জ্যামাইকার দিকে রওনা দেওয়ার পরে হারিয়ে যায়।

১৯৫৬ : নভেম্বর ৯, মার্টিন মার্লিন ১০জন সদস্যসহ বারমুডা থেকে রওনা দিয়ে হারিয়ে যায়।

১৯৬২ : জানুয়ারি ৮, একটি ইউএসএএফ কেবি-৫০ ৫১-০৪৬৫ হারিয়ে যায়।[৯৯]

[৯৯] ক্রিস্টোফার কলম্বাসের লগবুক, লিজান ম্যাগাজিন, আমেরিকা, ১৯৬২; roar media, Bangla; The deadly Barmuda, by Vinsent girds.

[২৩]

ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল : বারমুডার সহোদর

আমরা অনেকেই বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে জানি; কিন্তু বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের মতোই রহস্যময় ও ভয়ানক সব ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থল জাপানের ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল। তবে এ ব্যাপারে জানা মানুষের সংখ্যা খুবই কম। জাপানের জনসাধারণের এ ব্যাপারে খুব ভালো করে জানা আছে এবং ওখানকার লোকদের ওপর ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল থেকে দূরে অবস্থান করার সরকারী আদেশ এখনো জারি আছে; কিন্তু জাপানের বাইরের লোকেরা এ ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না। অথচ বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের মতো এখানেও সামুদ্রিক জাহাজ, সাবমেরিন এবং উড়ন্ত জাহাজ গায়েব হওয়ার অনেক ঘটনা আছে এবং এখানকার গবেষকদের ধারণা, এখানকার গায়েব হওয়ার ঘটনা বারমুডা থেকেও বেশি। এখানেও যুগের অত্যাধুনিক জাহাজ-বিমান আর সর্বাধিক দক্ষ ব্যক্তিদের গায়েব করা হয়েছে। তবে এখানকার সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, এখানে গায়েব করা সামুদ্রিক জাহাজগুলির তালিকায় এমন সব জাহাজও বিদ্যমান যেগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পদার্থও ছিল।[১০০]

ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলের অবস্থান

এ এলাকা Pacific Ocean তথা প্রশান্ত মহাসাগর এরিয়ায় জাপান এবং ফিলিপাইনের সীমান্তে অবস্থিত। এ ট্রাইএঙ্গেল জাপানের উপকূলীয় শহর (Yokohama) 'ইয়োকোহামা' থেকে ফিলিপাইনের (guam) 'গুয়াম' থেকে আবার জাপানের 'মারিয়ানা' দ্বীপ পর্যন্ত এবং 'মারিয়ানা' থেকে 'ইয়োকোহামা' পর্যন্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা 'মারিয়ানা' দ্বীপ জয় করে নিয়েছিল।

---

১০০ mistry of the devil sea.

জাপানীরা এ এলাকাকে তাদের ভাষায় (ma-na Umi) বলে, যার অর্থ 'শয়তানের সমুদ্র'। বারমুডা এবং ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে গবেষণাকারীদের মধ্যে চার্লস ব্রিল্টাস হচ্ছেন অন্যতম। তিনি 'দি ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল' নামের একটি বইয়ে লেখেন—

'১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ওই এলাকায় জাপান সরকারের বড় বড় পাঁচটি সৈন্যবাহী জাহাজ গায়েব হয়েছে। সেনাবাহিনী গুম হয়েছে ৭০০-এরও উপরে। এ ঘটনার রহস্য যাচাই করার জন্য তখন জাপান সরকার একটি অত্যাধুনিক জাহাজে করে ১০০-এরও বেশি গবেষকের এক তদন্ত টিম পাঠায়; কিন্তু ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল রহস্য খুজতে গিয়ে তারাই নতুন রহস্য হয়ে যায়। এরপর থেকেই জাপান সরকার ওই এলাকাকে ভয়ানক এলাকা হিসাবে ঘোষণা করে।[১০১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামুদ্রিক যুদ্ধে জাপানকে তার পাঁচটি জঙ্গি বিমান ওখানে গায়েব হওয়ার খবর শুনতে হয়েছে। এছাড়াও ৩৪০টি জঙ্গি বিমান, ১০টি যুদ্ধজাহাজ, ১০টি নৌযান, ৯টি স্পীডবোট এবং ৪০০টি জঙ্গি ফাইটার ওই এলাকায় ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের সময় আপনি বলতে পারেন যে, শত্রুবাহিনীকর্তৃক এগুলো ধ্বংস হয়েছে। তারপরও কথা কিন্তু থেকে যায়, কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় গায়েব হওয়ার ঘটনাগুলো নিয়েও কী বলবেন?

গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এগুলো কোনো শত্রুবাহিনীর হাতে ধ্বংস হয় নি। এক গবেষকের বক্তব্য ছিল এরকম—

> 'It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war'.

---

১০১ কালের কণ্ঠ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

অর্থাৎ, এ-কথা অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ যে, এ জাহাজগুলি শত্রুদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কেননা, জাহাজগুলি সামুদ্রিক সীমানার ভেতরেই অবস্থান করছিল এবং যুদ্ধ শুরুর সময় ওখানে কোনো মার্কিন বা ব্রিটিশ জাহাজ ছিল না।

বারমুডা এবং ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে এতগুলি সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার পরও কি আমরা এ-কথা মানতে পারি যে, এগুলো শুধুই ঘটনাক্রমে হয়েছে? কখনো না! একজন প্রসিদ্ধ গবেষক চার্লস ব্রিল্টার্স বলেন[১০২] :

> 'The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles maynot be coincidental; since both areas are so similar, thesame phenomenon might bebehind the lost ships and planes'

অর্থাৎ, বারমুডা এবং ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলে রহস্যময় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলি এমনিতেই হতে পারে না। কারণ, উভয় এলাকা সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জাহাজ এবং বিমান গায়েব করার ক্ষেত্রে উভয় এলাকা একই অতীত বেছে নিয়েছে।

ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল-এ গায়েব হওয়া কিছু বিখ্যাত জাহাজ

KAIO MARO NO - 5

জাপানী পেট্রোলবাহী জাহাজ 'কায়মারো-৫' (kaio maro No-5)। এটি একটি বড় পেট্রোলবাহী জাহাজ, ৩১জন কর্মী ছিল। গায়েব হওয়ার সময় ৫০০টন পেট্রোল তাতে মজুদ ছিল। ৯জন বিজ্ঞানী/গবেষকও তাতে ছিল। হেডকয়ার্টারের সাথে তার সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২৪-০৯-১৯৫২। এরপর আর তার কোনো হদিস মেলে নি।

KOROSHIAMARO NO-2

জাপানী মালবাহী জাহাজ 'কোরোশিয়োমারো-২'। এটিও ছিল একটি বিশালাকৃতির মালবাহী জাহাজ। যাতে ১৫২৫ টন মাল মজুদ ছিল। একেও

---

[১০২] যুগান্তর, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সমুদ্র গিলে ফেলেছে, কোনো তথ্য পরবর্তী সময়ে পাওয়া যায় নি। এই জাহাজের সাথে সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২২-০৪-১৯৪৯ তারিখে।

জিরানিয়োম

ফ্রান্সিস জাহাজ 'জিরানিয়োম'। এই জাহাজ সর্বশেষ ২৪-১১-১৯৪৭ সালে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিল—'আবহাওয়া স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে'। এরপর ২৯জন কর্মীসহ জাহাজটিকে আর পাওয়া যায় নি।

মাছজোসার

সকল জাহাজ গায়েবের মধ্যে এটি ছিল অনেক অদ্ভুত এবং এর প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল। মালবাহী জাহাজ 'মাছজোসার'। এটি একটি লাইবেরিয়ান জাহাজ ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী এটি ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরই ছিল; কিন্তু হঠাৎ করেই জাহাজের চারপাশে আগুন জ্বলে ওঠে কিন্তু এ আগুন জাহাজ থেকে নয়, বরং পানি থেকে সৃষ্টি হয়ে জাহাজের দিকে আগাতে থাকে। অনেকেই এই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে ফেলেছিল—যাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, জাহাজের চারপাশে পানির উপরিভাগে আগুন। আশ্চর্যের বিষয়—জাহাজে বারুদ বা পেট্রোল জাতীয় কোনো পদার্থই ছিল না। এরচেয়ে আরও আশ্চর্যের বিষয়—জাহাজের চারপাশে বেষ্টনকারী আগুন ত্রিভুজাকৃতির ছিল। ওই জাহাজের আরোহী ছিল ১২৪ জন। এমন আরও অনেক জাহাজ গায়েব হয়েছে এই ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলে।

রাসায়নিক সাবমেরিন গায়েব

অনেকে বলতে পারেন জাহাজ গায়েব হওয়ার ব্যাপারে যে এটি ডুবে গেছে কিন্তু অত্যাধুনিক রাসায়নিক সাবমেরিন গায়েব হওয়ার ব্যাপারে কী বলবেন? যার মধ্যে ছিল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিশালী ওয়্যারলেস। আর সাবমেরিনগুলোও কোনো সাধারণ সাবমেরিন ছিল না, সেগুলো ছিল রাসায়নিক সাবমেরিন।[১০৩]

---

[১০৩] বেশতো, ২২ জুলাই, ২০১৭;

চলুন এখন কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা জানা যাক—

রাসায়নিক সাবমেরিন ভেক্টর-১

এটি ছিল একটি অত্যাধুনিক রাসায়নিক সাবমেরিন। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এটি কর্মীসহ গায়েব হয়ে যায়। তবে এর ভেতর থাকা কর্মীর সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

রাশিয়ান সাবমেরিন এঁকো-১

প্রথম সাবমেরিন গায়েব হওয়ার ঠিক পাঁচ মাস পরেই সেপ্টেম্বর মাসে উপকূল থেকে ৬০ কি.মি. দূরে রাশিয়ান সাবমেরিন এঁকো-১ হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যায়।

রাশিয়ান সাবমেরিন এঁকো-২

জানুয়ারী ১৯৮৬-তে এটাও গায়েব হয়ে যায়। এটিও একটি রাসায়নিক সাবমেরিন ছিল।

রাশিয়ান সাবমেরিন জুলফে-১

এপ্রিল ১৯৬৮ তে গায়েব হয়েছে। কর্মীদের সংখ্যা ৮৬ জন।

ফ্রান্সিস সাবমেরিন চার্লি

রাসায়নিক সাবমেরিন। সেপ্টেম্বর ১৯৮৪-তে ৯০জন কর্মচারীসহ ওই এলাকায় গায়েব হয়ে যায়।

ব্রিটিশ সাবমেরিন কেস্ট্রল

নভেম্বর ১৯৮৬ তে সকল কর্মচারীদের নিয়ে গায়েব হয়ে যায়।

ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেলে গায়েব হওয়া বিমান

মার্চ ১৯৫৭, দশ দিনের ভেতরে তিন মার্কিন জঙ্গি বিমান পাইলটসহ গায়েব হয়ে গেছে। পরবর্তী সময়ে না এদের কোন নাম-নিশানা পাওয়া গেছে, না পাইলটের কাছ থেকে কোনো আবহাওয়া গোলযোগের বার্তা পাওয়া গেছে। বিমানগুলো ছিল যথাক্রমে JD-1, KB-50, C-97। এছাড়া জাপানি জঙ্গি বিমান P-J2 ১৬ জুলাই ১৯৭১ সালে গায়েব হয়েছে। কোনো বার্তা প্রেরণে সক্ষম হয় নি। পরবর্তী সময়ে ২৭ এপ্রিল ১৯৭১ জাপানেরই আরও একটি জঙ্গি বিমান P2V-7 গায়েব হয়। এর দুই মাস পর আবার জাপানি ট্রেনিং বিমান IM-1 গায়েব হয়।

JA-341 যাত্রীবাহী বিমান (যাতে সাংবাদিকদের একটি টিমও ছিল) ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। এটি পূর্বে গায়েবকৃত মার্কিন ক্যালিফোর্নিয়ামারো নামক জাহাজের তদন্তের জন্য যাচ্ছিল। গায়েব হিয়ে যাওয়া জাহাজের তদন্ত দূরে থাক; বরং দুনিয়াকে তারা নিজেদের তদন্তে লাগিয়েছে গেছে।

উপর্যুক্ত ঘটনাবলির বিশ্লেষণে বলা যায়, বারমুডা ট্রায়াঙ্গেলের মতো ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেলকেও ইলুমিনাতি তাদের সেকেন্ড হেডকোয়ার্টার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশ্লেষণে আরও জানা যায়, শুধুমাত্র রাসায়নিক বা পারমাণবিক কাচামাল-সমৃদ্ধ জাহাজ এবং সাবমেরিনগুলোই এখানে হারিয়েছে। তাছাড়া দক্ষ নাবিক এবং দক্ষ পাইলটরাই বিভিন্ন সময়ে এখানে গায়েব হয়েছে কোনোরকম পূর্বভাস বা পূর্ব-যোগাযোগ ছাড়াই। ধারণা করা হয়, মূলত রাসায়নিক জিনিসগুলো ইলুমিনাতি তাদের অস্ত্র ভান্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য। দক্ষ নাবিক ও যোগ্য পাইলটদের মেধাশক্তি ও প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য নিজেদের দলে টেনে নিয়েছে।[১০৪]

---

১০৪ 5- The Dragon Try engel, by- Charles Brilstars

[২৪]

জেরুজালেমের উত্থান এবং সুপারমুন

কিছু দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঐতিহাসিক শহর জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করেছে। এই ঘটনা মুসলিম উম্মাহর জন্য বিরাট তাৎপর্য বহন করে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সম্পর্কে ভবিষৎবাণী করেছেন।

আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> যখন জেরুজালেমের উত্থান হবে এবং মদিনার পতন হবে, তখন আসবে মহাযুদ্ধ। তা হবে এমন যুদ্ধ যাতে শতকরা ৯৯ জন মৃত্যুবরণ করবে'।[১০৫]

প্রাণপ্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের ভবিষৎবাণী সত্য হতে চলেছে। মদিনার বিনাশ বলতে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে মদিনা অগুরুত্বপূর্ণ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। আর বিশ্বরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে এই শহরের অবস্থানকে বোঝানো হয়েছে। গত কয়েকবছর ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী করা সবগুলি শহর বা অঞ্চল বর্তমানে রাজনৈতিক আলোচনার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। শাম, খোরাসান, ইয়ামেন, হিন্দুস্তানের পর গুরুত্ববহ শহর জেরুজালেমও লাইমলাইটে চলে এসেছে।

মুসলিম উম্মাহর জন্য ৬ই ডিসেম্বর একটি হৃদয়বিদারক দিন। আজ থেকে ২৭ বছর আগে এই দিনে হিন্দু মুশরিককর্তৃক বাবরি মসজিদ শহিদ হয়েছিল। এই দিনেই মুসলিম উম্মাহর প্রথম কেবলা কাফেরদের স্বীকৃতির মাধ্যমে হাতছাড়া হলো। পৃথিবীর ইতিহাসে জেরুজালেম এক বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ শহর। জেরুজালেমকে কেন্দ্র করেই পৃথিবীর ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। জেরুজালেমকে বলা হয় পৃথিবীর পবিত্র নগরী বা পবিত্রভূমি। আল্লাহ্ তাআলা জেরুজালেমে এত সংখ্যক নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন যা আর

---

১০৫ মুসনাদে আহমাদ: ২১৯২২

কোনো শহরে, নগরে বা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রেরণ করেন নি। বনি ইসরাইলের প্রায় সকল নবীগণকেই আল্লাহ্ তাআলা জেরুজালেম শহরে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বনি ইসরাইলকেই (ইহুদিদের) এই জেরুজালেম নগরী বা পবিত্রভূমি দান করেছিলেন। শর্ত দিয়েছিলেন, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে; কিন্তু বনি ইসরাইল বার বার আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করেছে। পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে। আল্লাহর প্রেরিত নবী ও রাসুলগণকে অমান্য করেছে, এমনকি তাদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিস্বরূপ এই পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কার করেছেন।

যখনই ইহুদিরা নিজেদের চরিত্র সংশোধন করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়েছে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে আবার এই পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিয়েছেন। আবার যখন আল্লাহর আদেশ নিষেধ অমান্য করেছে, পৃথিবীতে ফিতনা ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেছে তখনই আল্লাহ তাআলা পবিত্রভূমি থেকে তদেরকে বহিষ্কার করেছেন। সর্বশেষ যখন ইহুদিদেরকে তাঁদের কৃতকর্মের দরুন পবিত্রভূমি থেকে বহিষ্কার করা হয় তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ইহুদিরা আর পবিত্রভূমিতে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না; যতক্ষণ না ইয়াজুজ-মাজুজকে বন্ধনমুক্ত করে দেওয়া হয় এবং ইয়াজুজ-মাজুজ তাদেরকে শেষবারের মতো পবিত্রভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। তারপর তারা আবার আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধাচারণ করবে, পৃথিবীতে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। ফলস্বরূপ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে পবিত্রভূমি থেকে চিরতরে বহিষ্কার করবেন এবং পৃথিবী থেকে ইহুদিদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেবেন। ইহুদিদের এই ধ্বংস ঘটবে এক মুসলিম বাহিনীর হাতে, যারা বের হয়ে আসবে ঐতিহাসিক খোরাসান অর্থাৎ, বর্তমান আফগানিস্তান থেকে। ইনশা আল্লাহ অচিরেই এই কালোপতাকার বাহিনী পবিত্র শহর 'জেরুজালেমে' কালেমার পতকা উড়াবে।

আল্লাহ তাআলা অভিশপ্ত ইহুদিদের কয়েকবার জেরুজালেম থেকে বহিষ্কার করেছেন পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায়, ইহুদিদের চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসরাইলে একত্র করেছেন।

জায়োনিস্ট সংঘটন ইলুমিনুতির কুখ্যাত ট্রাম্পকে নির্বাচিত করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, দাজ্জালের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। এই ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করা দাজ্জালের আগমনের ক্ষেত্র তৈরির উদ্দেশ্যে 'গ্রেটার ইসরাইল' গঠনের শেষ এবং চূড়ান্ত ধাপ। ইহুদিরা বিশ্বাস করে তাদের

মাসিহ দাজ্জাল সমগ্র পৃথিবী শাসন করবে, তাই তার আগমনের সহায়ক দুনিয়া প্রস্তুত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। যারা শেষ জামানা এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদিস অধ্যয়ন করলে জানা যায়, দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। দাজ্জালের আগমনের কয়েকবছর পূর্বে ইমাম মাহদির আগমন ঘটবে। তিনি কাফের দাজ্জালের সাজানো বাগান ছিন্নভিন্ন করে দেবেন তাই হয়তো দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে (আল্লাহই ভালো জানেন)।

সুপারমুন

অন্যদিকে গত ২১শে জানুয়ারি ২০১৯ এবং এর আগে ৩ই ডিসেম্বর ২০১৬ পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে আশ্চর্য সুপারমুন। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন 'সুপারমুনের' সাথে জেরুজালেম স্বীকৃতির কী সম্পর্ক? যারা 'ইহুদিদের চক্রান্ত' বা ৪৩টি প্রটোকলের ব্যাপারে জানেন তাদের কাছে এটা বিস্ময়কর কিছু নয়। অভিশপ্ত ইহুদিরা 'সুপারমুনকে' তাদের মাসিহার আগমনের আলামত মনে করে। তারা বিশ্বাস করে 'বড় চাঁদ' তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

কেয়ামতের ছোট আলামতগুলোর অন্যতম হচ্ছে চাঁদকে বড় দেখা যাওয়া। গত কয়েকবছর ধরে ঈদের চাঁদ লক্ষ্য করলে এই আলামতটি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। আগে যেখানে ঈদের চাঁদ খালি চোখে দেখতে কষ্ট হতো সেখানে কয়েক বছর ধরে একদিনের চাঁদকে দুই-তিনদিনের বয়সী চাঁদ মনে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> 'কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলামত হচ্ছে, চন্দ্র মোটা হয়ে উদিত হবে। বলা হবে এটি দুই দিনের চাঁদ'।[১০৬]

হঠাৎ পৃথিবীর সামনে দৃশ্যমান এই 'সুপার মুন' বড় চাঁদের এই হাদিসটিকেই ইংগিত করে। সুপারমুন বা পূর্ণচন্দ্র স্বাভাবিকের তুলনায় .১৪ গুণ বড় আর ৩০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল চাঁদ। ২১শে জানুয়ারির এই সুপারমুন এ-বছরের প্রথম এবং ৩ই ডিসেম্বরের 'সুপারমুন' গত বছরের প্রথম ও শেষ 'সুপারমুন'। শেষবার 'সুপারমুন' দেখা যায় ২০১৬ সালের ১২ ডিসেম্বর। পর পর তিন বছরই পৃথিবীর মানুষ দেখতে পেয়েছে এই সুপারমুন। ২০১৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ সালের ১৪ই নভেম্বর এবং ৩রা ডিসেম্বর দেখা মিলেছে সুপারমুনের এবং সর্বশেষ এ-বছরের ২১শে জানুয়ারি দেখা মিলেছে সুপারমুনের।

---

১০৬ সহিহুল জামি আস-সাগির : ৫৭৭৪

বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন, ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বরের পর ২০৩৪ সালের নভেম্বর মাসে চাঁদ পৃথিবীর এত কাছে আসবে; কিন্তু বছর না যেতেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে আবার সুপারমুনের আগমন কী আলামত বহন করে?

৬৮ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চাঁদ বা সুপারমুন দেখল বিশ্ববাসী। সর্বশেষ ১৯৪৮ সালে এ-ধরনের সুপারমুনের দেখা মিলেছিল। ২০৩৪ সালের আগে আবার এ ধরনের সুপারমুনের দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে নাসার বিজ্ঞানীরা (আল্লাহই ভালো জানেন)।

জেগে ওঠেন

১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণার ৫০ বছর পর ১৯৬৭ সালে ছয় দিন যুদ্ধের মাধ্যমে জেরুজালেম দখলের ঠিক ৫০ বছর পর ২০১৭ জেরুজালেম ইজরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন অবশ্যই উম্মাহর স্বপ্নের নায়ক ইমাম মাহদির আগমনের আলামত প্রকাশ করে। অবাক করা বিষয় হলো, সুপারমুনের ঘটনার সময়ই তারা এই ঘোষণা করল। এই ঘটনা ইলুমিনাতির মহা পরিকল্পনার একটি অংশ—যা তারা লম্পট ট্রাম্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে।

প্রিয় ভাই, সমগ্র বিশ্বের ইহুদি, নাসারা এবং মুশরিকরা এক হয়েছে ইসলামের নাম পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে ফেলতে। উম্মাহর প্রথম কেবলা এখন ইহুদিদের রাজধানী। অচিরেই তারা 'বায়তুল মাকদিস' ধ্বংস করে তাদের মাসিহের আবাসস্থান সুলেমানি হাইকেল তৈরি করবে। ইতোমধ্যেই হাইকেলে সুলেমানি তৈরির সমস্ত সরঞ্জাম তারা জেরুজালেমে একত্রিত করেছে। হে উম্মাহ, খেলা আর হিন্দি সিরিয়ালে বিভোর না থেকে জেগে ওঠেন! এগিয়ে যান! ইমাম মাহদির দলে শরিক হতে নিজেকে প্রস্তুত করেন! সময় অতি অতি সন্নিকটে...[১০৭]

---

১০৭ বিবিসি নিউজ, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮. সামহোয়্যার ব্লগ, সাজ্জাদ খান, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭

[২৫]

ইলুমিনাতির স্বপ্নভূমি : পরবর্তী সুপার পাওয়ার ইসরাইল

বিশ্বমানচিত্রে ইসরাইল নামক বিষ ফোঁড়াটির কীভাবে আবির্ভাব ঘটে—এটা আমরা সবাই জানি; কিন্তু কেন ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো? শুধুই কি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের জন্য একটা ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা? নাকি এর পেছনে ছিল আরও বড় কোনো মাস্টারপ্লান?

আমেরিকা বর্তমান সুপার পাওয়ার। আমেরিকার রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামরিক সেক্টরে ইহুদিরা প্রভাব বিস্তার করে আছে। একারণে আমেরিকার মন্ত্রী মিনিস্টাররা ইসরাইলবিরোধী কোনো কথা সহ্য করতে পারেন না। তাদের পলিসি হচ্ছে, ইসরাইল ফার্স্ট, আমেরিকা সেকেন্ড। যদিও ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতি হলো, আমেরিকা ফাস্ট : লেট মেক দ্য আমেরিকা গ্রেট এ্যাগেইন। আমেরিকার জনগণের ট্যাক্স থেকে প্রতি বছর ১৫-২৫ বিলিয়ন ডলার ইসরাইলের কাছে যায় এবং ব্যাপারটা একটা ওপেন সিক্রেট। ইসরাইলের কাছে যত অত্যাধুনিক অস্ত্র আছে তার ইন্টেলিজেন্স সাপ্লাই করে আমেরিকার মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স। একটা পিচ্চি দেশ হয়েও ইসরাইল এর কাছে ২০০-র মতো পারমাণবিক বোমা আছে, তাও আবার ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল—যা দূরের কোনো দেশকেও অনায়াসে আঘাত করতে পারে। ইসরাইলের ভাড়াটে গুন্ডার মতো আমেরিকা মিডলইস্ট-এ মুসলিম নিধন করে যাচ্ছে। সামনে ভিকটিম হয়তো মিশর। শুরু থেকেই আমেরিকা-ইউকে ইসরাইলি এজেণ্ডা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ন্যাটো হচ্ছে ইসরাইলের পাহারাদার। এরা পাপেট হিসেবে কাজ করছে আর সুতা নাড়ছে জায়নিস্টরা; যাদের হাত ধরেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর এর ফলে ইসরাইল নামক রাষ্ট্রের আবির্ভাব।

কী হতে পারে সেই এজেণ্ডা? কেন ইসরাইলের প্রতিবেশী দেশগুলো একটার পর একটা ঝরে পড়ে যাচ্ছে? কেনই-বা ইসরাইলের সাথে আরবদেশগুলোর শান্তি চুক্তি? তথাকথিত জিহাদি গ্রুপগুলো কেন ইসরাইলকে আক্রমণ করে না?

যেখানে ইহুদিরা হচ্ছে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু। ইসরাইল শুধু দর্শক হিসেবে খেলা দেখছে। আমেরিকা তাদের হয়ে খেলছে; কিন্তু একসময় ঠিকই মাঠে নামবে ইসরাইল। পাকা খেলোয়াড়রা যা করে আরকি। তত দিনে আরববিশ্বের যা হওয়ার—তা হয়ে গেছে।

ইহুদিরা বহু বছর ধরে বিভ্রান্তিতে আছে যে, তারা সৃষ্টিকর্তার মনোনীত শ্রেষ্ঠ জাতি। সৃষ্টিকর্তা তাদের কথা দিয়েছেন, নীলনদ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত ভূমি তাদের। তাদের তথাকথিত মসিহ (দাজ্জাল) আসবেন এবং জেরুজালেম থেকে পুরো বিশ্ব শাসন করবেন এবং তাদের সেই স্বর্ণালী দিন ফেরত আসবে—যেমনটা ছিল নবী সুলায়মান আলাইহিস সালামের সময়। যখন তিনি ছিলেন বনি ইসরাইলের রাজা এবং জেরুজালেম থেকে পুরো বিশ্ব তিনি শাসন করতেন। মজার বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাওরাত বা জাবুরের কোনো জায়গাতেই এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেন নি বনি ইসরাইলকে। তারা নিজেরাই কারচুপি করে এটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

Greater Israel Project সম্পর্কে আমরা কমবেশি অনেকেই জানি। ইসরাইল তার সীমানা অবৈধভাবে বিস্তীর্ণ করতে চায়। ফিলিস্তিনের পরিস্থিতি দেখলে এটা ঠাওর করা যায়। ট্রাম্পের জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা দেওয়ার ঘটনায় জাতিসংঘে আমেরিকার ভরাডুবি হয়েছে। তবে আসল কথা হলো, পর্দার ওপারে জায়নিস্টদের রিঅ্যাকশন কী। তারা কি এটাই চেয়েছিল যে, জাতিসংঘে সুপার পাওয়ার আমেরিকার জুতাপেটা হোক! মালদ্বীপের মতো ছোট রাষ্ট্র আমেরিকার বিপক্ষে যাক? ভরাডুবি হোক ওয়ার্ল্ড ডমিনেন্ট মিলিটারি, ইকোনমিক সুপার পাওয়ার আমেরিকার; যে ন্যাটোর সবচেয়ে শক্তিশালী মেম্বার? হতেও পারে। অনেকে জেরুজালেম বিষয়ে জাতিসংঘে ভোটে হেরে যাওয়ার পর ১ নম্বর বিশ্বশক্তি হিসেবে আমেরিকার পতনের দিন গণনা শুরু হয়েছে বলে মনে করেন। সুপার পাওয়ার পজিশন থেকে নামতে হলে আমেরিকার অর্থনৈতিক পতন এবং সামরিক দিক দিয়ে কোনো যুদ্ধে লজ্জাজনক পরাজয় দরকার। আপনারা জানেন, ২০০৮ সালে ডলার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল। অক্সিজেন সিলিন্ডারে টিকে আছে এখন পর্যন্ত; কিন্তু আর কয়দিন? আফগানিস্তানে তালেবানদের হাতে মার খাচ্ছে বিগত ১৬ বছর যাবত। আমেরিকার মিডিয়াগুলো স্বীকার করে নিয়েছে, তালেবানরা আগের চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং ২০০১ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত তালেবানরা তাদের চেয়ে বেশি অঞ্চল তাদের দখলে রেখেছে। আমেরিকান

মিডিয়া নিজেই বলছে, আফগানিস্তানে আমেরিকা কী চায়—তা তারা নিজেরাই জানে না। সামনে হয়তো এরচেয়েও বড় সামরিক পরাজয় আসবে। নেক্সট সুপার পাওয়ার যে হবে সে আরবের তেলের কব্জা করার জন্য মহাযুদ্ধে নামবে। এখন মিডল ইস্ট-এর তেল আমেরিকার নিয়ন্ত্রণে আছে, এবং আমেরিকার ইকোনমি এই পেট্রো ডলারের জন্যই টিকে আছে। ডলার নামক তাসের ঘরের বর্তমানে নড়বড়ে অবস্থা। আমেরিকা যে কোনো সময় তার সুপার পাওয়ার হারাবে সেটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

আরবের তেলের খনির জন্য এই মহাযুদ্ধ হতে পারে। সহিহ হাদিসে আছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> একটা যুদ্ধ হবে ফোরাত নদীর নিচে থাকা স্বর্ণের জন্য। সেই যুদ্ধে প্রতি ১০০ জনের ৯৯ জন মারা যাবে; সবাই বলবে আমি হবো সেই একজন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন, আমার উম্মতের কেউ এই যুদ্ধে শরিক হবে না।[১০৮]

হাদিসে মালহামা নামে এই যুদ্ধ পরিচিত। উল্লেখ্য, ফোরাত নদীর নিচে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ তেলের রিজার্ভ আছে।

পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া ৯৯% হতাহত হয় না। নেক্সট সুপার পাওয়ার হওয়ার লড়াইয়ে এমন একটা যুদ্ধ হবে যা আগে কখনো দেখে নি মানুষ। আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই বিশ্বমোড়লে পরিণত হয়। এর আগে ছিল ব্রিটেন।

একটা বড় যুদ্ধ হওয়ার জন্য চাই বড় একটা উসিলা। আপনার আসল উদ্দেশ্য সেই উসিলার নিচে ঢাকা পড়বে। অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। এটাও একটা প্রভেন ফর্মুলা। ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যাবে, ১ম বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্চদুকে ফ্রেঞ্জ ফারডিনান্ড কর্তৃক গুপ্তহত্যা। এটা ছিল বাহ্যত কারণ; কিন্তু তাদের আসল টার্গেট ছিল আরও বড়। তা হলো, উসমানি খিলাফতের পতন। খিলাফতকে খণ্ড-বিখণ্ড করা। খিলাফত শাসন থাকা অবস্থায় ইসরাইল নামক রাষ্ট্র তৈরি ছিল অসম্ভব। তাহলে সামনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি একই ফর্মুলার ওপর ভর করে হবে? কে হবে

---

১০৮ সহিহ বুখারি : ৭১১৯; সহিহ মুসলিম ২৮৯৪; সুনানু আবি দাউদ : ৪৩১৩

ষড়যন্ত্রকারীদের বলি? আর তাদের আসল টার্গেট কী হবে? আমার মনে হয়, ট্রাম্প হবে এর বলি। ইলুমিনাতি অনেক আগেই এটার সাইন দিয়ে দিয়েছে। আর আসল টার্গেট হবে আমেরিকার পতন আর নতুন সুপার পাওয়ার হিসেবে ইসরাইলের আত্মপ্রকাশ। ওয়েট এন্ড সি...।

কে হবে নেক্সট সুপার পাওয়ার?

নেক্সট সুপার পাওয়ার যে দেশ হবে সেই দেশ অবশ্যই কোনো বড় যুদ্ধে বিজয়ী হবে। এটা প্রুভেন ফরমুলা। বিশ্ব-অর্থনীতিও সেই দেশটি কব্জা করবে। সামরিক দিক থেকেও সে হবে অপ্রতিরোধ্য। এখন দেখার বিষয়, ফ্রন্ট রানারে কারা আছে। রাশিয়া আর চায়নার কথাই মাথায় আসে প্রথম। এই বিশ্বের অধিকাংশ সম্পদ যাদের দখলে, যারা পলিসি মেকার তাদের হাতেই ট্রিগার। তারা যা বলে তাই হবে। তারা যদি বলে ইসরাইল হবে নেক্সট সুপার পাওয়ার, তাহলে সেটাই। এটার রোড ম্যাপ তারা বহু বছর আগেই তৈরি করে রেখেছে। কীভাবে ডলার হবে পুরো দুনিয়ার রিজার্ভ কারেন্সি, পুরো দুনিয়ার তেল ডলার ছাড়া আর কোনো মুদ্রায় কিনতে পারবে না, ডলার রিড্যাম করে স্বর্ণ নিতে পারবেনা, মুদ্রাস্ফিতি এবং শেষ পর্যন্ত ডলারের এবং IMF এর কবর রচনা। এরপর নতুন অর্থনৈতিক নিয়ম, নতুন কারেন্সি সব আগে থেকেই প্রি-প্লানড। এই সব দাজ্জালি ফিতনায় ব্যস্ত রেখে তারা তাদের নিজের মতো করে দুনিয়া সাজাচ্ছে, যা New World Order নামে পরিচিত। তারা যেভাবে চায় সেভাবে আপনাকে কন্ট্রোল করতে পারে। বর্তমান দাজ্জালি ব্যাংকিং-ব্যবস্থাই ধরেন। ব্যাংকের লোন পরিশোধ করে শেষ করতে পারছেন না, নিজের আর সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার সময় কই।

হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

> দাজ্জাল দুনিয়া শাসন করবে ৪০ দিন। এর একদিন হবে একবছরের মতো, পরের দিন হবে ১ মাসের মতো, তৃতীয় দিন হবে ১ সপ্তাহের মতো আর বাকি দিনগুলো হবে আমাদের সময়ের মতো।[১০৯]

---

১০৯ সহিহ মুসলিম : ২৯৩৭; সুনানু আবি দাউদ : ৪৩২১

তার মানে, দাজ্জাল আমাদের টাইম আর স্পেসেই থাকবে এবং আমরা তাকে দেখতে পারবো। মানে এখনো দাজ্জালের শিকল আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা খুলে দেন নি। তাহলে এই এক বছর, এক মাস, এক সপ্তাহ শাসন করার মানে কী। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, দাজ্জালের ১ম দিন ১ বছর, এটা হতে পারে ব্রিটেনের শাসন। এরপর এক দিন এক মাস শাসন হতে পারে আমেরিকার সুপার পাওয়ার পজিশনে থাকার টাইম লাইন। আর এক দিন এক সপ্তাহ হতে পারে ইসরাইলের নেক্সট পাওয়ার হয়ে দুনিয়ায় গুন্ডামি করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> স্বরণ করো সেই সময়ের কথা, যখন অবিশ্বাসীগণ তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তোমাকে বন্দি করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। আল্লাহও কৌশল গ্রহণ করেছিলেন এবং কৌশলকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।[১১০]

ঘুরে ফিরে একটা দেশের নামই আসে, ইসরাইল। যেখানেই অশান্তি সেখানেই ইসরাইল। এমনকি bitcoin-এর প্রথম লেনদেন যেই দুই ব্যক্তির মাঝে হয়, তার একজন ইহুদি। নাম, ফিনেয়। bitcoin হচ্ছে ক্রিপ্টো কারেন্সি। মানে ইনভিজিবল মানি—যা দেখা যায় না। মুখে মুখে থাকবে শুধু। অনেকে বলছে ক্রিপ্টো কারেন্সি হবে ফিউচার অফ কারেন্সি, মানে লেনদেনের জন্য পেপার মানি আর ব্যবহার হবে না, ডিজিটাল মানি দিয়ে করতে হবে। মানে আপনার সব উপার্জন ব্যাংকের কাছে হাওলাত থাকবে। তখন আপনার মানিব্যাগে থাকা ১০০০ টাকার নোটটা শুধুই একটা কাগজ ছাড়া আর কিছুই না। এটাকে ওয়াল পেপার হিসেবে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারেন। এভাবেই আপনাকে কন্ট্রোল করা হবে। যে-কোনো সময় আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হবে। আপনার মুখে দাড়ি বা পরনে সুন্নতি পোশাক থাকলে তো 'কাজই হইছে'।

নেতানিয়াহু কিছুদিন আগে বলেছে—ক্রিপ্টো কারেন্সিতে ইসরাইল অনেক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান চালু করে ফেলেছে। ইসরাইল এই ক্ষেত্রে পাইওনিয়ার হতে চায়। দুনিয়ার কোনো নেতার এই নিয়ে মাথাব্যথা নেই, আর ইসরাইল

---

[১১০] সূরা আনফাল, আয়াত : ৩০

bitcoin নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করছে। সে এটাও বলেছে, বর্তমান ব্যাংকিং-ব্যবস্থা বেশিদিন টিকবে না।[১১১]

[১১১] বিবিসি নিউজ, ৩১ জানুয়ারি ২০১৮; সামহোয়্যার ব্লগ, সাজ্জাদ খান, ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

[২৬]

ইসরাইল; দ্য স্টেট অব গড

ইলুমিনাতির ওয়ান ভিলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় ধাপ শেষ হবে ইহুদি জাতিকে অন্য জাতিসমূহের ওপর আধিপত্য অর্জন করানোর মাধ্যমে। আগেই বলা হয়েছে, একটি যুদ্ধ সংঘটিত হবে যার মাধ্যমে ইহুদিপন্থী জাতিসমূহ বিজয়ী হবে। এই মহাযুদ্ধ ইসরাইল এবং বিপক্ষ শক্তিগুলোর মাঝে সংঘটিত হবে, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নামে পরিচিতি পাবে। এতে ইহুদিরা বিজয়ী হবে; কিন্তু অবশিষ্ট সকল জাতির ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্য অর্জনের জন্য একটি যুদ্ধ জয়ই যথেষ্ট নয়। নিজেদের আধিপত্য নিশ্চিত করতে ইসরাইলিদের কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে—

- প্রথমত : ইজরাইলি জাতির ভেতর ইহুদি ধর্মের সত্য ও ন্যায়ের মূলনীতিগুলো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। লক্ষণীয় যে, তালমূদে শুধু ইহুদিদের আভ্যন্তরীণ সদাচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ সদাচার বা শান্তির বানীসমূহ অ-ইহুদিদের প্রতি অবশ্য পালনীয় নয়।

- দ্বিতীয়ত :সমগ্র ইহুদি জাতিকে মোজেসের[১১২] অনুসারী হিসেবে এক বিন্দুতে নিয়ে আসতে হবে। এটা করা গেলে, তারা মোজেসের সময়ের মতো হেঁটে হেঁটে নীলনদ পাড়ি দিতেও সক্ষম হবে।

- তৃতীয়ত : ইসরাইলকে সারা বিশ্বের বিজ্ঞান আর শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে হবে। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সঙ্গীত ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইহুদিদের অবদান রাখতে হবে।

- চতুর্থত : ইসরাইলের একক শক্তি হিসেবে তাদের ভেতরের অর্ন্তদ্বন্দ লোপ করতে হবে এবং সমস্ত ইসরাইলি নেতাকে একত্র হয়ে পরবর্তী সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অর্থাৎ তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ঐক্যে

---

112 মোজেস : হিব্রু ভাষায় হজরত মূসা আলাইহিস সালামের নাম।

অর্জন করতে হবে। যেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কোনো বিরোধীপক্ষ ইহুদিদের ভেতরে না থাকে।

- পঞ্চমত ইসরাইলই একমাত্র ধর্ম হিসেবে একত্ববাদ এবং পবিত্র গ্রন্থের কথা বলবে। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে এসে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল কাঠামো ভেঙে দিতে হবে।

যখন ইজরাইল জাতি এই সকল নির্দেশনা মেনে বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধে পরাজিত করতে সমর্থ হবে তখন পৃথিবীর বুকে অন্য কোনো রাষ্ট্রের পতাকা থাকবে না, থাকবে না কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ। যে জাতিটি এই যুদ্ধপরবর্তী সময়ে নেতৃত্ব দেবে—তারা হবে শক্ত, দীর্ঘদেহী, লম্বা এবং সুদর্শন। যে সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে ইসরাইল যুদ্ধে নামবে—তারা সেসব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, যারা বিশ্ব ভাতৃত্বের মাঝে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করতে অনাগ্রহী।

এই সকল রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই যুদ্ধের আগে ইহুদিবাদের পতাকার নিচে আসতে হবে, নাহলে পরবর্তী সময়ে তাদেরকে ঐশীবাণী অনুযায়ী বিচারের মুখোমুখি করা হবে। আর যারা এই ভয়াবহ যুদ্ধ-লীলার পর বেঁচে থাকবে তারা বেশিরভাগই হবে কৃষক বা দিনমজুর শ্রেণির খেটে খাওয়া মানুষ। রাষ্ট্রের ধরন হবে অর্থনৈতিক সাম্যবাদ, মানে কিছুটা সংশোধিত সমাজতন্ত্র। সম্পদ আহরণের সীমা বেঁধে দেওয়া হবে এবং থাকবে না সম্পত্তির কোনো উত্তরাধিকারনীতি।

সব শেষের প্রশ্ন হলো, কখন ঘটবে এইসব ঘটনা? এই ইউরোপিয়ান রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে কতটুকু এগিয়েছে ইসরাইল? তাদের এই কাজের রোডম্যাপই-বা কেমন? প্রথম ধাপ অনুসারে জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে, তাদের বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয়তার বাইরে এসে মানুষ নিজেদের বিশ্ব নাগরিক হিসেবে ভাবার সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মানবিক কিছু দাবি নিয়েই জাতিসমূহ একত্রিত হয়েছে; যেটা পরবর্তীকালে 'দ্য স্টেট অব গড' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।[১১৩]

---

১১৩ সামহোয়্যার ব্লগ, সাজ্জাদ খান, ৮ ডিসেম্বর ২০১৭

[২৭]

ভারতে ইলুমিনাতি

ইলুমিনাতি সম্পর্কে নিশ্চয়ই কমবেশি অবগত সবারই জানা আছে। এ বিষয়ে প্রচলিত কন্সপিরেসি থিওরি হলো, এই রহস্যময় গোপন সংগঠনের সদস্যবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বের ক্ষমতাধর ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ এবং বিশ্ব মিডিয়ার রাঘব বোয়ালগণ। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ক্রমবর্ধমান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে দেশে অত্যাচারী সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে দেশ ও জাতি নির্বিশেষে মানুষের ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক এমনকি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

তবে ইলুমিনাতি তো অনেকাংশেই পশ্চিমা একটি সংস্কৃতি। কেমন হবে যদি আপনাদেরকে বলি, ভারতীয় উপমহাদেশেরও রয়েছে এমনই একটি গুপ্ত সংগঠন; যা ইলুমিনাতির চেয়েও অনেক বেশি ব্যাপক, সক্রিয় ও রহস্যময়! হ্যাঁ পাঠক, ঠিক এমনটিই মনে করা হয় 'The Nine Unknown Men' তথা নয় রহস্যমানব সম্পর্কে।

এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে, নয় রহস্যমানবের গোড়াপত্তন করেন সম্রাট অশোক। তবে কবে এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়, সে ব্যাপারে কিছুটা বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ সালের পর, আবার কারও মতে খ্রিস্টপূর্ব ২২৬ সালের পর। নয় রহস্যমানব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে সম্রাট অশোকের ব্যাপারে কিছু জানা দরকার। সম্রাট অশোক সম্পর্কে এইচ. জি. ওয়েলস তার Outline of World History গ্রন্থে লিখেছিলেন—

> 'Among the tens of thousands of names of monarchs accumulated of the files of history, the name Ashoka shines almost alone, like a star.'

তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র, যিনি গ্রিকদের নিকট পরিচিত ছিলেন সান্দ্রোকোত্তোস বা আন্দ্রাকোত্তাস নামে। যিনি প্রথম সম্রাট হিসেবে বৃহত্তর ভারতের অধিকাংশকে এক শাসনে আনতে সক্ষম হন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য স্বেচ্ছায় অবসর নিলে সিংহাসনে আরোহণ করেন তার পুত্র বিন্দুসার, এবং তারপর

উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতায় আসীন হন সম্রাট অশোক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, সম্রাট অশোকের কাঁধে ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের গুরুদায়িত্ব। সেই সাম্রাজ্যকে বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে করা এবং প্রজাদেরকে সন্তুষ্ট ও অনুগত রাখা একদমই সহজ কোনো কাজ ছিল না।

যদিও সম্রাট অশোক ছিলেন ভারতবর্ষের অধিকাংশেরই অধিপতি; তবে কলিঙ্গ (বর্তমান কোলকাতা ও মাদ্রাসের মধ্যস্থিত) অঞ্চলের মানুষকে তিনি নিজের শাসনের অধীনে আনতে পারেননি। তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, আর সেই প্রতিরোধ এক পর্যায়ে গড়ায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে; কিন্তু সে-সময় সম্রাট অশোকের সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ করার মতো বোকামি আর কিছুই ছিল না। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছিল। কলিঙ্গের যুদ্ধে অশোকের সৈন্যরা লক্ষাধিক কলিঙ্গ সৈন্যদেরই শুধু নির্মমভাবে হত্যাই করে নি, বাস্তুচ্যুত করেছিল প্রায় দেড় লক্ষ সাধারণ মানুষকেও।

এ যুদ্ধের ফলে তার সাম্রাজ্যের আকারও পূর্বসূরীদের থেকে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু যে বিশাল সংখ্যক মানুষকে এ যুদ্ধে প্রাণ হারাতে হয়, তা গভীর ছাপ ফেলেছিল সম্রাট অশোকের মনে। তখন তার মধ্যে এই অনুধাবনের সৃষ্টি হয় যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ করে হয়তো রাজ্য জয় করা যায়; কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। তখন তার মনোজগতে এক বিশাল পরিবর্তন আসে। এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, ভবিষ্যতে আর কখনোই কোনো প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নৃশংসতার সাথে নিজের নাম জড়াবেন না; কিন্তু শুধু এ-কথা বললেই তো আর হয়ে গেল না! তিনি হয়তো যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়াতে চান না, কিন্তু শত্রুপক্ষের মনোবাঞ্ছা তো ভিন্নও হতে পারে। তাহলে তাদের হাত থেকে নিজের সাম্রাজ্যকে কীভাবে রক্ষা করবেন তিনি?

এই 'কীভাবে'র উত্তর দেওয়ার আগে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ না করলেই নয়। তা হলো, সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। তার মনোজগতে যে বিশাল পরিবর্তন এসেছিল, তার পেছনেও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। কেননা, এ ধর্মের মূল কথাই হলো, 'অহিংসা পরম ধর্ম'! তাই সম্রাট অশোক শুধু নিজে এ ধর্মের দীক্ষা নিয়েই ক্ষান্ত হন নি, পাশাপাশি এ ধর্মের বাণী গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়ারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ধারণা করা হয়, তার প্রত্যক্ষ মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতায়ই বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের

সীমানা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, এমনকি নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া ও চীনের মতো দেশসমূহেও।

সম্রাট অশোক অনুভব করেছিলেন যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ তবেই এড়ানো যাবে, যদি বিদ্রোহীদেরকেও নিজের দলে টেনে আনা যায়। তাছাড়া যুদ্ধ এড়িয়ে এত বড় রাজ্য তিনি কীভাবে চালাবেন? এই 'কীভাবে'র প্রশ্ন খুঁজতে গিয়েই তার মাথায় আসে একটি গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলার প্রাথমিক ধারণা।

সম্রাট অশোক জানতেন, তিনি চাইলেও মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্মেষকেও কোনোভাবেই আটকানো যাবে না। তাই তিনি চিন্তা করলেন, এমন একটি গুপ্তসংগঠন গড়ে তুললে কেমন হয়, যেখানে থাকবে রাজ্যের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও করিৎকর্মা ব্যক্তিগুলো। যারা প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে নতুন অনেক কিছুর উদ্ভাবন করলেও, সেগুলো সাধারণ মানুষের লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকবে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই গোড়াপত্তন হয় নয় রহস্যমানব নামক গুপ্ত সংগঠনটির।

আধুনিক যুগে, ১৯২৩ সালেই টালবট মান্ডি নামক এক ব্যক্তি রচিত *The Nine Unknown* বইটির মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে নয় রহস্যমানবের অস্তিত্ব সম্পর্কে। মান্ডি ছিলেন ২৫ বছর ধরে ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর একজন সদস্য। তিনি তার বইতে উল্লেখ করেন, সম্রাট অশোক তার সাম্রাজ্যের সকল জ্ঞানী ব্যক্তিকে এক জায়গায় জড়ো করেন, তারপর সেখান থেকে বেছে নেন সেরা নয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে।

নয় রহস্যমানব নামক গুপ্ত সংগঠনটির সদস্য সংখ্যা সবসময়ই থাকত নয়জন, এবং তাদের প্রত্যেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট শাখার ওপর কাজ করত। শুধু তা-ই নয়, এই গুপ্ত সংগঠনের জন্য নানা ভাষার সংমিশ্রণে একটি নতুন ভাষারও সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেই ভাষাতেই প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব বিষয়ের ওপর একটি করে বই রচনা করেছিল, আর কয়েকদিন পর পর নতুন উদ্ভাবিত নানা তথ্যের সমন্বয়ে সেই বইগুলোকে হালনাগাদ করা হতো এবং আজ অবধি তা চলে আসছে!

চলুন দেখে নিই তাদের লিখিত কোন বইয়ের বিষয়বস্তু কী ছিল—

- ১। প্রথম বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, প্রোপাগান্ডার কলাকৌশল ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ সম্পর্কে। মান্ডির মতে, 'বিজ্ঞানের সবচেয়ে ভয়ংকর শাখা হলো গণ-অভিমতকে নিয়ন্ত্রণ করা। কেননা, এর সাহায্যে যে কারও পক্ষে সমগ্র বিশ্বকে নিজের মতো করে শাসন করা সম্ভব।'

- ২। দ্বিতীয় বইতে আলোচনা করা হয়েছিল শরীরবিদ্যা সম্পর্কে, নির্দিষ্ট কিছু স্নায়ুর কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ বা পরিবর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে মানবহত্যার স্পর্শমৃত্যু নামক এক বিরল পন্থার আলোচনা করেছেন।

- ৩। তৃতীয় বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, অণুজীব বিজ্ঞান ও জৈব প্রযুক্তি নিয়ে।

- ৪। চতুর্থ বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, রসায়ন ও ধাতুর রূপান্তর বিষয়ে। এক কিংবদন্তীর মতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন ভয়াবহ রকমের খরা দেখা দিয়েছিল, তখন মন্দির ও ধর্মীয় ত্রাণ-কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংগঠনগুলো কোনো এক গোপন উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে সোনা পেয়েছিল।

- ৫। পঞ্চম বইতে টেরেস্ট্রিয়াল কিংবা এক্সট্রা-টেরেস্ট্রিয়াল তথা যোগাযোগের সব ধরনের উপায় সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দেওয়া ছিল। এ থেকে ধারণা করা হয়, নয় রহস্যমানবেরা এলিয়েন তথা ভিনগ্রহবাসীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত ছিল।

- ৬। ষষ্ঠ বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, অভিকর্ষ বলের গোপন রহস্য ও প্রাচীন বৈদিক বিমান তৈরির নিয়মকানুন সম্পর্কে।

- ৭। সপ্তম বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, সৃষ্টিরহস্য ও মহাজাগতিক নানা বিষয়-আশয় নিয়ে।

- ৮। অষ্টম বইতে আলোচনা করা হয়েছিল, আলোর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে। এবং কীভাবে এটিকে ব্যবহার করা যায় একটি কার্যকরী অস্ত্র হিসেবে সে নিয়ে আলোচনা ছিল।

- ৯। নবম বইটির বিষয়বস্তু ছিল, সমাজবিজ্ঞান। এতে আলোচনা করা হয়েছিল কীভাবে সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটে, এবং কীভাবেই তা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

যেমনটি আগেই বলেছিলাম, সবসময়ই নয় রহস্যমানবের সদস্যসংখ্যা নয়। কোনো একজনের মৃত্যু ঘটলে তার জায়গা নেয় নতুন আরেকজন। এভাবে আজীবন এই নয় রহস্যময়ের সদস্য সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকবে, এবং এই নয়জনের বাইরে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কখনোই খুব বেশি মানুষ অবগত ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবেও না।

যদিও কারা এই গুপ্ত সংগঠনের সদস্য সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলার কোনো উপায় নেই, তারপরও যুগ যুগ ধরে এর অতীত ও বর্তমান সদস্যদের ব্যাপারে নানা গুজব প্রচলিত রয়েছে। ধারণা করা হয়, নয় রহস্যমানবেরা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে, এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ব রাজনীতির খুবই উঁচু পদে আসীন রয়েছে।

নয় রহস্যমানবের সম্ভাব্য সদস্য হিসেবে এখন পর্যন্ত যাদের নাম উঠে এসেছে, তাদের মধ্যে দশম শতকের প্রভাবশালী পোপ দ্বিতীয় সিলভাস্টার ও উপমহাদেশে রকেট বিজ্ঞানের জনক বিক্রম সারাভাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাস ঘাঁটতে গিয়ে আমরা যুগ যুগ ধরে দেখে এসেছি, নিজস্ব জ্ঞানকে কুক্ষীগত করে রাখাই গুপ্তসংগঠনগুলোর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এমনটি আমরা শুধু ইলুমিনাতির ক্ষেত্রেই দেখি নি, দেখেছি প্রাচীন মিশরীয় ফেরাউনকালে, তিব্বতীয় মংক, মায়ান পুরোহিত, মুক্ত ম্যাসন, রোসিক্রুসিয়ান ও আরও অনেকের ক্ষেত্রেই। তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান অন্য কারও সামনে প্রকাশ করত না বলেই হয়ে উঠেছিল অদম্য শক্তির অধিকারী এবং ঠিক তেমনটিই আমরা দেখতে পাই নয় রহস্যমানবেরা ক্ষেত্রেও। এখন তাদের কী

অবস্থা সে সম্পর্কে আমরা হয়তো অবগত নই; কিন্তু এটুকু আন্দাজ করতেই পারি, যতই দিন যাচ্ছে তাদের জ্ঞানের পরিধি ততই আকাশ ছুঁচ্ছে, এবং তারা ততটাই অপরাজেয় শক্তিশালী হয়ে উঠছে।[১১৪]

---

১১৪ http : //xn---ancientexplorers-vt8a.com/; www.speakingtree.in independent 24×7

[২৮]

ড্যান ব্রাউন : দ্যা ভিঞ্চি কোড-এর স্রষ্টা

বর্তমান বিশ্বে অতি পরিচিত একটি নাম ড্যান ব্রাউন। লিখেছেন হাতেগোনা কয়েকটি বই; কিন্তু জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। থ্রিলারধর্মী বইগুলোতে এনেছেন অভিনবত্ব। আর সেই অভিনবত্বই তাকে বেস্ট সেলিং থ্রিলার লেখকের মর্যাদা এনে দিয়েছে। তার থ্রিলারের অভিনবত্বই হলো স্রেফ এ্যাকশনের পরিবর্তে কোডস ব্রেকিং, সংকেত উদ্ধার, গুপ্ত সংগঠন ও তাদের কার্যক্রমসহ অনেক দুর্বোধ্য বিষয়ের রহস্যে উন্মোচন। রহস্যের অনুসন্ধানের পেছনেই যেন ঘুরঘুর করতে থাকে তার থ্রিলারগুলো। এছাড়া তিনি ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞানকে একসুতোয় নিয়ে এসেছেন থ্রিলারে।

তার রচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু সিম্বল। সিম্বলিক জটের সমাধানই বইগুলোর উপজীব্য হয়ে ওঠে। লেখায় অনবরত দৃশ্যমানের সঙ্গে অদৃশ্যমানের খেলা চলতে থাকে। লিখতে গিয়ে ব্রাউন যেন ধর্ম আর বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব খেলায় মেতে ওঠেন। আর সেই খেলায় দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার এক চমৎকার মিশেলে তার লেখাগুলো হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। এক একটি থ্রিলার হয়ে ওঠে অনবদ্য।

ব্রাউন তার বইগুলোতে খ্রিস্ট ধর্মের অনেক গোপন কথা তুলে ধরেন। অনেক ঐতিহাসিক সত্যকে গল্পের ঢংয়ে হাজির করেন পাঠকের সামনে। গুপ্ত সংগঠনগুলোর গোপন ক্রিয়া-কর্ম, ষড়যন্ত্র, হত্যার মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠককে ঐতিহাসিক সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যান। রবার্ট ল্যাঙডন চরিত্রটিই পাঠককে এই ঘোরলাগা জগতে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করে থাকে। ধর্মতত্ত্ব আর ইতিহাসের মারপ্যাঁচের একঘেয়েমির হাত থেকে তিনি পাঠককে উদ্ধার করেন কোডব্রেকিং, সিম্বলিক সমস্যার জট খোলার মধ্যে দিয়ে। ব্রাউনের সফলতা তার উপস্থাপনার ভঙ্গিতে। তিনি এমনভাবে সিম্বলিক জটগুলোকে পাঠকের সামনে হাজির করেন যে, পাঠক নিজেই যেন রহস্যের জট খুলতে বসে যান। তার সফলতা এখানেই।

২০০৩ সালে দ্য ডা ভিঞ্চি কোড উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে তিনি খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। এছাড়া লেখেন *ডিজিটাল ফোরট্রেস, ডিসেপশন পয়েন্ট, এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমোনস, দ্য লস্ট সিম্বল, ইনফার্নো* নামক জনপ্রিয় থ্রিলার বইগুলো। এই প্রতিটি বই বেস্ট সেলারের মর্যাদা অর্জন করে। এই বইগুলোর পাঠকপ্রিয়তা একদিকে ড্যান ব্রাউনকে বিখ্যাত করে তোলে, আর অন্যদিকে নিয়ে আসে প্রচুর টাকা কড়ি। তার বইগুলো অনূদিত হয়েছে বিশ্বের প্রায় বায়ান্নটি ভাষায়। বিক্রয় হয়েছে দুশো মিলিয়নেরও বেশি কপি। এই সংখ্যাটি যেকোনো লেখকের কাছেই পরম সাফল্য।

পরম সাফল্য অর্জনকারী এই লেখক আমেরিকার নিউ হ্যাম্পাশায়ারের ফিলিপস এক্সটার একাডেমিতে ২২ শে জুন, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রিচার্ড জে ব্রাউন ওই একাডেমির বিখ্যাত গণিত শিক্ষক ছিলেন। সেই সুবাদেই তার বেড়ে ওঠা ফিলিপস এক্সটার একাডেমির চৌহদ্দির মধ্যে। বাবা-মা দুজনেই সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। ব্রাউনের মা চার্চে অর্গান বাজাতেন।

সেই ছোট্ট বয়সে তিন ভাইবোন মায়ের সঙ্গে চার্চে গিয়ে ঐকতান সঙ্গীত গাইতেন। চার্চের পরিবেশে ব্রাউনের বেড়ে ওঠা। ধর্মকর্মের নানান বিষয় পরবর্তী সময়ে তার লেখনীকে প্রভাবিত করে। এক্সটার একাডেমিতে তিনি ধর্ম আর বিজ্ঞানের আপাতবিরোধী পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখেন—যা পরবর্তী সময়ে তার লেখনীকে প্রভাবিত করে।

শৈশব থেকেই তার নানা রকম পাজল, ক্রসওয়ার্ড সমাধানের প্রতি ঝোঁক ছিল। এ্যানাগ্রাম আর ক্রসওয়ার্ড পাজলের সমাধান করতে করতে কাটিয়ে দিতেন অনেকটা সময়। ছুটির দিনে বাবা তাদের তিন ভাই-বোনকে নিয়ে ট্রেজারহান্ট খেলতেন। কাগজে লেখা সংকেতসূত্র ধরে গিফট আইটেম খুঁজতে যেতেন নিজের বাড়ি—এমনকি শহরের আশপাশেও। ছোট্টবেলার সেই ট্রেজারহান্ট খেলা তার লেখনীকে পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।

ড্যান ব্রাউন ফিলিপ এক্সটারের লেখাপড়া শেষ করে আর্মহের্স্ট কলেজে যোগদান করেন। সেই সময় তিনি সাঁই আপসাইলন নামক ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হোন। এই সদস্য থাকাটা তার মাঝে বিভিন্ন সংঘ সম্পকে ধারণা সৃষ্টি করেছিল। ওই সময়টাতে স্কোয়াশ খেলা আর আর্মহের্স্ট গ্লি ক্লাবে গান গাওয়া তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। ওই আর্মহের্স্ট কলেজে থাকাকালীন সময়ই তিনি ঔপন্যাসিক এ্যালান লেলচাকের সহযোগী হিসেবে তার লেখালেখিতে সহযোগিতা করেন।

বাইশ বছর বয়সে ব্রাউন স্নাতক সম্পন্ন করে সঙ্গীতকে পেশা হিসেবে বেছে নেয়ার চিন্তা করেন। প্রথমেই বের করেন শিশুতোষ ক্যাসেট সিন্থ এ্যানিমেলস। এই ক্যাসেটটির মাত্র কয়েকশো কপি বিক্রি হয়। এরপর একে একে তিনি হ্যাপি ফ্রগস, সুজুকি এলিফ্যান্টস ক্যাসেট বের করেন। ওগুলোও কয়েকশো কপি বিক্রি হয়। নব্বই সালের দিকে তিনি নিজের রেকর্ড কোম্পানি ডেলিয়্যান্স প্রতিষ্ঠা করেন। ওই কোম্পানি থেকে প্রকাশ করেন পাসপেকটিভ নামক গানের ক্যাসেট। এটিও ব্যর্থ হয়। পরপর এতগুলো গানের ক্যাসেট ব্যর্থ হলেও তিনি হতাশ না হয়ে সঙ্গীতকেই ক্যারিয়ার হিসেবে গড়ার স্বপ্ন দেখেন। আর তাই একানব্বইতে তিনি হলিউডে যান সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত লেখক ও পিয়নিস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য। ওই সময়টাতে তাকে বেশ আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি সঙ্গীতের পাশাপাশি বেভারলি হিলস প্রিপারেটরি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

মাঝে মাঝে হতাশা ব্রাউনকে আঁকড়ে ধরত; কিন্তু সেই দুর্দশাগ্রস্ত সময়টাতেই তার পরিচয় হয় ন্যাশনাল একাডেমি অব সংগরাইটারসের ডিরেক্টর ব্লিথ নিউলনের সঙ্গে। ব্লিথ ব্রাউনের মাঝে প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, এই তরুণের মাঝে সুপ্ত হয়ে আছে প্রতিভা। তাই ব্লিথ ভরসা দিতেন ব্রাউনকে, স্বপ্ন দেখাতেন। এক ছুটির দিনে ব্রাউন সিডনি শেলডনের উপন্যাস *দ্য ডুমস ডে কন্সপিরেসি* পড়তে গিয়ে নিজের মধ্যে লেখালেখির অনুপ্রেরণা খুঁজে পান। ব্লিথ তাকে উৎসাহ দেন লেখালেখির ব্যাপারে। দু'জনে মিলে লিখে ফেলেন হাস্যরসাত্মক বই '১৮৭ ম্যান টু এ্যাভেয়ড *এ সার্ভাইভাল গাইড ফর দ্য রোমান্টিক্যালি ফ্রাস্টেড ঔম্যান।'* এই বইটিতে তিনি ড্যানিয়েল ব্রাউন ছদ্মনামে লেখেন।

একটা সময় সখ্য, প্রেম-ভালোবাসায় পরিণত হয়। ব্লিথ তার থেকে বারো বছর বড় হলেও এটি তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তারা দুজনে ১৯৯৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ব্রাউনের ক্যারিয়ারের সফলতার জন্য ব্লিথের চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। ব্রাউন লেখালেখিতে মনোনিবেশ করার জন্য শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের একবছর পর লেখেন *ডিজিটাল ফোর্ট্রেস* নামক একটি থ্রিলারধর্মী বই। বইটির প্রচার-প্রসারের জন্য তার স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু বইটি তেমন কাটতি লাভ করে নি। ওই বছরই কয়েক মাস পর তিনি আর তার স্ত্রী মিলে আরেকটি হিউমার বই *দ্য বাল্ড বুক* প্রকাশ করেন। এই বইটিও যথারীতি ফ্লপ।

২000 সালে ড্যান ব্রাউন লেখেন *এঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমোনস* বইটি। আর তারপরের বছর প্রকাশিত হয় *ডিসেপশন পয়েন্ট* বইটি। দুটি হিউমার বইয়ের মতো এই তিনটি থ্রিলার বইও সফলতার মুখ দেখে নি সেই সময়টাতে। বইগুলো মাত্র দশ হাজারের মতো কপি বিক্রি হয়েছিল; কিন্তু তার থ্রিলারধর্মী চতুর্থ বই *দ্য ডা ভিঞ্চি কোড* (২০০৩) প্রকাশ হওয়ার পরপরই বইটি বেস্ট সেলার হয়ে ওঠে। বইটি বিশ্বজুড়ে ৮১ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। এই বইটি থেকে তার আয় হয় আড়াইশো মিলিয়নেরও বেশি ডলার।

এই বইটির জনপ্রিয়তা পাঠককে তার রচিত অন্যান্য বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে। হুহু করে আগের লেখা বইগুলোও বিক্রি হতে থাকে। একই সঙ্গে তার থ্রিলারধর্মী চারটি বই ২০0৪ সালে নিউইর্য়ক টাইমসের বেস্ট সেলার বইয়ের তালিকায় স্থান করে নেয়। এই বইগুলোর সফলতা তাকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। সেইসঙ্গে আসতে থাকে প্রচুর অর্থ। বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্ষমতাও। ২00৫ সালে টাইম ম্যাগাজিনে বিশ্বের একশো জন প্রভাবশালীর তালিকায় ড্যান ব্রাউনও স্থান পায়। সেই বছরই ফোর্বস ম্যাগাজিনের সেলিব্রেটিদের তালিকায় ড্যান ব্রাউনের স্থান হয় ১২তম।

দ্য ডা ভিঞ্চি কোড প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় ছয় বছর তার কোনো বই প্রকাশিত হয় নি। দীর্ঘ সময় পর ২০০৯ সালে তিনি হাজির হন *লস্ট সিম্বল* বইটি নিয়ে। বইটি প্রকাশের প্রথম দিনই এক মিলিয়নের বেশি কপি বিক্রি হয়। প্রথম সংস্করণে পাঁচ মিলিয়নের বেশি কপি বই বিক্রি হয়ে যায়। এরপর আবার চারবছর পর পাঠক পায় *ইনফার্নো* বইটি। এটিও যথারীতি বেস্ট সেলার হয়।

ড্যান ব্রাউন লেখালেখির অনুপ্রেরণা খুঁজে পেয়েছিলেন সিডনি শেলডনের লেখা পড়ে; কিন্তু সিডনি শেলডন ছাড়াও অন্যান্য অনেক লেখকের লেখাও তাকে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে ছয়জনের বই দ্বারা তিনি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হোন। তারা হলেন ডগলাস হফসটেডরের *গোডেল, ইশ্চার, ব্যাচ* বইটি, ফ্রেড রিক্সনের *কোডস সাইফারস এ্যান্ড আদার ক্রিপটিক* এবং *ক্লান্ডেস্টাইন কমিউনিকেশন*, জন স্টেইনব্যাকের *অফ মাইস এ্যান্ড ম্যান*, জন ল্যাঙ্গডনের *ওয়ার্ডপ্লে : এ্যাম্বিগ্রামস রিফ্লেকশনস অন দ্য আর্ট অব এ্যাম্বিগ্রামস* এবং শেক্সপিয়রের *মাচ এ্যাডো এ্যাবাউট নাথিং* এবং জেমস ব্যামফোর্ডের *দ্য পাজল প্যালেস* বইটি। একজন লেখকের নাম এখনো বলা হয় নি। তিনি হচ্ছেন দান্তে। তার *ডিভাইন কমেডি* বইটির প্রভাব বেশ ভালোভাবেই দেখা যায়

ইনফার্নো বইটিতে। ব্রাউনের বইগুলোর মধ্যে *এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমোনস, দ্য ভিঞ্চি কোড, দ্য লস্ট সিম্বল, ইনফার্নো*—এই চারটি বইয়েরই প্রধান চরিত্র রবার্ট ল্যাঙডন। এক সাক্ষাৎকারে ব্রাউন ল্যাঙডনকে নিয়ে আরও বারোটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনার কথা ইতোমধ্যে জানিয়েছেন। ব্রাউনের বইয়ের চরিত্রগুলো মূলত তার জীবন থেকেই নেওয়া। রবার্ট ল্যাঙডন চরিত্রটি জন ল্যাঙডন নামক একজন আর্টিস্টের নাম অনুসারে। এই আর্টিস্ট ব্রাউনের এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমোনস সিডির এমবিগ্রাম করেছিল। এছাড়াও তার বইয়ের বিভিন্ন চরিত্র তার বাস্তব জীবন থেকেই নেওয়া।

ব্রাউনের লেখা প্রথম থ্রিলার বই হলো 'ডিজিটাল ফোরট্রেস।' বইটির মূল উপজীব্য হলো, সরকার কর্তৃক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে নজরদারি করা। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা চলে 'ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আড়িপাতা।' আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি এক দুর্বোধ্য কোডের সম্মুখীন হয়। ডিজিটাল ফোরট্রেস নামক এক জটিল কোড ভাঙতে পারে না কোড ব্রেকিং সুপার কম্পিউটারও। দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্রিপ্টোগ্রাফার সুসান ফ্লেচারকে। সুসান অনেক চেষ্টায় ভাঙে সেই কোড। কোডের সংকেতে যে ভয়াবহতার ছাপ লুকিয়ে আছে তা দেখে কেঁপে ওঠে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। কোডটি লিখেছে এনসেই তানকেডো নামক ওই সংস্থার একজন প্রাক্তন কর্মচারী। সে ওই সংস্থাটির গোপন নজরদারির বিষয়টি পছন্দ করত না। ওই কোডটির মাধ্যমে ওই সংস্থাটিকে জিম্মি করা হয়েছে। ডিজিটাল ফোরট্রেস নামক এই কোডটি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সুসান ফ্লেচার আর তার বাগদত্তা ডেভিড বেকার নেমে পড়ে এই কোডের রহস্যে উদ্ধারে। কোড ব্রেকিং আর রহস্যের সমাধানের জটিলতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় ডিজিটাল ফোরট্রেস বইটির কাহিনি।

এঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমন্স বইটি প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র রবার্ট ল্যাঙডন। একজন বিজ্ঞানী খুন হলে তার বুকে পাওয়া যায় সাংকেতিক ভাষায় লেখা একটি কাগজ। সেই লেখার পাঠোদ্ধার করে বিশ্বখ্যাত সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাঙডন। পাঠোদ্ধার করে শঙ্কিত হয়ে পড়ে ল্যাঙডন। শুধু বিজ্ঞানীই নয়, আরও চারজন কার্ডিনাল সদস্য খুন হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের বুকেই পাওয়া যায় সেই সংকেত খচিত কাগজ। সেই লেখার পাঠোদ্ধারে ল্যাঙডন জানতে পারে ইলুমিনিটি নামক ভাতৃসংঘের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা। এরা ক্যাথলিক চার্চকে উড়িয়ে দিতে চায়। ভ্যাটিকান সিটিকে

ধ্বংসের জন্য নব্য আবিষ্কৃত এন্টিম্যাটার ব্যবহারের পরিকল্পনা করে ইলুমিনিটির সদস্যরা। রবার্ট ল্যাঙডন আর সুন্দরী পর্দাথবিদ-জীববিজ্ঞানী ভিক্টোরিয়া ভেট্রা ভ্যাটিকানকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় রোমে। এ্যান্টিম্যাটারটি উদ্ধার করার জন্য ল্যাঙডন চষে বেড়ায় পুরো রোমসহ পুরো ভ্যাটিকান সিটি। ভ্যাটিকান সিটির পরিত্যক্ত ক্যাথেড্রাল, বদ্ধ কবরখানা, বড় বড় গির্জার আনাচে কানাচে খুঁজতে খুঁজতে একটা সময় তারা খুঁজে পায় পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন ভল্টটি। খুঁজে পায় ইলুমিনিটির গোপন মিটিংয়ের স্থান। ক্যাথলিক চার্চকে রক্ষার জন্য ল্যাঙডন আর ভেট্রার এ্যাডভেঞ্চার নিয়েই বইটির কাহিনি এগিয়ে গেছে। এই বইটির কাহিনি নিয়ে পরবর্তী সময়ে ফিল্মও তৈরি করা হয়েছে।

ড্যান ব্রাউনের *ডিসেপশন পয়েন্ট* বইটি প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। এই বইটির কাহিনি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে রচিত হয়। আর্কটিক সার্কেলে একটি উল্কার পতন ঘটে। সেই পতনই প্রমাণ করে পৃথিবীর বাইরেও জীবন আছে; কিন্তু এই তথ্য প্রকাশ পেলে কারও কারও রাজনীতি হুমকির মুখ পড়ে যাবে। তাই এই তথ্য জনসমক্ষে না আনার চেষ্টা করে ষড়যন্ত্রকারীরা। একের পর এক খুন হতে থাকে। আর্কটিক সার্কেলে উল্কার পতনের ঘটনা অনুসন্ধান করতে ইন্টেলিজেন্স এনালিস্ট র্যাচেল সেক্সটনকে আরও চারজন নাসার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সেখানে পাঠান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। নাসা প্রমাণ করে পৃথিবীর বাইরেও প্রাণ আছে; কিন্তু কেউ একজন চায় না নাসা সফল হোক। শুরু হয় ষড়যন্ত্র। দৃষ্টি চলে যায় র্যাচেলের বাবা সিনেটর সেজউইক সেক্সটনের দিকে। সে একজন প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট। সেক্সটন চেয়েছে নাসাকে বিলুপ্ত করে সেই অর্থ পাবলিক স্কুলে ব্যয় করতে। নাসার ব্যর্থতাকে তিনি তার ক্যাম্পেইনে কাজে লাগাতে চান। আর অন্যদিকে এই আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে নাসা তাদের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দিতে চায়। সন্দেহ, পাল্টা সন্দেহ আর রাজনীতির মারপ্যাঁচের মধ্যে দিয়ে ডিসেপশন পয়েন্ট বইটির কাহিনি এগিয়ে যায়।

ড্যান ব্রাউন যে বইয়ের জন্য জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন সেই বইটি *দ্য ভা ভিঞ্চি কোড*। এই বইটিতে রবার্ট ল্যাঙডনকে দ্বিতীয়বারের মতো হাজির করা হয়। রবার্ট ল্যাঙডন আর তার সঙ্গী ক্রিপ্টোলজিস্ট সোফিই নেভিউ প্যারিসের লুভর মিউজিয়ামে একটি খুনের তদন্ত করতে গিয়ে খুঁজে পায় প্রায়রি অব সিয়ন আর অপাস ডাইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব ম্যারি মাগদালিনকে নিয়ে। খ্রিস্ট ধর্মের ইতিহাসে মাগদালিনের ভূমিকা এবং হলিগ্রেইল সম্পর্কিত বিষয়ের

আলোকেই বইটির কাহিনি ডালপালা মেলেছে। দুই হাজার বছরের পুরনো এক সত্যকে চিরতরে নির্মূল করার জন্য প্যারিসে একই দিনে হত্যা করা হয় চারজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে। তাদেরকে হত্যা করা হয় ধর্মের ভিত নড়ে যাবে বলে। সিক্রেট সোসাইটি সেই সত্যটি হাজার বছর ধরে সঙ্গোপনে লালন করে আসছিল। সেই সিক্রেট সোসাইটির সদস্য ছিলেন আইজ্যাক নিউটন, ভিক্টর হুগো, বত্তিচেল্লি, লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির মতো মানুষেরাও। উগ্র ক্যাথলিক সংগঠন 'ওপাস দাঁই' সেই অতি গোপন সত্যকে সংঘের বাইরের একজনের কাছে ফাঁস করে দেয়। সেই সত্যেকে খুঁজে পান রবার্ট ল্যাঙডন। জেসাস ক্রাইস্ট ম্যারি ম্যাগদালেনকে বিয়ে করেছেন—এই সত্যটি কোড ব্রেকিং আর অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে ল্যাঙডনের কাছে ধরা দেয়। সেই সঙ্গে ধরা দেয় ভয়ঙ্কর বিপদ। ধর্ম, কোডব্রেকিং, সিক্রেটস সোসাইটির ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাস্তব-অবাস্তব, ধর্ম-বিজ্ঞানের অপূর্ব এক সমন্বয়ে রচিত এই বই। এই বইটি নিয়ে সমালোচনাও কম হয় নি।

২০০৯ সালে প্রকাশিত হয় তার 'দ্য লস্ট সিম্বল' বইটি। বইটির কাহিনি বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিক্রেট সোসাইটি ফ্রিম্যাসন হাজার হাজার বছর ধরে এক সিক্রেট জ্ঞান পালন করে আসছিল। সেই জ্ঞান ভুল কারও হাতে পড়লে অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। এমন সময়ই সিম্বলিস্ট রবার্ট ল্যাঙডন ক্যাপিটাল বিল্ডিং-এ পাঁচটি সিম্বলযুক্ত একটি বস্তু আবিষ্কার করেন—যা আসলে প্রাচীন গুপ্তসংঘে আহ্বানের প্রতীক ছিল। সেই সিম্বলই তাকে তার বন্ধু পিটার সলোমনসকে খুঁজে পেতে সহায়তা করে। পিটারকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। ল্যাঙডন বুঝতে পারে—বন্ধুকে বাঁচাতে হলে রহস্যময় প্রতীকটি কি নির্দেশ করছে তার সমাধান বের করতে হবে। সিম্বলের সূত্র ধরেই ল্যাঙডন বন্ধুকে উদ্ধার করতে যায়। আর সেই সময়ই বাইবেলের এক গুপ্তকথনের খোঁজ পায় ল্যাঙডন। এই বইটিও বেস্ট সেলারের মর্যাদা পায়।

এই তো কিছু দিন আগে ড্যান ব্রাউন পাঠকের সামনে হাজির হয়েছেন *ইনফার্নো* বইটির মাধ্যমে। এই বইটিরও মূল চরিত্র রবার্ট ল্যাঙডন। এবার সে ফ্লোরেন্সে। এক উন্মাদ বিজ্ঞানী চাচ্ছে পৃথিবীর অর্ধেক মানুষকে মেরে ফেলতে। কারণ, তার ধারণা, আগামী এক শ' বছরের মধ্যে মানব প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই বিলুপ্তির কারণ হিসেবে উন্মাদ বিজ্ঞানী জনসংখ্যা বিস্ফোরণকে দায়ী করছেন। তার ধারণা, অর্ধেক মানুষকে না মেরে ফেললে পৃথিবী একটা সময় নরক হয়ে পড়বে। তাই পৃথিবীকে রক্ষার উদ্দেশ্যে পাগলা এই বিজ্ঞানী ভয়াবহ এক

মহামারীর জীবাণু ছড়িয়ে দেয়ার সব আয়োজন শেষ করে। আর নিজে বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। জীবাণুগুলোকে সে টাইম বোমার মতোই সেট করে রাখে বাক্সে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরে বাক্স থেকে জীবাণুগুলো ছড়িয়ে পড়বে। জীবাণুগুলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই ল্যাঙডন খুঁজছে বাক্সটা। সঙ্গে আছে সুন্দরী সিয়েনা। এই দু'জনের জীবাণুর বাক্সটি অনুসন্ধানের এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে *ইনফার্নো* বইটির কাহিনি এগিয়ে গেছে। এই বইটিও নিউইয়র্ক টাইমসের বেস্ট সেলার হয়।

আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার অধিকারী ড্যান ব্রাউনকে জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে অনেক সমালোচনা। ২০০৫ সালে লিউস পার্ডিও ড্যান ব্রাউনের বিরুদ্ধে *দ্য ভিঞ্চি কোড* বইটির বিরুদ্ধে প্লেগারিজম আইনে মামলা করেন। তিনি দাবি করেছিলেন, তার *দি ডা ভিঞ্চি লিগ্যাসি* (১৯৮৩) এবং *ডটার অব গড* (২০০০) বই থেকে ধার নিয়ে *দ্য ডা ভিঞ্চি কোড* লেখা হয়েছে; কিন্তু তার এই মামলা ধোপে টেকে নি। মামলায় জয়ী হোন ড্যান ব্রাউন। এরপর মাইকেল বেইগেন্ট এবং রিচার্ড লাই কপিরাইট আইনে ব্রাউনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। তাদের দাবি ছিল, *দ্য ভিঞ্চি কোড* বইটি তাদের ১৯৮২ সালে প্রকাশিত *হলি ব্লাড হলি গ্রেইল* থেকে নকল করা। এই মামলাতেও ব্রাউন জয় লাভ করে।

আইনী লড়াইয়ে জিতেও সমালোচকদের মুখ থামাতে পারেন নি তিনি। তার কোনো বই প্রকাশ হওয়া মানেই সমালোচকরা নতুন করে সমালোচনার ঝাঁপি খুলে বসে। সমালোচকরা সবসময়ই বলে বেড়ান ড্যান ব্রাউনের লেখা জবরজং। একই কাহিনির অর্থহীন পুনরাবৃত্তি ঘটে তার লেখায়। তার লেখাগুলো গুপ্ত রহস্যের বাইরে বের হতে পারে না। সালমান রুশদী ব্রাউনের সমালোচনা করে বলেন, '*দ্য ভিঞ্চি কোড* বইটি খুবই নিম্নমানের; কিন্তু একে ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।' আমেরিকার গ্রামারিয়ান মার্ক লিবারমেন ব্রাউনকে 'সাহিত্যের ইতিহাসে খারাপ স্টাইলিস্টদের অন্যতম' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া ক্যাথলিকরা ব্রাউনকে ব্লাসফেমির দায়ে অভিযুক্ত করেন। তাদের অভিযোগ, ব্রাউন তাদের বিশ্বাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। *দ্য ভিঞ্চি কোড* প্রকাশিত হওয়ার পর ভ্যাটিকান সিটি তাকে তিরস্কার করেছিল। ড্যান ব্রাউনকে এইসব সমালোচনা, এতসব প্রতিবন্ধকতা দমিয়ে রাখতে পারে নি, পারছেও না। এই বিষয়ে ড্যান ব্রাউন নিজেই বলেন, 'অনেকেই সমালোচনা করছেন, তবে আমি সন্তুষ্ট এই কারণে যে, বাইবেলবেত্তা আর ইতিহাসবিদরা

যতই যুদ্ধ করুক না কেন, গোপন ধর্মীয় ইতিহাস, গুপ্ত সংঘ, কোড ব্রেকিং নিয়ে আমার লেখা বইগুলো মানুষ পছন্দ করেছে।' এই বিষয়টিই তাকে আরও বেশি করে লেখায় উদ্বুদ্ধ করে।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ড্যান ব্রাউনের প্রথম কয়েকটি বই তেমন চলেই নি; কিন্তু *দ্যা ভিঞ্চি কোড* এমন জনপ্রিয়তা পেল কীভাবে, যে ৮১ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়ে গেল? তাও আবার অখ্যাত লেখকের বই! যার মাধ্যমে প্রায় ভুলে যাওয়া ইলুমিনাতি আবার আলোচনায় উঠে এলো? আসল ব্যাপারটা হলো; ইলুমিনাতি এখন জাল গুটিয়ে আনছে। তাদের উদ্দেশ্য পূরণের প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে, তাই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে নিজেরাই বই এবং বইয়ের লেখককে আলোচনায় নিয়ে এসেছে।

অথচ, সারা দুনিয়ার বোকা মানুষেরা ভাবছে ইলুমিনাতি বুঝি লেখকের কল্পিত কোনো উপন্যাস, আসলে এটা বাস্তবের নিরিখে লেখা; কিন্তু ঘুমন্ত মুসলিমজাতিকে সেটা বুঝাবে কে?[১১৫]

---

১১৫ প্রথম আলো, অনলাইন সংস্করণ। কালের কণ্ঠ, ৩ নভেম্বর, ২০১৬. অনলাইন সংস্করণ। মুক্ত বিশ্বকোষ উইকিপিডিয়া

[২৯]

ফ্লাইং সোসার্স : ইলুমিনাতির বাহন

এ নিয়ে নিজে কিছু বলার আগে পাঠক আসেন, ফ্লাইং সোসার্স সম্পর্কে জানতে ৬ জানুয়ারি, ২০১৪, দৈনিক যুগান্তরের একটি নিউজ দেখে আসি—

'ফ্লাইং সোসার্স বলতে আমরা ভিনগ্রহী আকাশযানকে বুঝি। ফ্লাইং সোসার্সই হোক আর গুপ্তচর বিমান কিংবা অশনাক্ত বিমানই হোক—সবই UFO (Unidentified Flying Object)-এর অন্তর্গত। সেই খ্রিস্টীয় বর্ষ শুরুর আগ থেকেই ফ্লাইং সোসার্স মানুষকে আকৃষ্ট করে চলেছে। মানুষ হতবুদ্ধ হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে, খুঁজে চলেছে সেই আকাশযানের উৎস। খ্রিস্টপূর্ব ১৫ শতকে মিশরের ফারাও ছিলেন তুতেম খানম। তার সময় জনতা আকাশে দেখেছিল বিচিত্র ধরনের আগুনের গোলা। সে সময় সেনাবাহিনী খুঁজেছিল গোলার উৎস; কিন্তু হঠাৎ সেই গোলা অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৬৮৬ সালের ৯ জুলাই জার্মানির লিপজিক অধিবাসীরা রহস্যময় এক ধাতব বস্তু উড়তে দেখেছিল। ১৭৫৬ সালে সুইডেনের লোকেরাও দেখেছিল এ-ধরনের অদ্ভুত রহস্যময় বস্তু। ১৯৮০ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে একটি ত্রিকোণাকার বস্তু সন্ধ্যার পর প্রায়ই দেখা দিতে লাগল। কালো বস্তুটির তিন কোণায় তিনটি লাল আলো, মাঝে সবুজ বৃত্ত। কয়েকদিন পর আকাশযানটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সময় ইংল্যান্ডেও ইউএফও দেখা দিতে লাগল। সেই সঙ্গে Crop Circle, অর্থাৎ রাতের বেলা কে বা কারা জমির শস্যেক্ষেতে শস্য মাড়িয়ে বিভিন্ন আকৃতির নকশা তৈরি করে যেত। অনেকে বলেন, ভিনগ্রহের প্রাণীরা এসব করে দিয়ে যায়। মানুষের পক্ষে এই নকশা তৈরি করা অসম্ভব। কারণ, অতি জটিল ও সূক্ষ্ম Crop Circle তৈরি করতে মানুষের প্রচুর সময় লাগবে, অন্তত এক রাতের মধ্যেতো সম্ভব নয়। তবে Crop Circle কিছু মানুষ তৈরি করেছে বলেও জানা যায়। প্রত্যদর্শীরা Crop Circle তৈরি করার সময় অনেক ইউএফও এবং আলোকবিন্দু দেখেছেন। সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে ১৯৯৪ সালে। ওই বছর কিছু লোক স্টোনহেঞ্জ ভ্রমণ করতে আকাশে ওঠেন। ৪৫ মিনিট পর আবার স্টোনহেঞ্জ দেখতে এসে ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটা

জটিল Crop Circle দেখতে পান। এত জটিল Crop Circle মানুষ ৪৫ মিনিটে তৈরি করতে পারে না। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির প্লেন ক্যামেরাসহ অজানা আলোকে তাড়া করে। তাদের ক্যামেরায় স্পষ্ট দেখা গেল, অজানা আলো যে ক্ষেতের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, শস্য কাত হয়ে যাচ্ছে, Crop Circle তৈরি হচ্ছে। অজানা আলো অদৃশ্য হয়ে যায়। এগুলোও ইউএফও বটে।

২০০২ সালে ইংল্যান্ডের এক শস্যবৃত্তে এক এলিয়ানের মুখচ্ছবি এবং তার হাতে ধরে রাখা একটি গোলক দেখা গিয়েছিল। এছাড়া হাজারও ধরনের শস্য গোলক প্রতি বছরই আবিষ্কৃত হচ্ছে। গবেষণাগারে ওই নুয়ে পড়া শস্যগুলো পর্যবেক্ষণের পর জানা যায়—প্রচুর পরিমাণ মাইক্রোওয়েভ মিথস্ক্রিয়ার ফলে ওগুলোর এ অবস্থা হয়েছে।

১৯৮৫ সালে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনার ওপর দিয়ে একটি অদ্ভুত পিরিচ আকৃতির আকাশযান উড়ে যায়। সেটা নামানোর জন্য প্রেরিত বেতারবার্তা ফিরে আসে। তারপর সেটাকে নামানোর জন্য আকাশে ওড়ে ইরানের ভয়ংকর বিমান 'ফ্যান্টম'। যার রয়েছে মিসাইল ও পারমাণবিক বোমা বহনের ক্ষমতা। বোমা নিক্ষেপের বোতাম টিপে দেখা গেল—তা বিকল হয়ে গেছে। ওই নভোযান চলে যাওয়ার পর ২টি বিমান সচল হয়। ইরান দাবি করে, তার বিদ্যুৎব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পশ্চিমারা এই আকাশযান পাঠিয়েছে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করে জানায়—অন্য বিমানের সুইচ বিকল করার যন্ত্র তাদের কাছে নেই এবং ওই আকাশযানও তাদের নয়।

১৯৫৭ সালে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে, তখন আমেরিকাও প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের লোক ইউএফও দেখার দাবি জানান। কেউ কেউ আবার ভিনগ্রহীদের হাতে অপহৃত হয়েছেন বলে দাবি করেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীর সাথে ইউএফওর সংশ্লিষ্টতার কথা অনেকেই তোলেন। এর কারণও অনেক।

১৯৭৮ সালে নিউ অরলিন্স অঙ্গরাজ্যের একটি ফিওয়েতে যাচ্ছিলেন তিনজন মহিলা। তারা হঠাৎ দেখলেন, একটি অদ্ভুত আকাশযান উড়ে যাচ্ছে। তাকে তাড়া করে উড়ে যাচ্ছে মার্কিন বিমানবাহিনীর ১৭টি হেলিকপ্টার। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেলে তাপ অনুভব করলেন তারা। দিগন্তে মিলিয়ে গেল হেলিকপ্টার আর আকাশযান। তখন কিছু বুঝতে না পারলেও রাতে শুরু হলো প্রদাহ। চোখ জ্বলছে, শরীর জ্বলছে। সবারই একই অবস্থা। পরদিন তারা স্থানীয় ডাক্তারের

কাছে সব কিছু খুলে বললেন। ডাক্তার স্থানীয় এক পত্রিকাকে ঘটনাটি জানালেন। পত্রিকার কাছে অভিযোগ এসেছে, আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে ৬-৭টি হেলিকপ্টার একত্রে উড়ে গেছে। রাস্তার ওপর ফাটল চিহ্ন দেখা গেছে। কিছুদিন পর পুলিশ রাস্তায় রোডব্লক বসিয়ে রাস্তা মেরামত করে। অনেকে একে 'কন্সপিরেসি' বলে আখ্যা দেন এবং বলেন, ইউএস এয়ারফোর্স অন্তত একটি ভিনগ্রহী আকাশযান আটকে রেখেছে। তা অস্বীকার করল বিমানবাহিনী; কিন্তু এরপরও ইউএফও নিয়ে রহস্য থেকেই গেছে। আজও এদের সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায় নি।'

এটা একটা জাতীয় দৈনিকের নিউজ। যদিও সংবাদে ফ্লাইং সোসার্সের সাথে ইলুমিনাতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয় নি, তবুও আমরা জানি যে, মূলত আমেরিকা ইলুমিনাতির একটা উপনিবেশ এবং আমেরিকার সেনাবাহিনী ইলুমিনাতি নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও ইলুমিনাতির হেডকোয়ার্টার হিসেবে বিখ্যাত বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল এবং ড্রাগন ট্রায়াঙ্গেলের আকাশে এরকম উদ্ভট জিনিস ওড়াউড়ি করতে দেখা গেছে, যার বর্ণনা ফ্লাইং সোসার্সের সাথে মেলে। বিভিন্ন বর্ণনাতে দেখা যায়, এগুলোতে অদ্ভুতভাবে আগুন লেগে গেছে। আবার এগুলো কখনো পানির ভেতর ঢুকে যেতে দেখা গেছে, কখনো পানি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। ফ্লাইং সোসার্স যেমন শক্তিশালী, দ্রুতগামী বাহন; একমাত্র ইলুমিনাতির মতো শক্তিশালী সংগঠনের বাহন হিসেবেই এটা মানায়।[১১৬]

---

১১৬ *যুগান্তর*, ৬ জানুয়ারি, ২০১৪; *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯; লিংক : https//m.youtube.com>watch

[৩০]
বিশ্ব নেতাদের নির্জলা মিথ্যাচার; কীসের আলামত?

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর দৈনিক গড়ে ১৬.৫টি মিথ্যা বলেন ট্রাম্প!

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইতোমধ্যে দুই বছর পূর্ণ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তারপরই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছে একটি মার্কিন সংবাদপত্র। তাদের দাবি, এই দুই বছর বা ৭৩০ দিনে ট্রাম্প ৮ হাজার ১৫৮টি মিথ্যা, ভূয়া বা বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করেছেন! যা দিনে গড়ে ১১টিরও বেশি! দ্বিতীয় বছরে সেই হার বেড়ে দৈনিক গড়ে ১৬.৫টি হয়েছে। কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান এমন লজ্জার নজির গড়েছেন কি না, বলা কঠিন; কিন্তু তাতে কোনও হেলদোল নেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের। উল্টো যত দিন গেছে, ট্রাম্পের 'মিথ্যা বলার' গতি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরে ট্রাম্প দৈনিক গড়ে ৫.৯ টি করে মিথ্যা বলতেন। দ্বিতীয় বছরে সেই হার দৈনিক গড়ে ১৬.৫টি, প্রথম বছরের প্রায় তিনগুণ! ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত রিপোর্টে আমেরিকা তো বটেই, বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে গেছে।

প্রতিবেদনের জন্য ট্রাম্পের প্রতিটি সন্দেহজনক বিবৃতি ও মন্তব্যের ক্ষেত্রে 'ফ্যাক্ট চেকার্স'-এর তথ্যভান্ডার উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে, সেটি ভূয়া বা মিথ্যা কি না। যার মোট সংখ্যা ৮ হাজার ১৫৮। তার মধ্যে দ্বিতীয় বছরেই ট্রাম্প এমন ছয় হাজারটি মিথ্যা বলেছেন।

প্রেসিডেন্ট পদে বসার প্রথম একশো দিনে কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়া ৪৯২টি মন্তব্য করেছিলেন। আর চলতি বছরের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই তা টপকে গেছেন। সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রাক্কালে। সেই সময় সংখ্যাটি পৌঁছে গিয়েছিল ১২০০-য়।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ট্রাম্প সবচেয়ে বেশি মিথ্যা বলেছেন এবং তথ্য দিয়েছেন অভিবাসন ইস্যুতে। এ-ক্ষেত্রে তার 'কৃতিত্ব' ১ হাজার ৪৩৩টি মিথ্যা বলার। দুই এবং তিন নম্বরে যথাক্রমে রয়েছে বিদেশ নীতি (৯০০) ও বাণিজ্য (৮৫৪)

সংক্রান্ত তথ্য। অর্থনীতি (৭৯০) এবং কর্মসংস্থান (৭৫৫) রয়েছে চার ও পাঁচ নম্বরে।

তবে ২০১৬-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত তদন্ত নিয়ে তার ভিত্তিহীন দাবি মাত্র ১৯২টি! ওয়াশিংটন পোস্টের ব্যাখ্যা, প্রেসিডেন্টের প্রথম একশো দিনেই মিথ্যা বলার নজিরের সঙ্গে তারা তাল মেলাতে পারছিল না। তাই এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল, যাতে হিসেব রাখা যায়। তবে ব্যতিক্রমও কিন্তু আছে। গত দু'বছরে ৮২ দিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনো মিথ্যা বলেন নি! কারণ, সে ক'দিন তিনি গল্ফ খেলতে ব্যস্ত ছিলেন।

একবার ভাবুন তো, একা ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি এত মিথ্যাচার করতে পারে তাহলে অন্যান্য ব্যক্তি যারা আছে তারা কি পরিমাণ মিথ্যা দৈনিক আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে? হলুদ মিডিয়ার কাজই হলো, এরকম একটা মিথ্যাকে বার বার বলার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষের সামনে তা সত্য হিসেবে উপস্থাপন করা; এবং সত্য ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া, যাতে বাইরের দুনিয়ার মানুষ তা জানতে না পারে।

এহেন করুণ অবস্থায় সাধারণ মুসলিমদের করণীয় হওয়া উচিত, বিশ্ব ব্যক্তিত্ব, জাতিসংঘ ইত্যাদি সংস্থাগুলোর কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস না রাখা এবং বিশ্ব মিডিয়ার প্রত্যেকটা কথা যাচাই-বাছাই করে তারপর বিশ্বাস করা। তারা মিথ্যা বলতে পারে কারণ তাদের কোনো ধর্ম নেই। শয়তানের পূজারীরা শয়তানকে খুশি করতে প্রচুর মিথ্যা বলতে পারে; কিন্তু আমরা মুসলিম, আমাদের ধর্মই হলো সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১১৭]

ট্রাম্পের খুনের ভবিষ্যদ্বাণী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'ইলুমিনাতি' নামক গুপ্ত সংগঠনের আততায়ীদের হাতে খুন হবেন। ২০ বছর আগে প্রকাশিত একটি কার্ড খেলায় অন্তর্ভুক্ত 'ভবিষ্যৎবাণী' বিশ্লেষণ করেই এমনটা আশঙ্কা করা হচ্ছে।

১১৭ তথ্যসূত্র : ওয়াশিংটন পোস্ট, মার্কিন পত্রিকা

‘ইলুমিনাতি : দ্য গেম অফ কন্সপিরেসি’

‘ইলুমিনাতি : দ্য গেম অফ কন্সপিরেসি’ নামক এই খেলাটি ১৯৯৫ সালে মুক্তি পায়। এটি প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যু এবং ৯/১১ সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যৎবাণী করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিকরা বলেন, এই খেলার নির্মাতা স্টিভ জ্যাকসন কার্ডের মাধ্যমে পৃথিবীতে ঘটতে যাওয়া সব বড় ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, ইলুমিনাতির আততায়ীদের হাতে একদিন ট্রাম্প মারা পড়বেন, খেলাটিতে এমন ইঙ্গিত আছে।

ইলুমিনাতির ষড়যন্ত্রতত্ত্ব মতে, এই গুপ্ত সংস্থাটি পর্দার আড়ালে থেকে বিশ্বের সব সরকারকে চালায়; এবং ধীরে ধীরে তারা একটি নতুন বিশ্বব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সব ক্ষমতা ওই সংগঠনের হাতে একীভূত হবে। আবার উগ্রপন্থী তাত্ত্বিকরা বলেন, ইলুমিনাতি শতভাগ শয়তানের পূজারী গোষ্ঠী। একদিন তারা শয়তানের রাজত্ব কায়েম করতে চায়। ইলুমিনাতির সাথে ট্রাম্পের সম্পর্ক রয়েছে বলে যে অভিযোগ আছে ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিকরা তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন। তাদের মতে ট্রাম্প সম্পূর্ণরূপে ইলুমিনাতি বহির্ভূত একজন লোক। এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তিনি ইলুমিনাতির পথে বরং কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এজন্যই কার্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

‘এনাফ ইজ এনাফ’ শিরোনামের এই কার্ডটিতে আকা মুখচ্ছবির সাথে ২০১১ সালে তোলা ট্রাম্পের একটি ছবির হুবহু মিল রয়েছে বলে দাবি তাদের। কার্ডটিতে আরও লেখা আছে, যে কোনো সময়, যে কোনো জায়গায়, আমাদের আততায়ী তোমাকে স্নাইপার দিয়ে গুলি করে হত্যা করবে... সে পর্যন্ত ভালো থেকো। বেশিরভাগ ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক এই হুমকি সরাসরি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন। ধনকুবের ট্রাম্প যখন নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন, একবার তাকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয় বলে দাবি তাদের। মাইকেল স্যান্ডফোর্ড নামক ২১ বছর বয়সী এক ব্রিটিশ যুবককে ওই ঘটনার জন্য এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের ১৮ জুন স্যান্ডফোর্ড পুলিশের কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে ট্রাম্পকে গুলি করতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এর আগে স্যান্ডফোর্ডকে প্রতিবন্ধী বলেই সবাই জানত।

এই বিতর্কিত খেলাটি ১২ বছর বয়সোর্ধ যে কেউ খেলতে পারে, যেখানে একটি গুপ্ত সংগঠনের সদস্য হয়ে পৃথিবী শাসন করতে হয়। সাদা চোখে দেখলে, এটিকে নিছক খেলা মনে হতে পারে; কিন্তু খেলায় যেসব ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল তা অনেকক্ষেত্রে হুবহু মিলে গেছে। টেররিস্ট নুক' নামক কার্ডের সাথে ৯/১১ হামলার সাদৃশ্য রয়েছে। 'প্রিন্সেস ডি' নামক কার্ডে প্রিন্সেস ডায়নার মৃত্যু সম্পর্কে লেখা আছে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়াও কিছু ভবিষ্যৎবাণী ইলুমিনাতি করেছে যার মধ্যে ২০১৪ সালে বিশ্বকাপের তিন মাস আগে জার্মানির চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৯৭ সালে ইবোলা ভাইরাসের ইঙ্গিত দিয়েছিল ইলুমিনাতি, যা ১৭ বছর পর ২০১৪ সালে ব্রেকডাউন হয়। ইলুমিনাতি মূলত তাদের শক্তিমত্তা প্রদর্শন এবং তাদের অপ্রতিরোধ্য অপরাজেয় শক্তির চ্যালেঞ্জ হিসেবে মাঝে মাঝেই আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ক্লু দিয়ে থাকে; কিন্তু আমরা এতটাই বোকা যে অনেকাংশে সেই ক্লু বুঝবার ক্ষমতাও আমাদের নেই।[১১৮]

---

১১৮ ইলুমিনাতি : দ্যা গেম অভ কন্সপিরেসি'-র ভবিষ্যদ্বাণী অবলম্বনে

[৩১]

হলুদ মিডিয়া; ইলুমিনাতির প্রভুভক্ত কুকুর

পুরো পৃথিবী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ইলুমিনাতি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে প্রভুভক্ত আদর্শহীন মিডিয়াগুলোকে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে ধ্রুব সত্যরূপে পৃথিবীর মানুষের সামনে উপস্থাপনের মাধ্যমে এরা মূলত মানবতার সাথে শত্রুবৈরী আচরণ করছে। এমতাবস্থায় মুসলিম সাংবাদিকরা কেবল চাকরি হারানোর ভয়ে আপন ধর্মের উপহাস-মশকারা সহ্য করে নিতে পারে?

এটি কোনো সংগঠনের যুদ্ধ নয়। না কোনো রাষ্ট্রের, না বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর; বরং এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত ও ইবলিসের গোলামদের মধ্যকার লড়াই। বিশেষ কোনো বিভাগে নয়—এই যুদ্ধ চলছে মানবজীবনের সবক'টি অঙ্গনে; কিন্তু মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত কা'ব ইবনে আশরাফের উত্তরসূরিদেরকে আপন নবীর দ্বীন-ধর্ম নিয়ে তামাশা করতে দেখে কীভাবে নীরব থাকবে?

নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার-মাধ্যমের গুরুত্বকে কখনো অবহেলা করেন নি; বরং মিডিয়াযুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সে-যুগের প্রচলিত প্রচারমাধ্যমকে সময় ও সুযোগমতো পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইসলামপূর্ব যুগে কাবার দেওয়ালকে সাইনবোর্ড হিসেবে ব্যবহার করা হতো। কাফেররা বিভিন্ন কুৎসামূলক কথা রটনা করত। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাসূলের কবি' খ্যাত হজরত হাসসান বিন সাবিত রাজিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন—

> 'হাসসান, আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে জবাব দাও। আল্লাহ রুহুল কুদস (জিবরাইল) দ্বারা তোমাকে সাহায্য করবেন।' নির্দেশ পালনার্থে হযরত হাসসান বিন সাবিত রা. নিজের

> ইলহামি কাসিদার সাহায্যে কাফের-মুশরিক ও ইসলামের শত্রুদের এমন দাঁতভাঙা জবাব দিতেন যে, তাদের কয়েক পুরুষ পর্যন্ত তারা একথা ভুলতে পারত না।[১১৯]

এক বর্ণনায় আছে—

> নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য মিম্বর স্থাপন করেছিলেন। সেই মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে জবাব দিতেন।[১২০]

একবার আরবের এক গোত্র নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাব্য ও বক্তৃতা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ করে বসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণও করলেন। তিনি 'রাসূলের কবি' খ্যাত হজরত হাসসান বিন সাবেত রাজিয়াল্লাহু আনহু এবং 'খতিবে রাসুল' খ্যাত সাম্মাস বিন কায়েস রাজিয়াল্লাহু আনহুকে মোকাবিলার জন্য নির্বাচন করলেন। দু'জনই কবিতা আবৃত্তি ও বাকশৈলীর চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী করলেন। বৈঠক শেষে মুসলিম কবি ও বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবাই স্বীকার করে নিল।[১২১]

উমরাতুল কাজার সময় যখন রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামের হালতে তার প্রতি প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করছিলেন, তখন রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সামনে চলে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বীরত্বের সঙ্গে কিছু কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। ওই পংক্তিগুলোতে রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদব ও সম্মানের প্রসঙ্গ যেমন ছিল তেমনি কাফেরদের প্রতি ধমকি ও তাচ্ছিল্যও ছিল। উমর রাজিয়াল্লাহু তাকে বারণ করার চেষ্টা করলে নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'উমর, তাকে কবিতা আবৃত্তি করতে দাও। এটা ওই দুষ্ট লোকদের ওপর তির ছুঁড়ে মারার চেয়েও বেশি কার্যকরী।'

---

১১৯ সহিহ বুখারি : ৩২১২; সহিহ মুসলিম: ২৪৮৫

১২০ জামি তিরমিজি : ২৮৪৬; সুনানু আবি দাউদ : ৫০১৫

১২১ সিরাতু ইবনে হিশাম : ২/৫৬২

দুশমনের নাকের ডগায় পৌঁছে তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলার এর চেয়ে সুন্দর পদ্ধতি আর কী হতে পারে! কেননা, হুদাইবিয়ার চুক্তিপত্রে 'অস্ত্র প্রদর্শনীর' ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, কিন্তু 'কবিতা আবৃত্তির' ওপর কোনো বাধা ছিল না।[১২২]

প্রচারণার প্রচলিত ও সহজলভ্য পদ্ধতি ব্যবহারের পাশাপাশি নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইহুদি প্রচার-মাধ্যম'-এর প্রতিরোধের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কাব ইবনে আশরাফ ইহুদি প্রোপাগান্ডার এক শক্তিশালী ভিত ছিল। তার যেমন অঢেল সম্পদ ছিল তেমনি সে ছিল একজন শক্তিমান কবি। নারীদের অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেও তাকে গণ্য করা যায়। কবিতায় মুসলিম নারীদের নাম ধরে ধরে কুৎসা রটাত সে। রিসালাতের প্রতি কটূক্তিকারীদের আশ্রয়স্থল ও সাহায্যকারীও ছিল এই নরাধম। বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান এবং মক্কার কাফেরদের সংঘবদ্ধ করার জন্য পুরো মক্কা মুকাররমা চষে বেড়াত। কাফেরদের সমাবেশে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি কটূক্তি করে কবিতা পাঠ করে শোনাত। নবী করীম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হজরত মুহাম্মদ ইবনে সালামা রাজিয়াল্লাহু আনহু ওই অভিশপ্তকে খতম করেন এবং চিরদিনের জন্য তার মুখ বন্ধ করে দেন।[১২৩]

ইহুদি আবু রাফে 'কুফুরি সাংবাদিকতার' (এটাকে যদি সাংবাদিকতা বলা হয়) সবচেয়ে বড় আর্থিক সহায়তাকারী ছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে পানির মতো পয়সা ব্যয় করত সে। অসৎ ও উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কবিদের সেবায় দিরহাম-দিনারের থলি পৌঁছে দিত। কবিরা যেন জীবন-জীবিকার দিক থেকে সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিডিয়াযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে, এর সব ব্যবস্থা সে করে দিত। দ্বীনি জজবায় উজ্জীবিত কয়েকজন নও মুসলিম তাকেও তার চিরস্থায়ী ঠিকানা জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার মৃত্যু-সংবাদ পেলেন

---

১২২ জামি তিরমিজি : ২৮৫১

১২৩ সহিহ বুখারি : ২৫১০; সহিহ মুসলিম : ১৮০১; সুনানু আবি দাউদ : ১৭৬৮

অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং ওই ভয়াবহ শত্রুকে যারা জাহান্নামে পাঠিয়েছেন তাদের কামিয়াবীর জন্য দুআ করলেন।[১২৪]

শেষোক্ত দুটি ঘটনায় ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডা ছাড়াও ছিল ইসলামবিরোধী অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং শান্তিপূর্ণ সহানস্থানের চুক্তি ভঙ্গের মতো অমার্জনীয় কিছু উপাদান ও উপলক্ষ্য। তাছাড়াও এসব ঘটনার কারণ ও অন্তর্নিহিত রহস্য বিভিন্ন ধরনের হতে পারে; কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে একথা বলতে পারি, ওই যুগে প্রচলিত মিডিয়াকে রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের উপকার ও ফায়দার জন্য পূর্ণাঙ্গরূপে ব্যবহার করেছেন। মিডিয়া আগ্রাসন ও ইসলামবিরোধী প্রোপাগান্ডার বিষয়টিকে তিনি সামান্যও এড়িয়ে যান নি বা উপেক্ষা করেন নি। আধুনিক প্রযুক্তি যখন থেকে প্রচার মাধ্যমে উৎকর্ষ সাধন করে এবং বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তির পাশাপাশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা যুক্ত হয় তখন থেকে মিডিয়ায় এক নতুন বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যায়। ঘরের কোণায় কোণায় পর্যন্ত দুশমনদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এতে নারী ও শিশুদের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। মিডিয়ায় ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমনদের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হয়। বর্তমানে প্রায় পুরো মিডিয়া জগৎটা পশ্চিমা পদলেহী ইহুদি-খ্রিস্টানদের এজেন্টে ছেয়ে গেছে। মানবিক মূল্যবোধের ধারণাটাই তারা পাল্টে দিয়েছে। মিথ্যাকে সত্য এবং বাতিলকে হক বানিয়ে পেশ করা হচ্ছে। বাণিজ্যিক রেডিও-টেলিভিশনগুলো সংবাদের শুরুতে এবং সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় অথবা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কুরআনের কোনো আয়াত অথবা হাদিসে নববির তরজমা প্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে, পুরো সংবাদ অথবা পুরো প্রোগ্রামে ইসলামের স্পিরিট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইসলামের লেভেল লাগিয়ে দেওয়ার পর চাই উগ্র বিনোদনের উলঙ্গ উন্মাদনায় মেতে উঠছে প্রতিনিয়ত। সর্বোপরি মিডিয়ায় ইসলাম ও মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে একতরফা যুদ্ধ চলছে। সাংস্কৃতিক দুর্বৃত্তরা ভদ্রতা ও মানবিকতার চেহারা ঢেকে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাচ্ছে। মানবতাবিধ্বংসী কালচারে আজ ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক।

---

১২৪ সহীহ বুখারি : ৩০২২, ৩০২৩

এক্ষেত্রে আপনি একজন মিডিয়াকর্মী মানে আপনি একজন ইসলামের আমানতদার। আপনার কলমের উত্তাপ যেন ইসলামের আলোকে প্রজ্জলিত রাখে, সেক্ষেত্রে সজাগ থাকতে হবে। আপনি বিশ্বাস রাখেন, আপনার রব আপনার জন্য এই জগতের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত জগত তৈরি করে রেখেছেন।[১২৫]

---

১২৫ Bangladesh news 24×7.Com; দৈনিক সংগ্রাম, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৬; 'তথ্য সন্ত্রাস ও মিডিয়া জগৎ' শীর্ষক প্রতিবেদন অবলম্বনে।

[৩২]

দাজ্জাল : যার আগমনের প্রতীক্ষায় ইলুমিনাতি

ইলুমিনাতির এই বিরাট কর্মযজ্ঞের পেছনে চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো তাদের প্রভু লুসিফার, শয়তান বা দাজ্জালের জন্য আদর্শ পৃথিবী তৈরি করে রাখা। যেন তাদের প্রভু মাসিহ্-আদ-দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেই পৃথিবীর তথাকথিত 'প্রকৃত নিয়ন্ত্রক' বা 'গড' হয়ে কর্তৃক হাতে তুলে নিতে পারেন। নিচের হাদিসগুলো পড়লে বিষয়টা পরিষ্কার পানির মতো স্বচ্ছ হয়ে যাবে।

হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী আখেরি জামানায় কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। দাজ্জালের আগমন কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে বড় আলামত। মানবজাতির জন্যে দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যে-সব মুমিন জীবিত থাকবে তাদের জন্য ঈমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। সকল নবীই আপন উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় বলে দিয়েছেন।

ইবনে উমর রাজিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন—

> একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন; কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলবো—যা কোনো নবীই তার উম্মাতকে বলেন নি। তা হলো—দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন।[১২৬]

---

১২৬ সহিহ বুখারি : ৩০৫৫, ৩৩৩৭; সহিহ মুসলিম : ১৬৯, ১৭১

নাওয়াস বিন সামআন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

> একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকালবেলা আমাদের কাছে দাজ্জালের বর্ণনা করলেন। তিনি তার ফিতনাকে খুব বড় করে তুলে ধরলেন। বর্ণনা শুনে আমরা মনে করলাম নিকটস্থ খেজুরের বাগানের পাশেই সে হয়তো অবস্থান করছে। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা আবার তার কাছে গেলাম। এবার তিনি আমাদের অবস্থা বুঝে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কী হলো? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি যেভাবে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন তা শুনে আমরা ভাবলাম হতে পারে সে খেজুর বাগানের ভেতরেই রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দাজ্জাল ছাড়া তোমাদের ওপর আমার আরও ভয় রয়েছে। আমি তোমাদের মাঝে জীবিত থাকতেই যদি দাজ্জাল আগমন করে তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া আমি একাই তার বিরুদ্ধে ঝগড়া করবো। আর আমি চলে যাওয়ার পর যদি সে আগমন করে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজেকে হিফাজত করবে। আর আমি চলে গেলে আল্লাহই প্রতিটি মুসলিমকে হিফাজতকারী হিসেবে যথেষ্ট।[১২৭]

দাজ্জালের পরিচয়

দাজ্জাল মানবজাতিরই একজন হবে। মুসলিমদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরার জন্যে এবং তার ফিতনা থেকে তাদেরকে সতর্ক করার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পরিচয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। মুমিন বান্দাগণ তাকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে এবং তার ফিতনা থেকে নিরাপদে থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যে সব পরিচয় উল্লেখ করেছেন মুমিনগণ তা পূর্ণ অবগত থাকবে। দাজ্জাল অন্যান্য মানুষের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। জাহেল-মূর্খ ও হতভাগ্য ব্যতীত কেউ দাজ্জালের ধোঁকায় পড়বে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালকে স্বপ্নে দেখে তার শারীরিক গঠনের বর্ণনাও প্রদান করেছেন। তিনি বলেন—

---

১২৭ জামি তিরমিজি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান; সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১২৩

দাজ্জাল হবে বৃহদাকার একজন যুবক পুরুষ, শরীরের রং হবে লাল, বেঁটে, মাথার চুল হবে কোঁকড়া, কপাল হবে উঁচু, বক্ষ হবে প্রশস্ত, চক্ষু হবে টেরা এবং আঙুর ফলের মতো উঁচু।[১২৮]

দাজ্জালের কোন্ চোখ কানা থাকবে?

বিভিন্ন হাদিসে দাজ্জালের চোখ অন্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল অন্ধ হবে। কোনো হাদিসে আছে, তার ডান চোখ অন্ধ হবে; আবার কোনো হাদিসে আছে, তার বাম চোখ হবে অন্ধ। মোটকথা, তার একটি চোখ দোষযুক্ত হবে। তবে ডান চোখ অন্ধ হওয়ার হাদিসগুলো *সহিহ বুখারি* ও *মুসলিম শরিফে* বর্ণিত হয়েছে।[১২৯]

তাছাড়া দাজ্জালকে চেনার সবচেয়ে বড় আলামত হলো, তার কপালে 'কাফির' লেখা থাকবে।[১৩০] প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তিই তা পড়তে পারবে।[১৩১] অপর বর্ণনায় আছে শিক্ষিত-অশিক্ষত সকল মুসলিমই তা পড়তে পারবে।[১৩২] অর্থাৎ, আল্লাহ মুমিনের জন্যে অন্তদৃষ্টি খুলে দেবেন। ফলে সে দাজ্জালকে দেখে সহজেই চিনতে পারবে। কাফের ও মুনাফিক লোক তা দেখেও পড়তে পারবে না। যদিও সে শিক্ষিত ও পড়ালেখা জানা লোক হোক না কেন।[১৩৩] কারণ কাফের ও মুনাফিক আল্লাহর অসংখ্য সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ দেখেও ঈমান আনয়ন করে নি।

দাজ্জালের ফিতনাসমূহ ও তার অসারতা

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা আর নেই। সে এমন অলৌকিক বিষয় দেখাবে যা দেখে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়বে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু ও আল্লাহ হিসেবে দাবি করবে। তার দাবির

---

১২৮ সহিহ বুখারি, অধ্যায়, কিতাবুল ফিতান : 'দাজ্জাল নির্বংশ হবে; তার কোনো সন্তান থাকবে না।'

১২৯ বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং -৭১২৮

১৩০ সহিহ বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং-৭১৩১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৯৩৩;

১৩১ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

১৩২ সহিহ মুসলিম, শরহুন নববীর সাথে ১৮/৬১

১৩৩ শরহুন নববি : ১৮/৬১, ফাতহুল বারি, ১৩/100;

পক্ষে এমন কিছু প্রমাণও উপস্থাপন করবে যে সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই সতর্ক করেছেন। মুমিন বান্দাগণ এগুলো দেখে মিথ্যুক দাজ্জালকে সহজেই চিনতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পাবে; কিন্তু দুর্বল ঈমানদার লোকেরা বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমানহারা হবে। দাজ্জাল নিজেকে রাব্ব বা প্রভু হিসেবেও দাবি করবে। ঈমানদারের কাছে এ দাবি সুস্পষ্ট দিবালোকের মতো মিথ্যা বলে প্রকাশিত হবে। দাজ্জাল তার দাবির পক্ষে যত বড় অলৌকিক ঘটনাই পেশ করুক না কেন, মুমিন ব্যক্তির কাছে এটি সুস্পষ্ট হবে যে সে একজন অক্ষম মানুষ; পানাহার করে, নিদ্রা যায়, পেশাব-পায়খানা করে। সর্বোপরি যার ভেতরে মানবীয় সব দোষ-গুণ বিদ্যমান সে কীভাবে রব্ব ও আল্লাহ হতে পারে!

দাজ্জাল বর্তমানে কোথায় আছে

ফাতিমা বিনতে কাইস রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

> আমি মসজিদে গমন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামাজ আদায় করলাম। আমি ছিলাম নারীদের কাতারে। তিনি নামাজ শেষে হাসতে হাসতে মিম্বারে উঠে বসলেন। প্রথমেই তিনি বললেন, প্রত্যেকেই যেন আপন আপন জায়গায় বসে থাকে। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো, আমি কেন তোমাদের একত্র করেছি? তারা বললেন, আল্লাহ এবং তার রাসুলই ভালো জানেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে এ সংবাদ দেওয়ার জন্যে একত্রিত করেছি যে তামিম দারি ছিল একজন খ্রিস্টান লোক। সে আমার কাছে আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। অতঃপর সে মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে এমন ঘটনা বলেছে—যা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করতাম। লাখম ও জুজাম গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সাথে সে সাগর পথে ভ্রমণে গিয়েছিল। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার শিকার হয়ে এক মাস পর্যন্ত তারা সাগরেই ছিল। অবশেষে তারা সাগরের মাঝখানে একটি দ্বীপে অবতরণ করল। দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করে তারা মোটা মোটা এবং প্রচুর চুলবিশিষ্ট একটি অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পেল। চুল দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত থাকার কারণে প্রাণীটির অগ্রপশ্চাৎ নির্ধারণ করতে সক্ষম হলো না। তারা বলল, অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বলল, আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। তারা বলল, কীসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে একটি ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, হে লোকসকল, তোমরা এই ঘরের ভেতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্যে অধীর

আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তামিম দারি বলেন, প্রাণীটি যখন একজন লোকের কথা বলল তখন আমাদের ভয় হলো যে, হতে পারে সে শয়তান। তথাপিও আমরা ভীত মনে দ্রুত অগ্রসর হয়ে ঘরটির ভেতরে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করে আমরা বৃহদাকার একটি মানুষ দেখতে পেলাম। এত বড় আকৃতির মানুষ আমরা ইতোপূর্বে আর কখনো দেখি নি। তার হাত দু'টিকে ঘাড়ের সাথে একত্রিত করে হাঁটু এবং গোড়ালির মধ্যবর্তী স্থানে লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে রাখা হয়েছে। আমরা বললাম, মরণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বলল, তোমরা আমার কাছে আসতে সক্ষম হয়েছ তাই আগে নিজেদের পরিচয় দাও। আমরা বললাম, আমরা একদল আরব মানুষ নৌকায় আরোহণ করলাম। সাগরের প্রচণ্ড ঢেউ আমাদেরকে নিয়ে একমাস পর্যন্ত খেলা করল। অবশেষে আমরা এই দ্বীপে উঠতে বাধ্য হলাম। দ্বীপে প্রবেশ করেই প্রচুর পশমবিশিষ্ট এমন একটি জন্তুর সাক্ষাৎ পেলাম, প্রচুর পশমের কারণে যার অগ্রপশ্চাৎ চেনা যাচ্ছিল না। আমরা বললাম, অকল্যাণ হোক তোমার! কে তুমি? সে বলল, আমি সংবাদ সংগ্রহকারী গোয়েন্দা। আমরা বললাম, কীসের সংবাদ সংগ্রহকারী? অতঃপর প্রাণীটি দ্বীপের মধ্যে এই ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, হে লোক সকল, তোমরা এই ঘরের ভেতরে অবস্থানরত লোকটির কাছে যাও। সে তোমাদের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাই আমরা তার ভয়ে তোমার কাছে দ্রুত আগমন করলাম। হতে পার তুমি একজন শয়তান—এ ভয় থেকেও আমরা নিরাপদ নই। সে বলল, আমাকে তোমরা বাইসান সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, বাইসানের কী সম্পর্কে জানতে চাও? সে বলল, আমি তথাকার খেজুরের বাগান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। সেখানের গাছগুলো এখনো ফল দেয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বলল, সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন গাছগুলোতে কোনো ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, আমাকে বুহাইরাতুত্ তাবারিয়া (Sea of Galilee) সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, বুহাইরাতুত্ তাবারিয়ার কী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? সে বলল, আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনো পানি আছে? আমরা বললাম, তথায় প্রচুর পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তথাকার পানি শেষ হয়ে যাবে। সে পুনরায় বলল, আমাকে জুগার নামক ঝরনা সম্পর্কে সংবাদ দাও। আমরা তাকে বললাম, সেখানকার কী সম্পর্কে তুমি জানতে চাও? সে বলল, আমি জানতে চাই সেখানে কি এখনো পানি আছে? লোকেরা কি এখনো সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে? আমরা বললাম, তথায় প্রচুর পানি রয়েছে। লোকেরা সে পানি দিয়ে চাষাবাদ করছে। সে আবার বলল, আমাকে উম্মিদের নবী সম্পর্কে জানাও। আমরা বললাম, সে মক্কায় আগমন করে বর্তমানে মদিনায় হিজরত করেছে। সে বলল, আরবরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছে? বললাম,

হ্যাঁ। সে বলল, ফলাফল কী হয়েছে? আমরা তাকে সংবাদ দিলাম যে, পার্শ্ববর্তী আরবদের ওপর তিনি জয়লাভ করেছেন। ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। সে বলল, তাই নাকি? আমরা বললাম তাই। সে বলল, তার আনুগত্য করাই তাদের জন্য ভালো। এখন আমার কথা শোনো, আমি হলাম দাজ্জাল। অচিরেই আমাকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি বের হয়ে চল্লিশ দিনের ভেতরে পৃথিবীর সমস্ত দেশ ভ্রমণ করবো। তবে মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করা আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। যখনই আমি মক্কা বা মদিনায় প্রবেশ করতে চাইবো তখনই ফেরেশতাগণ কোষমুক্ত তলোয়ার হাতে আমাকে তাড়া করবে। মক্কা-মদিনার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ পাহারা দেবে। হাদিসের বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের লাঠি দিয়ে ঘাত করতে করতে বললেন, এটাই মদিনা, এটাই মদিনা, এটাই মদিনা। অর্থাৎ এখানে দাজ্জাল আসতে পারবে না।[১৩৪] অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে লক্ষ্য করে বললেন, তামিম দারির এই বর্ণনাটি আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তার বর্ণনা আমার বর্ণনার অনুরূপ হয়েছে। বিশেষ করে মক্কা ও মদিনা সম্পর্কে। শুনে রাখো, সে ভূমধ্য সাগরে অথবা আরবসাগরে আছে। তা নয়, বরং সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। সে আছে পূর্ব দিকে। এই বলে তিনি পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন। ফাতিমা বিনতে কায়েস বলেন, আমি এই হাদিসটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে মুখস্থ করে রেখেছি।[১৩৫]

দাজ্জালের যে-সব ক্ষমতা দেখে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়বে—

→ এক. একস্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুত পরিভ্রমণ : নাওয়াস বিন সামআন থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাজ্জালের চলার গতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ‘দ্রুতগামী বাতাস বৃষ্টিকে যেভাবে চালিয়ে নেয় দাজ্জালের চলার গতিও সেরকম হবে।[১৩৬] তিনি আরও সংবাদ দিয়েছেন যে মক্কা ও মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর

১৩৪ সহিহ বুখারি হাদিস নং-১৮৮১; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং-২৯৪৩;

১৩৫ সহিহ মুসলিম : ২৯৪২, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

১৩৬ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান, হাদিস নং : ২৯৩৭; জামি তিরমিজি, হাদিস নং-২২৪০;

সমস্ত অঞ্চল সে পরিভ্রমণ করবে। মক্কা ও মদিনার সমস্ত প্রবেশ পথে ফেরেশতাগণ তলোওয়ার হাতে নিয়ে পাহারা দেবে।

→ দুই. দাজ্জালের সাথে থাকবে জান্নাত-জাহান্নাম : দাজ্জালের সাথে জান্নাত এবং জাহান্নাম থাকবে। প্রকৃত অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। দাজ্জালের জাহান্নামের আগুন প্রকৃতপক্ষে সুমিষ্ট পানি এবং তার জান্নাতই হবে মূলত জাহান্নামের আগুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—দাজ্জালের সাথে যা থাকবে তা আমি জানি। তার সাথে দুটি প্রবাহিত নদী থাকবে। বাহ্যিকদৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিস্কার পানি দেখা যাবে। অন্যটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যাবে। যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে পান করে।[১৩৭] কারণ, উহা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের উপরে মোটা আবরণ থাকবে। কপালে কাফের লেখা থাকবে। মূর্খ ও শিক্ষিত সকল ঈমানদার লোকই তা পড়তে সক্ষম হবে।[১৩৮]

→ তিন. দাজ্জাল মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করবে : দাজ্জাল তার কর্মকাণ্ডে শয়তানের সহযোগিতা নিবে। শয়তান কেবল মিথ্যা ও গোমরাহি এবং কুফরি কাজেই সাহায্য করে থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জাল মানুষের কাছে গিয়ে বলবে, আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাই তাহলে কি তুমি আমাকে প্রভু হিসেবে মানবে? সে বলবে অবশ্যই মানবো। এ সুযোগে শয়তান তার পিতা-মাতার আকৃতি ধরে বলবে, হে সন্তান, তুমি তার অনুসরণ করো। সে তোমার প্রতিপালক।[১৩৯] আয় আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই!

---

১৩৭ সহিহ বুখারি, হাদিস নং-৭১৩০; সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৯৩৪; এছাড়াও অন্যান্য হাদিসের তথ্যসূত্র : সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, জামি তিরমিজি হাদিসগ্রন্থের 'কিতাবুল ফিতান', বিশেষত 'জিকরুদ দাজ্জাল' অধ্যায়।

১৩৮ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

১৩৯ সহিহুল জামে আস-সাগির, হাদিস : ৭৭৫২

→ চার. জড় পদার্থ ও পশুরাও দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে : দাজ্জালের ফিতনার মাধ্যমে আল্লাহ তার বান্দাদের পরীক্ষা করবেন। দাজ্জাল আকাশকে আদেশ দেবে বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্যে। আকাশ তার আদেশে বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিনকে ফসল উৎপন্ন করতে বলবে। জমিন ফসল উৎপন্ন করবে। চতুষ্পদ জন্তুকে ডাক দিলে তারা দাজ্জালের ডাকে সাড়া দেবে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘরবাড়িকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'দাজ্জাল এক জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। এতে তারা ঈমান আনবে। দাজ্জাল তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আকাশকে আদেশ দেবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে, জমিন ফসল উৎপন্ন করবে এবং তাদের পশুপাল ও চতুষ্পদ জন্তুগুলো অধিক মোটা-তাজা হবে এবং পূর্বের তুলনায় বেশী দুধ প্রদান করবে। অন্য একটি জনসমাজে গিয়ে মানুষকে তার প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানাবে। লোকেরা তার কথা প্রত্যাখ্যান করবে। দাজ্জাল তাদের নিকট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরত আসবে। এতে তারা চরম অভাবে পড়বে। তাদের ক্ষেত-খামারে চরম ফসলহানি দেখা দেবে। দাজ্জাল পরিত্যক্ত ভূমিকে তার নিচে লুকায়িত গুপ্তধন বের করতে বলবে। গুপ্তধনগুলো বের হয়ে মৌমাছির দলের ন্যায় তার পিছে পিছে চলতে থাকবে।[১৪০]

→ পাঁচ. দাজ্জাল একজন মুমিন যুবককে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জাল বের হয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হবে। যেহেতু মদিনায় দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ তাই সে মদিনার নিকটবর্তী একটি স্থানে অবস্থান করবে। তার কাছে একজন মুমিন লোক গমন করবেন। তিনি হবেন ওই জামানার সর্বোত্তম মুমিন। দাজ্জালকে দেখে তিনি বলবেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি সেই দাজ্জাল—যার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সাবধান করেছেন। তখন দাজ্জাল উপস্থিত মানুষকে লক্ষ্য করে বলবে, আমি যদি একে হত্যা করে ফের জীবিত করতে পারি তাহলে কি তোমরা আমার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ

---

১৪০ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। অতঃপর সে ওই মুমিনকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। এ পর্যায়ে যুবকটি বলবে, আল্লাহর শপথ! তুমি যে মিথ্যুক দাজ্জাল—এ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস আগের তুলনায় আরও মজবুত হলো। দাজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে; কিন্তু তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।[১৪১]

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে—

যুবকটি দাজ্জালকে দেখে বলবে, হে লোকসকল, এই সেই দাজ্জাল—যার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাবধান করেছেন। অতঃপর দাজ্জাল তার অনুসারীদের বলবে, একে ধরো এবং প্রহার করো। তাকে মেরে জখম করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে জিজ্ঞেস করবে—এখনো কি আমার প্রতি ঈমান আনবে না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যুবক বলবে, তুমি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। তারপর দাজ্জালের আদেশে তার মাথায় করাত লাগিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলা হবে। দাজ্জাল দু-খণ্ডের মাঝ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করবে। অতঃপর বলবে, উঠে দাঁড়াও। সে উঠে দাঁড়াবে। দাজ্জাল বলবে এখনো ঈমান আনবে না? সে বলবে, তুমি মিথ্যুক দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে এখন আমার বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর সে বলবে, হে লোকসকল, আমার পরে আর কারও সাথে সে এরূপ করতে পারবে না। অতঃপর দাজ্জাল তাকে পাকড়াও করে আবার জবেহ করার চেষ্টা করবে; কিন্তু তার গলায় জবেহ করার স্থানটি তামায় পরিণত হয়ে যাবে। কাজেই সে জবেহ করতে ব্যর্থ হবে। অতঃপর রাগে তার হাতে-পায়ে ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। লোকেরা মনে করবে তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ সে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই ব্যক্তি হবে পৃথিবীতে সেদিন সবচেয়ে মহা সত্যের সাক্ষ্য দানকারী মুমিন।[১৪২]

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

দাজ্জাল বের হওয়ার স্থান সম্পর্কেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা দিয়েছেন। সে পূর্ব দিকের পারস্য দেশ থেকে বের হবে। সেখান থেকে

১৪১ সহিহ বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান
১৪২ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

বের হয়ে সমগ্র দুনিয়া ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা এবং মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। ফেরেশতাগণ সেদিন মক্কা-মদিনার প্রবেশপথসমূহে তরবারি নিয়ে পাহারা দেবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, পূর্বের কোনো একটি দেশ থেকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে—যার বর্তমান নাম খোরাসান।[১৪৩]

দাজ্জাল মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না : সহিহ হাদিসের বিবরণ অনুযায়ী দাজ্জালের জন্যে মক্কা ও মদিনাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। মক্কা ও মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল স্থানেই সে প্রবেশ করবে।[১৪৪]

সে সময় মদিনা শরিফ তিনবার কেঁপে উঠবে এবং প্রত্যেক মুনাফিক এবং কাফেরকে বের করে দেবে। যারা দাজ্জালের নিকট যাবে এবং তার ফিতনায় পড়বে তাদের অধিকাংশই হবে নারী। দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচানোর জন্য পুরুষেরা তাদের স্ত্রী, মা, বোন, কন্যা, ফুফু এবং অন্যান্য স্বজন নারীকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে।

দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন থাকবে? সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন দাজ্জাল পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বলেছেন, সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। প্রথম দিনটি হবে এক বছরের মতো লম্বা, দ্বিতীয় দিনটি হবে এক মাসের মতো, তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহের মতো; আর বাকী দিনগুলো দুনিয়ার স্বাভাবিক দিনের মতোই হবে। আমরা বললাম, যে দিনটি এক বছরের মতো দীর্ঘ হবে সে দিনে কি একদিনের নামাজই যথেষ্ট হবে? উত্তরে তিনি বললেন, না; বরং তোমরা অনুমান করে সময় নির্ধারণ করে নামাজ পড়বে।[১৪৫]

কারা দাজ্জালের অনুসরণ করবে?

দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি, তুর্কি এবং অনারব লোক। তাদের অধিকাংশই হবে গ্রাম্য মূর্খ এবং নারী। ইহুদিরা মিথ্যুক কানা দাজ্জালের অপেক্ষায় রয়েছে। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী দাজ্জাল হবে তাদের বাদশাহ। তার নেতৃত্বে তারা বিশ্ব পরিচালনা করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

১৪৩ জামি তিরমিজি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান
১৪৪ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান
১৪৫ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

বলেন, দাজ্জালের অধিকাংশ অনুসারী হবে ইহুদি এবং নারী।[১৪৬] তিনি আরও বলেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের সবার পরনে থাকবে সেলাইবিহীন চাদর।[১৪৭] গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা মূর্খতার কারণে এবং দাজ্জালের পরিচয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান না থাকার কারণে দাজ্জালের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে তারা ফিতনায় পড়ে যাবে। নারীদের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তারা সহজেই যে কোনো জিনিস দেখে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা হতে রেহাই পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছেন। তিনি উম্মাতকে একটি সুস্পষ্ট দ্বীনের ওপর রেখে গেছেন। সকল প্রকার কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং সকল অকল্যাণের পথ হতে সতর্ক করেছেন। উম্মাতের ওপর যেহেতু দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড়, তাই তিনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে কঠোরভাবে সাবধান করেছেন এবং দাজ্জালের লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। যাতে মুমিন বান্দাদের জন্য এই প্রতারক, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যুক দাজ্জালকে চিনতে কোনোরূপ অসুবিধা না হয়। ইমাম সাফারায়েনি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, প্রতিটি বিজ্ঞ মুসলিমের উচিত তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী-পরিবার এবং সকল নারী-পুরুষদের সামনে দাজ্জালের হাদীসগুলো বর্ণনা করা। বিশেষ করে ফিতনায় পরিপূর্ণ আমাদের বর্তমান সময়ে।

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়গুলো যা হতে পারে—

- ১) ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা : ইসলামকে সঠিকভাবে আঁকড়ে ধরা এবং ঈমানের ওপর অটল থাকাই দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। যে মুমিন আল্লাহর নাম ও তার অতুলনীয় সুমহান গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে সে অতি সহজেই দাজ্জালকে চিনতে পারবে। সে দেখতে পাবে, দাজ্জাল খায়, পান করে। মুমিনের আকিদা এই যে, আল্লাহ তাআলা পানাহার ও

---

১৪৬ মুসনাদে আহমদ

১৪৭ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

অন্যান্য মানবীয় দোষ-গুণ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। যে পানাহারের প্রতি মুখাপেক্ষী সে কখনো আল্লাহ বা রব্ব হতে পারে না। দাজ্জাল হবে অন্ধ; আল্লাহ এরূপ দোষ-ত্রুটির অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী মুমিনগণের মনে প্রশ্ন জাগবে যে নিজের দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে না সে কীভাবে প্রভু হতে পারে? মুমিনের আকিদা হলো, আল্লাহকে দুনিয়ার জীবনে দেখা সম্ভব নয়। অথচ মিথ্যুক দাজ্জালকে মুমিন-কাফের সবাই দুনিয়াতে দেখতে পাবে।

- ২) দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা : আয়িশা রাজিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাজ অবস্থায় দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাইতে শুনেছি।[১৪৮] তিনি নামাযের শেষ তাশাহুদে বলতেন—হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে কবরের আজাব, জাহান্নামের আজাব, জীবন-মরণের ফিতনা এবং মিথ্যুক দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই।[১৪৯]

- ৩) দাজ্জাল থেকে দূরে থাকা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের নিকট যেতে নিষেধ করেছেন। কারণ, সে এমন একজন লোকের কাছে আসবে, যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। দাজ্জালের কাজ-কর্ম দেখে সে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাবে। মুমিনের জন্য উত্তম হলো, সম্ভব হলে সে সময়ে মদিনা অথবা মক্কায় বসবাস করার চেষ্টা করা। কারণ, দাজ্জাল তথায় প্রবেশ করতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দাজ্জাল বের হওয়ার কথা শুনবে সে যেন তার কাছে না যায়। আল্লাহর শপথ! এমন একজন লোক দাজ্জালের নিকটে যাবে, যে নিজেকে ঈমানদার মনে করবে। অতঃপর সে দাজ্জালের সাথে প্রেরিত সন্দেহময় জিনিসগুলো ও তার কাজ-কর্ম দেখে বিভ্রান্তিতে পড়ে ঈমানহারা হয়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই!

---

১৪৮ বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান
১৪৯ বুখারি, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

- ৪) সূরা কাহাফ পাঠ করা : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচতে মুমিনদেরকে সূরা কাহাফ মুখস্থ করতে এবং তা পাঠ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে সে দাজ্জালের ফিতনা হতে হেফাজতে থাকবে।[১৫০]

সূরা কাহাফ পাঠের নির্দেশ সম্ভবত এজন্য হতে পারে যে, এই সূরায় আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর বড় বড় কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মুমিন ব্যক্তি এগুলো গভীরভাবে পাঠ করলে দাজ্জালের বিস্ময়কর ঘটনা দেখে কিছুতেই বিচলিত হবে না। এতে সে হতাশ হয়ে বিভ্রান্তিতেও পড়বে না।

দাজ্জালের শেষ পরিণতি

সহিহ হাদিসের বিবরণ অনুযায়ী ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের হাতে দাজ্জাল নিহত হবে। মক্কা-মদিনা ব্যতীত পৃথিবীর সকল দেশেই সে প্রবেশ করবে। তার অনুসারীর সংখ্যা হবে প্রচুর। সমগ্র দুনিয়ায় তার ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে। সামান্য সংখ্যক মুমিনই তার ফিতনা থেকে রেহাই পাবে। ঠিক সে সময় দামেস্ক শহরের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক মসজিদের সাদা মিনারের ওপর ঈসা আলাইহিস সালাম আকাশ থেকে অবতরণ করবেন। মুসলিমগণ তার পার্শ্বে একত্র হবে। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি দাজ্জালের দিকে রওনা দেবেন। দাজ্জাল সে সময় বাইতুল মাকদিসের দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। অতঃপর ঈসা আ. ফিলিস্তিনের লুদ্দ শহরের গেইটে দাজ্জালকে পাকড়াও করবেন। ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখে সে পানিতে লবণ গলার ন্যায় গলতে শুরু করবে। ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, 'তোমাকে আমি একটি আঘাত করবো—যা থেকে তুমি কখনো রেহাই পাবে না। এরপর ঈসা আলাইহিস সালাম তাকে বর্শা দিয়ে আঘাত করবেন। অতঃপর মুসলমানেরা তার নেতৃত্বে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। মুসলিমদের হাতে দাজ্জালের বাহিনী ইহুদির দল পরাজিত হবে। তারা কোথাও পালাবার স্থান পাবে না। গাছের আড়ালে পালানোর চেষ্টা করলে গাছ বলবে, দেখো হে মুসলিম, দেখো, আমার পেছনে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। পাথর বা দেওয়ালের পেছনে পলায়ন করলে পাথর বা দেওয়াল বলবে, দেখো হে

---

১৫০ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় কিতাবুল ফিতান

মুসলিম, আমার পেছনে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে, আসো, তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ ইহুদিদেরকে গোপন করার চেষ্টা করবে। কেননা, সেটি ইহুদিদের বৃক্ষ বলে পরিচিত।[১৫১]

সহিহ মুসলিম-এ আবু হুরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

> ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত হবেনা যতক্ষণ না মুসলিমরা ইহুদিদের সাথে যুদ্ধ করবে। অতঃপর মুসলিমগণ ইহুদিরকে হত্যা করবে। ইহুদিরা গাছ ও পাথরের আড়ালে পালাতে চেষ্টা করবে; কিন্তু কেউ তাদেরকে আশ্রয় দেবে না। গাছ বা পাথর বলবে, হে মুসলিম, হে আল্লাহর বান্দা, আমার পেছনে একজন ইহুদি লুকিয়ে আছে। আসো এবং তাকে হত্যা করো। তবে 'গারকাদ' নামক গাছের পেছনে লুকালে গারকাদ গাছ কোনো কথা বলবে না। এটা ইহুদিদের গাছ বলে পরিচিত।[১৫২]

এই বইয়ে আলোচিত ইলুমিনাতির কর্মকাণ্ড এবং হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালের হাতে থাকা ক্ষমতার যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা পর্যালোচনা করলে আমরা এ বিষয়ে উপনীত হতে পারি যে, ইলুমিনাতি মূলত দাজ্জালের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে। একটা ব্যাপার হাদিস থেকে পরিষ্কার যে, দাজ্জালের এক চোখ অন্ধ থাকবে। তার হাতে ক্ষমতা থাকবে, অস্ত্র থাকবে, অর্থ থাকবে, খাদ্য থাকবে, জান্নাত-জাহান্নাম থাকবে, পোকামাকড় তার কথা শুনবে—এমনকি সে মরা মানুষকে পর্যন্ত জীবিত করতে পারবে। সমাজে দুর্ভিক্ষ আনতে পারবে। মানুষকে চাইলে সে খাদ্য দেবে, অন্যথায় তার কথার অবাধ্য হলে সে দুর্ভিক্ষ দিয়ে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করতে পারবে। বাতাসের বেগে ভ্রমণ করে মুহূর্তেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে সক্ষম হবে।

এবার আসি হাদিসের সাথে বইয়ের পর্যালোচনা—

- প্রথমত : হাদিসে বলা হয়েছে দাজ্জালের চোখ অন্ধ থাকবে। সে একচোখা হবে। আমরা বইয়ে আলোচনা করেছি ইলুমিনাতির সাইন হলো ত্রিভুজের ভেতরে একটা চোখ। এক্ষেত্রে তাদের সাইন

---

১৫১ নিহায়া, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম : ১/১২৮-১২৯
১৫২ সহিহ মুসলিম, অধ্যায় : কিতাবুল ফিতান

ইতোমধ্যে দাজ্জালের সাথে মিলে গেছে। আর ত্রিভূজাকৃতির বারমুডা এবং ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল দাজ্জালের বাসস্থান হতে পারে। এমনকি আমেরিকান এক ডলারের নোটে এই একচোখা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যা হাদিসে বর্ণিত দাজ্জালি সিম্বল।

❖ দ্বিতীয়ত : হাদিসে বলা হয়েছে তার হাতে খাদ্য থাকবে। আমরা বইয়ে আলোচনা করেছি যে, হাইব্রিড খাদ্য এবং ওয়ার্ল্ড ফুড অরগানাইজেশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ইতোমধ্যে দাজ্জালি শক্তি ইলুমিনাতি হাতে তুলে নিয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও খাদ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের হাতে চলে গেছে।

❖ তৃতীয়ত : হাদিসে বলা হয়েছে ইলুমিনাতির অর্থ প্রতিপত্তি থাকবে। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে পৃথিবীর ৭০ শতাংশ বাণিজ্য মাত্র দেড় কোটির মতো ইহুদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

❖ চতুর্থত : হাদিসে অলৌকিক শক্তি বা প্রযুক্তির কথা বলা হয়েছে। প্রযুক্তির দিক থেকেও ইলুমিনাতি ইতোমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থাৎ তারা ফ্লাইং সোসার্স, স্যাটেলাইট, পারমাণবিক সাবমেরিন, পারমাণবিক বোমা, ক্রুজ মিসাইল, ড্রোন, ইন্টারনেট এগুলো পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

❖ পঞ্চমত : হাদিসে বলা হয়েছে, দাজ্জালের কাছে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকবে। ইলুমিনাতির প্রযুক্তি 'হার্প'-এর মাধ্যমে দূর্ভিক্ষ তৈরি সম্ভব।

❖ ষষ্ঠত : হাদিসে এসেছে, দাজ্জালের কাছে মহামারী ছড়ানোর অস্ত্র থাকবে। সে চাইলেই যেকোনো জনপদকে, যেকোনো সম্প্রদায়কে যেকোনো মুহূর্তে মহামারী দিয়ে শেষ করে দিতে পারবে।

কীভাবে মহামারী তৈরি হবে সেটা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, আমেরিকা আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাস এবং এইডস ভাইরাস পরীক্ষা সম্পন্ন করেছে। বায়োকেমিক্যাল গ্যাসের পরীক্ষা তারা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছে। এর মাধ্যমে মুহূর্তে মহামারী ছড়িয়ে লক্ষ লক্ষ বর্গমাইলের ভেতর কোটি কোটি মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব। এটাও দাজ্জালের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দাজ্জাল আসার আগে সমস্ত কর্মকাণ্ড

যেগুলো দাজ্জালি শক্তিকে সহায়তা করবে, সেগুলো ইহুদির এবং খ্রিস্টানরা সম্পন্ন করেছে এবং তারা বর্তমানে অপেক্ষা করছে, কখন আসবে তাদের মাসিহ-আদ-দাজ্জাল! পৃথিবীতে ইহুদিরা তাদেরকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনে করে। তারা মনে করে দাজ্জাল আসার পর আবার তাঁদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। বাকি সারা দুনিয়ার মানুষ হবে তাদের দাসের মতো, তাদের থাকবে না কোনো নূন্যতম অধিকার। ইহুদিদের দয়ায় বেঁচে থাকতে হবে তাদের। তবে এমনটা কখনোই হবে না, কারণ আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন উম্মতে মুহাম্মাদিই শ্রেষ্ঠ জাতি। তিনিই শেষ পর্যন্ত আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেবেন। এবং দাজ্জালের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবেন। ইহুদিদের পবিত্র ভূমি চিরদিনের জন্য থেকে বিতাড়িত করবেন। মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্ব মুসলিমদেরই ফিরিয়ে দেবেন। সে সময় পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ধৈর্যধারণ এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য দান করেন। আমিন।

একটি অনুরোধ

ইলুমিনাতি একটি এমন বিষয়, যা নিয়ে প্রতিনিয়ত গবেষণা করা যেতে পারে। আমাদের এই বইয়ে সকল তথ্য চলে এসেছে, আমরা তা দাবি করতে পারি না। সম্মানিত বিদগ্ধ পাঠকের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনার জানা কোনো তথ্য বইয়ে বাদ পড়ে গেলে ইমেইলে আমাদের জানাবেন বলে আশা করছি।

আমাদের মেইল একাউন্ট : tazkiahpub@gmail.com

—প্রকাশক

তাজকিয়া পাবলিকেশনের

প্রকাশিতব্য বই

জঙ্গিবাদ জিহাদ নয়

উম্মাতান ওয়াসাতা

আরব্য রজনীর অজানা অধ্যায়; আল-কায়েদার

ইতিহাস

তাজকিয়া

কিতাবুজ জুহদ

লেখক-পরিচিতি

আবদুল কাইয়্যুম আহমেদ। সময়ের তুখোড় পাঠক ও মেধাবী এই তরুণ লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৯৯ সালের ১৯ শে ফেব্রুয়ারি; মাগুরা জেলার শালিখা থানাধীন শরুশুনা গ্রামে মামাবাড়িতে। পিতা ইমান আলি মোল্লা এলাকায় একজন অসাধারণ বিনয়ী, দ্বীনদার ও সম্মানীয় মানুষ হিসেবে পরিচিত। লেখাপড়ার হাতেখড়ি ঘরে মহীয়সী মায়ের হাতে হলেও একে একে পার করেছেন মক্তব, হিফজখানা ও কওমি মাদরাসার কিতাবখানায় মেশকাত পর্যন্ত। পাশাপাশি সাধারণ-শিক্ষার পাঠ নিয়েছেন স্থানীয় আলিয়া মাদরাসায়। এরপর আড়পাড়া ডিগ্রি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ চুকিয়ে বর্তমানে অধ্যায়নরত রয়েছেন ইসলামিক ইউনিভার্সিটি কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ-এ আরবি ভাষা-সাহিত্যে।

পড়ালেখা তার প্রিয় ব্যস্ততা। পাশাপাশি সেই হিফজখানার বারান্দা থেকেই চর্চা করেন সাধারণসাহিত্যের। রচনাও করেছেন বেশ কিছু ছোটগল্প ও উপন্যাসিকা। অনুবাদেও প্রশংসনীয় আগ্রহ তার। অনেকটা গবেষণালব্ধ হলেও ফিকশনধর্মী ‘ইলুমিনাতি’ তার প্রথম প্রকাশিত বই।

আমাদের চেনাজানা শাসনব্যবস্থার বাইরেও আছে আরেক শাসনব্যবস্থা। দৃষ্টিসীমার অন্তরালে আছে ভিন্ন শাসক, এই মনুষ্য পৃথিবীরই ভিন্ন কর্তা। আমরা কি চিনি তাদের? আমরা কি জানি পৃথিবীর সম্পত্তির সিংহভাগ কাদের দখলে? আনমনে-অবচেতনে কাদের আঙুল ইশারায় আমরা চলি- ফিরি? কার নিয়ন্ত্রণে, কার গুপ্ত-আয়োজনে চলে পৃথিবীর আইন? জানতে চান তারা কারা? - ইলুমিনাতি! ১৭৯৮ সালের দিকে Proofs of a Conspiracy নামে একটি বই লিখেন জন রবিন। বইটিতে দাবি করা হয় এখনো 'ইলুমিনাতি' বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে [illegible] প্রতাপে। এমনকি [illegible] ভাগের সেই ফ্রেঞ্চ বিপ্লবের পেছনের [illegible] ইলুমিনাতিই নেড়েছিল। [illegible]

9 789843 478054